বিপ্রমুখের কথা

বিপ্রমুখ

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯

মূল্য : সাড়ে চার টাকা

৯৩/১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত এবং ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ দি নিউ প্রাইমা
প্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীঅংশু রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পিতৃদেব ভূপতি নাথ মুখোপাধ্যায়

পূজ্যতমেষু

নিবেদন

বিপ্রমুখের কথা 'দেশ' পত্রিকায় এক বছর ধরে (১৯৪৮-৪৯) প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক পত্রিকার জন্য ধারাবাহিক লেখায় যে স্বাভাবিক ত্রুটি এসে যায়, তা সংশোধন করে এবং আরও কিছু নতুন বিষয় যোগ করে বিপ্রমুখের কথা এখন পুস্তক-আকারে প্রকাশ করা হল। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটা মূলগত ঐক্য সন্ধান করে বইখানা তিনটি পালায় ভাগ করা হয়েছে। কথা থেকে কথান্তরে লঘু-গুরু অনেক প্রসঙ্গ এসে গিয়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু প্রচার-উদ্দেশ্য নিয়ে এ বই লেখা হয় নি।

বাংলা দেশের বর্তমান সমাজ সাহিত্য ও শিক্ষার মধ্যে যে সব গলদ প্রকট হয়ে উঠেছে, এক কথায় সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনে যে সব মূঢ় অসঙ্গতি আর চল্‌তি ধুয়োর কারসাজি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাদের নির্বিষ আলোচনাই হল বিপ্রমুখের কথা। কর্মে ও চিন্তায় যেন অসাধুতার স্পর্শ না লাগে, এই টুকুই সাধু ইচ্ছা। বইটিতে কথকতার মুক্ত ও ব্যক্তিগত স্বর কিছুটা আছে। কিন্তু সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্যটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ রাখতে চেষ্টা করেছি।

যে সব শুভানুধ্যায়ী পাঠক ও সাহিত্যিক বন্ধু চিঠিতে ও কথায় আমাকে সত্যিই উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

নভেম্বর, ১৯৫২ **বিপ্রমুখ**

আদি কথা

এমন একদিন ছিল যে, বিপ্রকণ্ঠ-নিঃসৃত বাক্যের মূল্য ছিল সবিশেষ। সে বাণী ছিল অমোঘ, অলঙ্ঘ্য। তার সত্যতা এবং দুর্নিবার শক্তিকে অতিক্রম করার সাধ্য ছিল না দেবতারও। আপন সত্যে শক্তিমান্, অনৃত-বর্জনকারী ব্রাহ্মণেরই সেই স্বপ্রতিষ্ঠ ন্যায়বাক্য একদিন সমগ্র ভারতীয় সমাজকে অমৃতধারায় পুষ্ট, পীন ও প্রবৃদ্ধ করেছিল। আর বিপ্রমুখ থেকে যে সত্য প্রকাশ পেত, সেটা যুগ-যুগান্তেরই উপলব্ধ মর্মবাণী। তাতে শুধু ব্রাহ্মণোচিত আশীর্বাণী, দয়া-দম-তিতিক্ষার উদাত্ত কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয়নি তাতে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে কষাঘাত, অসত্য অধর্মের প্রতি নিদারুণ ধিক্কার। দিব্য নয়নে ছিল ক্ষমাসুন্দর জ্ঞানের প্রসন্ন দৃষ্টি, আবার রুদ্র আঁখির ভস্মকারী কোপবহ্নি। এই বাম-দক্ষিণের অপূর্ব সমন্বয়েই বিপ্রমুখ একদিন সার্থকবাক্ হয়ে উঠেছিল। সমগ্র সমাজের সদ্ধর্মকে রক্ষণ ও ধারণ করে, ত্রুটি-বিচ্যুতিকে হেয় জ্ঞানে বর্জন করে বিপ্রমুখ একদিন শক্তিশালী কূটনীতিকেও আয়ত্ত করেছিল—যেদিন রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠান-মাহাত্ম্য পর্যন্ত খর্ব হয়েছিল তত্ত্বজ্ঞ, সত্যবক্তা ব্রাহ্মণ-কণ্ঠের কাছে।

এখন সে দিন নেই। থাকবার কথাও নয়। যুগ-সন্ধিক্ষণে ব্রাহ্মণোপম নিষ্ঠাবান্ দৃষ্টিবান্ পুরুষও নেই। যে দু চারজন মহাত্মা দর্শন ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে মানবাত্মাকে সত্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা জীবিত নেই। শুধু তাঁদের কালজয়ী বাণী ছাপা হরফে মুদ্রিত আছে এবং বোধ করি মুদ্রিতই থাকবে। তাঁদের জীবন ও জীবন-সত্যকে ভাঁড়িয়ে কিছুকাল আমরা আত্মগরিমায় বিভোর থাকব, প্রতিবিম্বিত আলোয় খানিকক্ষণ গৌরববোধে উদ্ভাসিত হয়ে উঠব, এই পর্যন্ত। কিন্তু পূর্বসূরিগণের উপলব্ধ চরম সত্যগুলিকে হয়তো মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারব না। উত্তেজনা-প্রবণ ক্ষণিকবাদীর দায়িত্ব পালনের মতই আমাদের ভাব-সর্বস্ব প্রতিজ্ঞাগুলি অচিরেই হয়তো স্মৃতি-নৈবেদ্য হয়ে দাঁড়াবে। দুটি শুকনো প্রসাদী ফুল বিবর্ণ পাতার মোড়কে তুলে রাখব। কালে ভদ্রে, বিশেষ করে সঙ্কটকালে, তাকে মাথায় ঠেকাব। বাৎসরিক অথবা কোনো উপলক্ষ্যবিশেষে তাঁদের বাণীকে সজ্জিত, অলঙ্কৃত করে তুলব। কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের নিত্য-নিরুদ্দেশ প্রেরণায় ভুলে যাব, হয়তো খুঁজেই পাব না, আবহমান প্রয়াগ-ধারার অন্তরিত শক্তিস্রোত। ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির যুগে এর চেয়ে বোধ হয় বেশি প্রত্যাশা না করাই ভালো।

তবু ভবিষ্যতের আশা কেউ ছাড়তে চায় না। দুঃখবাদ, নৈরাশ্যবাদ, সন্দেহবাদ,—সকল মতবাদের পিছনেই একটি প্রশ্নাকুল মনোভাব যেন অন্তরাল থেকে কাজ করে যায়।

নীরবে অপেক্ষা করে থাকে একটি 'ক্রাইসিসে'র। যুগশক্তির অমোঘ আবর্তনে সৃষ্টি হয় নতুন আশার, পৃথিবীর পীড়িত আত্মা কণ্ঠ পায় একটি অথবা বহু মুখে। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়ে পুঞ্জীভূত গ্লানির প্রতিক্রিয়া। ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। কর্মজীবী অথবা বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠ থেকে তখন যে কথা বলিষ্ঠ ভাবে প্রকাশ প্রায়, সেইটেই হল সত্যিকারের বিপ্রমুখের কথা।

বর্তমানে বিপ্রমুখের সে ভরসা নেই। অতখানি শক্তি-ব্যবহারের ধৃষ্টতাও নেই। যে দৈবত দৃষ্টির ফলে বিপ্র-বাণীর সৃষ্টি হয়েছিল, সে দৃষ্টি পাব কোথায়? দেবতা নিজেই মুখ লুকিয়ে আছেন। কদাচার আর অনাচার, আণবিক শক্তি অর্জনে মানবাত্মার অপমান, ভেদনীতির অপপ্রয়োগে আত্মবলের লালসা, স্থূল জীবিকার সুবিধা-সন্ধানে উন্মাদনায় এবং কূটকৌশলে পৃথিবী তো ভরপুর। কণ্ঠে রামধূন, অঙ্গে পোষাকী বল্কল আর কয়েকটি মনোরম আশ্রম এবং অজস্র ভিক্ষার কমণ্ডলু থাকলেই রামরাজ্য আসবে না। কলির শেষ হতে এখনও দেরি। আর একটি খণ্ডযুগ সামনে পড়ে আছে। আর একটি জগৎ-জোড়া বিপর্যয়েব চৌকাঠে পা ঠেকিয়ে থমকে সবাই দাঁড়িয়ে আছি। মনে হয়—যা হবার হয়ে যাক্। এ রকম ইতরামি আর সহ্য হয় না। প্রলয় যদি আসেই, আসুক। দলগত স্বার্থ, শ্রেণীর স্বার্থ, বড় বড় রাষ্ট্রশক্তির উন্মুক্ত স্বার্থ, এত স্বার্থের গোপন এবং প্রকাশ্য সংঘর্ষে মানুষের দৃষ্টি বিভ্রান্ত। বিশ্বসমাজের এই

'পিউজিলিস্‌টিক পোজ', দেশে-দেশে মানুষের এই ঘুঁসি বাগিয়ে মল্লযুদ্ধের ভঙ্গিমা, বীরত্বের অভিনয়ে চরম কাপুরুষতা এবং শান্তি কামনার ব্যাজস্তুতিতে শক্তিসঞ্চয়েব মন্ত্রগুপ্তি, এতে পরমাত্মা কি কাতর ও পীড়িত নন? সর্বত্র তো সেই একই দৃশ্য, একই কথা। দৃষ্টি অস্বচ্ছ, উপলক্ষ্যটা স্থূল, কিন্তু উপলক্ষণগুলি সূক্ষ্ম বিজ্ঞানসম্মত, তাই মারাত্মক।

প্রথম পালা

প্রথম পালা

গঠনমূলক সমালোচনার যুগ এটা নয়। এটা স্বপ্রধান মতবাদের যুগ। এখন এক একটা 'ইজম্' বা বিশ্বাস খাড়া করে সেইটেকেই গায়ের জোরে, কণ্ঠের জোরে বড় বলে প্রমাণ করতে হয়। 'মঝঝিম পথ' আর নেই। হয় বাঁচো, নয় মরো। হয় দলে ভিড়ে পড়ো, নয়তো জাহান্নমে যাও। পড়াশুনো করে পণ্ডিতমূর্খ। চিন্তা করে অলস ভাবুক। সর্ব-দর্শন-সংগ্রহের সময় এটা নয়। সমন্বয়-দৃষ্টির সাহায্যে অখণ্ড ঐক্যসাধনা রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধু দুরাশা, সমাজনীতির ক্ষেত্রে 'এক্‌লেক্‌টিক বুর্জোয়া' ধর্ম। চিরন্তন সত্য, শাশ্বত মানব-ধর্ম বলে একদিন যেগুলো মানুষ আঁকড়ে ধরেছিল, সেগুলো নব্য সমাজ-বিজ্ঞানে বাতিল। মাননিরূপণ-চিত্র আঁকা হচ্ছে যুগোচিত ধর্মে। লেখনী সাংবাদিক, বিষয়বস্তু সাময়িক, দৃষ্টিভঙ্গী সামরিক। জ্ঞান হল একটা বিশুদ্ধ অপ্রত্যক্ষ এবং অবাস্তব ধারণা। বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। জনসাধারণের কল্যাণে নিযুক্ত হবে বলেই নাকি তার সাড়ম্বর আয়োজন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের উপকরণটাই বেশি। আদর্শ, বিশ্বাস, মতবাদ—এ সব জিনিষ অবশ্যই পরিবর্তন-সাপেক্ষ। এক যুগের শক্ত পাথর হয় আর

এক যুগের ঘুণ-ধরা ভিত্তি, এক যুগের শক্ত মানুষ হয় আর এক যুগের ফাঁপা মানুষ! এক যুগের রঙীন ইন্দ্রধনু আর এক যুগের কুয়াশা, এক যুগের পরশমণি আর এক যুগের কানা কড়ি। কিন্তু নতুন করে দাম যাচাই করার ফলে মূল্য-বোধ কি সত্যিই বেড়েছে, আগেকার কালের 'ভ্যালুজ' কি নিম্নস্তরের? সংস্কৃতির ইতিহাসে অগ্রগামীরা কি শুধুই অগ্রদানী? মানব-ইতিহাসে কিন্তু পূর্ববর্তী যুগেরও স্থান আছে। সেটা অগ্রাহ্য নয়। তখনকার রীতি-নীতির পুনর্বিচার হোক্, বিশ্লেষণ চলুক, কিন্তু যেন তাদের বুঝতে শিখি, অশ্রদ্ধা না করি। আধুনিকতম ঐতিহাসিক বিচারেও তাদের যথার্থ মূল্য অস্বীকার করা হয়নি। কেননা, মানুষের অগ্রগতি ঠিকমত বুঝতে হলে জানতে হবে অতীত দিনের ঘটনা, ধারণা আর সামাজিক পরিবেশ যা মানুষের পরিবর্তনকে বরাবরই নিয়ন্ত্রিত, পরিচ্ছিন্ন করেছে।

বিগত যুগ স্বুবর্ণ যুগ না হলেও তার একটা বিশিষ্ট মানবিক স্বুর ছিল; যে স্বুরটি স্থান পেয়েছিল চারণ-কবিদের কণ্ঠে। বিদেশের 'ক্রনিক্যল', আমাদের দেশের গাথা। ওদের দেশে ভ্রাম্যমান পথচারী কবি, 'সাজঁ্য' এবং 'ক্যারল'-সঙ্গীতকার। আমাদের এই শ্রুতি-স্মৃতির দেশে কথক ঠাকুর। এ'রাই হলেন সে যুগের চলন্ত বিজ্ঞাপন, স্বুরেলা ব্যাখ্যানকার। সময়টা মন্দ ছিল না। গদ্যময়, নীরস সাংবাদিক তর্ক-বিতর্কের দিনে কথক ঠাকুরকে আর একবার আমদানী করলে বোধ হয় খারাপ লাগত না। আধুনিক যুগের অনেক ছেলেমেয়েরাই না দেখেছে কথক,

না দেখেছে কবি, না শুনেছে যাত্রা বা পালা গান। কাশীর মালাইয়ের মতন কথকতাও অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। আসরের যাত্রা তো উঠেই গিয়েছে। প্রবাসে এসে বসে রামলীলা এখনও মধ্যে মধ্যে শুনি বটে। কিন্তু মুকুন্দদাসের যাত্রা অথবা কুলদা মল্লিকের কথকতা যারা শোনে নি, তারা বুঝতেও পারবে না বাঙলা দেশের নিজস্ব সম্পদ ছিল কতখানি। দেশাত্মবোধ, সমাজ-সচেতনতা, বিদ্রূপাত্মক কাব্য বর্তমানের রেওয়াজ হলেও তাদের পিছনে একশো বছরের রেওয়াজ আছে। তাই প্রাচীনদের লেখা সেকালের স্মৃতি থেকে কিছুটা হারানো সুর ফিরে পাবার চেষ্টা করি। অচিন্ত্যকুমারের 'কুঞ্জ' আর তারাশঙ্করের 'কবি' তারই সাহিত্যিক সংস্করণ, খানিকটা আমাদের মানসিক খোরাক মেটায়। আসলের কিছুটা আছে গম্ভীরায়, কবি-গানে।

আমাদের দেশের যাত্রা, কবির গান, ছড়া প্রভৃতি জিনিষগুলো এককালে ছিল লোকশিক্ষার বাহন। তাদের মধ্যে আদর্শ আর বাস্তব, সহজ দর্শন আর সমাজ-আলোচনার এমন একটা সরল সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল যে, সাধারণ লোকের কাছে সেগুলো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি-লাভের উপকরণ হিসেবেই শুধু এগুলির মূল্য নয়। সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা, সাময়িক ঘটনার টীকাটিপ্পনী হিসেবেও এগুলির একটা স্বতন্ত্র সমাজতাত্ত্বিক মূল্য আছে, যেমন ছিল প্রাচীনকালে পুরাণের। পুরাণ-আখ্যানে যেমন

সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাসের রেখাচিত্র, যাত্রায় আর কথকতায় আর কবি-কণ্ঠের ব্যাখ্যানেও তেমনি দেশীয় অথবা আঞ্চলিক সমাজের পরিচয়। এদের মধ্যে কোনও কোনও রচনায় গ্রাম্যতা-দোষ আছে। স্থানীয় চরিত্রে আর ভাষায় ছড়া-গানের মাধুর্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়তো সীমাবদ্ধ। কিন্তু স্থানীয় প্রচলনই তো সাহিত্য-ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। এদের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে জনসাধারণের সরল প্রাণের ধর্ম আর মর্মকথা। তাই অবনীন্দ্রনাথের খাতার পাতা ওলটাই, ভালো লাগে সেকালের ঘরোয়া ব্রত-অনুষ্ঠানের চিত্র। রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষামূলক প্রবন্ধ আবার পড়ি। বুঝি, কবিই প্রথম তাঁর তীক্ষ্ণ রসজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে এদের যথার্থ সমাদর করেছিলেন, প্রেরণা দিয়েছিলেন এগুলিকে সংগ্রহ করবার। পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বেও তিনি ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরে বলেছিলেন যে, প্রচলন-সাহিত্যই ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান। যে সব লিখিত, অলিখিত কাহিনী ও গান, লোকপরম্পরায় শ্রুত কিংবদন্তী, প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান ছড়িয়ে আছে আমাদের দেশে, সেগুলি হল ইতিহাসের রূঢ় মালমসলা। মানব-মনের, তার বিশ্বাস ও সংস্কারের, ধারাবাহিক কাহিনীটাও খাঁটি ইতিহাস।

সমাজ-বিজ্ঞানেও এই কথা স্বীকার করা হয়। বর্তমান অগ্রগতির যুগে এদের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় ঘটলে পিছন ফিরে তাকানোর অপবাদ কি গায়ে লাগবে ?

বিগত যুগের ঐশ্বর্য্য নিয়ে আক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই বলে বর্তমানের অস্তিত্বটাই তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি, এটা মেনে নিতেও বাধে। অতীতের যা কিছু সবই ভালো বলা যেমন অজ্ঞতা, বর্তমানের সব কিছুই খারাপ ভেবে নেওয়া তেমনি অন্ধতা। তাই যেখানে যেটুকু ভালো দেখেছি আর পেয়েছি সেটা স্বীকার করে নেব, যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাচাই করে নেব যেটা মেকি বলে সন্দেহ হয়। এই গ্রহণ-বর্জনের পালা কেউবা নেপথ্যে সেরে নেন, কেউবা উন্মুক্তভাবেই প্রকাশ করেন। সকল লেখক, কবি, শিল্পীই এই কাজ করে থাকেন। করাটাই ধর্ম, না করাটাই অধর্ম। প্রেরণা না থাকলে যেমন সৃষ্টি হয় না, সাধনা না থাকলে সে সৃষ্টি সার্থক হয় না। সাধনার অর্থই হল জিজ্ঞাসা, সমালোচনা, উপলব্ধি, সমীকরণ। যা দেখেছি, যা উপভোগ করেছি, যা ভালো লাগেনি, বুদ্ধি-বিচারশক্তিকে পীড়িত করেছে, হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ করেছে, সব কথাই অকপটে ব্যক্ত করব। এতক্ষণ করলুম মুখবন্ধ।

অথ কথারম্ভ

হেমন্তের স্বর্ণোজ্জ্বল আলোয় বাগানটি ঝলমল করছে। শিশির শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু ঘাসের ডগাগুলি এখনও ভিজে। লঙ্কা-চারায় ছোট ছোট শাদা ফুলগুলি নোলকের মতন দুলছে। কোণের ওই স্থলপদ্মের গাছে রোদের ঝলকটা তীব্রভাবে পড়েছে, ফুলের পাপড়িতে সবে গোলাপী আভা ধরেছে। রূপান্তরের কামনায় ফুলগুলির নীরব প্রতীক্ষা এতো সহজ সত্য বলেই নতুন দেখার চমক জাগায় মনে। প্রত্যেকটি ফুলের ও ফলের গাছে সেই একই প্রাকৃতিক রহস্য ধীরে ধীরে পলে পলে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। যেন হচ্ছে হবে, এই ভাব। কোন ব্যগ্র উন্মাদনা নেই। বিজ্ঞাপন আছে কিন্তু বাহুল্য নেই। একটি অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার অদৃশ্য প্রাণসূত্রে সব কিছু শ্লথ ও শিথিলভাবে বাঁধা পড়ে আছে। সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়—সবাই যেন বলছে, চোখ মেলে চেয়ে দেখো। হয়তো এমন করে এই প্রথম দেখলে। আর হয়তো এই শেষ দেখা।

এই চোখের খোরাক মেটায় মনের ক্ষুধা। ক্ষুধার তৃপ্তিতে শান্তি। হয়তো বা অতৃপ্তি। আবার নতুন ব্যাকুলতা, নতুন করে দেখার আগ্রহ। এই চলেছে। নিত্য চলিষ্ণু জগতের

সঙ্গে তাল রেখে চলেছে অভিজ্ঞতা, প্রকৃতি আর অন্তরের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা স্বর্ণ-সেতু নির্মাণ করে চলেছে দিনের পর দিন। সেই অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করছে সত্যের। কখনো তিক্ত, কখনো মধুর। কখনো শক্ত, কখনো পল্‌কা। ঐ যে পেয়ারা গাছটি—ছায়ায় আর রৌদ্রে ওটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল। শান্ত সহিষ্ণু গৃহিণীর মতই অকাতরে অর্বাচীন সংসারের দুরন্তপনা সহ্য করে। পুরানো ছাল একপুরু করে উঠে গেছে। মাঝে মাঝে ক্ষতের দাগ, দু-একটি ডাল ভাঙ্গা, প্রান্ত শাখাগুলির কয়েকটি দাপাদাপির চোটে নুয়ে পড়েছে। তবু নমনীয় প্রকৃতির নিজস্ব অদম্য শক্তির প্রাণরসে ওটি পূর্ণ। প্রাচুর্য আর অতি-পরিচয়ের অনাদরে ওর অস্তিত্বে দৃক্‌পাত তেমন করি না। কিন্তু আস্থা রাখি বেশি। বাগানের অপর কোণে দেখেছি এক জোড়া গোলক-চাঁপার গাছ। যেন ধনী-গৃহের দুটি যমজ গরবিনী। পাতার নিখুঁৎ সজ্জায়, দীঘল পেলবতায় ওরা মনোহারী। ওদের কৃত্রিম জীবনের একমাত্র উন্মীলিত সত্য যেন চূড়ায় এসে দুটি গুচ্ছে বিকশিত হয়ে উঠেছে। একটিতে শাদা স্তবক, অপরটিতে লাল। পল্‌কা ওদের ডালগুলি। দেখতে যদিও নধর, মোটা-সোটা। সযত্ন-বর্ধিত স্বল্প-মূল গাছ দুটির সঙ্গে মাটির যোগ কম। বাহারটাই বেশি। তবু এ-ও শোভন সত্য। প্রচ্ছন্ন তেজে গভীর ও গম্ভীর নয়। শুধু ঢলঢলে সরস সত্য।

আর অদূরে ঐ যে আমলকী গাছটি রয়েছে—কবির ভাষায় বলতে গেলে, শীতের প্রথম হাওয়ায় যার ডালে-ডালে নাচন শুরু

হয়েছে, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। ওর সত্য স্বতন্ত্র। বাহ্য রূপে, এমন কি, অন্তরের রসাস্বাদেও ওর মর্মপরিচয় ঠিক মেলে না। নিরুপম আমলক-ফলের সাহিত্যিক তুলনা মেলে মেরেডিথের গদ্যে, এলিয়টের কাব্যে। একাধারে 'এগোইষ্ট' আর 'ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড'। ঘরোয়া তুলনায় বলা চলে, পাকা ঘরণীর বিচিত্র-স্বাদ কষায়-মধুর বাণী। অঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্যাম, চোখে শ্বেতাভ স্বচ্ছ সজলতা, রসনায় কটু ক্ষার। জলপানযোগে মিষ্ট, ভিটামিনে ভরপুর, গূঢ় কোষে মাধুর্য, জারক রসে রাঢ় দেশের খাঁটি মোরব্বা। শাস্ত্রে এটি হরিতকীর মতই সাত্ত্বিক ফল, অমৃত-বিশেষ। কবিরাজির কথা বাদ দিলাম। গুণপনায় আর প্রয়োজনীয়তায় বিলেত-ফেরৎ ডাক্তারও আমলকীর প্রশংসা করে থাকেন। এ-ও সত্য।

কোনও অস্তিত্বই অবহেলার বস্তু নয়। সকল প্রকাশের পিছনে আছে বিশিষ্ট সত্তা, ভালোয়-মন্দয়, দোষে-গুণে জড়ানো-মেশানো। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমগ্র সম্বন্ধে জড়িত, নিয়ন্ত্রিত। যে চোখ আনুষঙ্গিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুর প্রকৃত এবং আন্তরিক রূপটি ধরে ফেলে, সেই চোখ সত্য-সন্ধানী। কথাটা অত্যন্ত সহজ পরিচিত। তবু পুনরাবৃত্তির ওজন সইতে পারবে। শুধু টিকটিকি, গিরগিটি বা সরীসৃপ জাতীয় জীব এই প্রকৃতির দেওয়া ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করে চলেছে, তাই নয়। সকল প্রাণীই তাই করছে। মানুষও সেই বিদ্যা শিখে নিয়ে কাজে লাগাচ্ছে। যুদ্ধের সময় 'ক্যামুফ্লাজ'-এর

ছড়াছড়ি ছিল। নতুন আঙ্গিকে, নতুন কৌশলে সত্য রূপটিকে গোপন রাখার প্রয়াস চলেছে আজও এবং সর্বত্র—সংসারে, সমাজে, ব্যবসায়ে, কূটনীতির ক্ষেত্রে। এক হিসেবে আমরা এক-একটি বিচিত্রবর্ণ পাইথন অথবা ঢিল-নুড়ি-পাথরে মুখ লুকিয়ে শুয়ে-থাকা ঘোরদর্শন 'ব্যুশ-মাষ্টার'। কেউ-বা বাঙলা দেশের নধর নিরীহ লাউ-ডগা, কেউ-বা আফ্রিকার লতান্তরিত অদৃশ্য ভীষণ শত্রু 'মাম্‌বা'। কেউটে-গোখরোর অভাবও নেই। তবে দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে রকমফের এই যা। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে, খাপ খাইয়ে, স্বভাবটিকে গোপন করে বেশ আছি। ক্রুরতার সঙ্গে অমায়িকতা, স্বার্থরক্ষার সঙ্গে নির্বিরোধ উদাসীনতার প্রয়োজনীয় ডোজ মিশিয়ে, দল বেঁধে অথবা দল ছেড়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি সব দেশ-বিদেশের ঝোপে-ঝাড়ে। বাইরে যা, ঘরেও তাই।

আত্মরক্ষা আর জৈব প্রয়োজনেই প্রকৃতির বর্ণলীলা, প্রাকৃতিক জীবের ছদ্মবেশ। আমরা সেই ছদ্মবেশের রহস্যটুকু বুঝে নিয়ে নিজের কাজে লাগিয়ে থাকি। একদিন অর্থাৎ সভ্যতার আদিম যুগে এসব উপায়-কৌশলের গুরু প্রয়োজন ঘটেছিল। সভ্যতার বিবর্তনে আজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমরা। কিন্তু বুদ্ধি-বিচারের সঙ্গে যে প্রাথমিক 'ইনস্টিংট' অথবা সহজাত প্রবৃত্তিগুলো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, সেগুলো এখনও ঠিক মত কাটিয়ে উঠতে পারিনি। পারা সম্ভব হয়নি। প্রবৃত্তিগুলোর ওপর চড়া পালিশ লাগিয়ে চোরাবাজারের

সান্ধ্য জৌলুস এনেছি মাত্র। নতুন নতুন নাম দিয়েছি—লয়েলটি, সেফটি অব দি স্টেট, ব্যালেন্স অব পাওয়ার কিম্বা গ্রুপ রাইট্স্। চলেছে তো ভালোই এখনও পর্যন্ত। যাঁরা পলিটিক্স করেন, তাঁরা অসঙ্কোচে উনিশ শতকী মাল নতুন বলে চালান দেন। দক্ষিণপন্থীরা রাষ্ট্রের কাঠামো বদলাতে নারাজ। অবস্থা বুঝে তাঁদের ব্যবস্থা, হোমিওপ্যাথিক ডোজে পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসির মাহাত্ম্য-বিস্তার। বামপন্থীরা দলগত স্বার্থ উড়িয়ে দিয়ে শ্রেণী-বৈষম্য নিঃশেষ করতে চান। ডিনামাইট প্রয়োগে অচলায়তনের পাথর-কেল্লা ভেঙ্গে নতুন মাটির ভিত্তি তাঁরা কামনা করেন। মধ্যপন্থীরা লেব্যর গভর্নমেণ্টের মতন সুবিধা-মাফিক ভোল বদলে ফেলেন। পুরানো কূটনীতিকে নতুন সাজে ঢেলে এক-একটি নীরব বিপ্লব সাধন করেন। সঙ্কট পার হয়ে যায়, পরস্পর গা-শোঁকাশুঁকি চলে। বিস্ময়ে হতবাক্ ভূখণ্ড এই মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত কৃতিত্বে মাথা নত করে। আর আমরা জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনে আর তাগিদে ঘুরে বেড়াই, ক্ষেত-খামারে, মাঠে-জঙ্গলে। মাঝে মাঝে কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরের জগতের দিকে তাকাই, দুনিয়ার সংবাদের দু-এক টুকরো ঘরে নিয়ে ফিরি। নতুন প্যাঁচ শিখি, কাজে লাগাই, তারিফ করি আবার সমালোচনাও করি। আর গড্ডালিকা-প্রবাহে, আসন্ন দুর্দিনের ভয়ে কিছু কিছু পুঁজি সঞ্চয় করে নিয়ে নিরাপদ্ গর্তের মুখ খুঁজে ফিরি।

মানুষের এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি অত্যন্ত ন্যায্য এবং

স্বাভাবিক। মানুষ যখন অবস্থার ফেরে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে, তার স্বভাব ও ধারণাগুলোও সেই রকম সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক চাপে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র রূপ নেবে, এটা সমাজ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র। আমাদের যাবতীয় বিশ্বাস আর সংস্কার. ধর্ম, রাষ্ট্র আর সমাজ-সংক্রান্ত সমস্ত ধ্যান-ধারণাই এইভাবে পুষ্টিলাভ করেছে। বাঁচবার জন্যে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন। শক্তি-অর্জনের একটি প্রধান উপকরণ হল আত্মসাৎকরণ। যেখানে যেটুকু নেবার ও শেখবার আছে, সেখান থেকে সেটুকু গ্রহণ না করলে চলে না। সাধারণ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী, সকলেই তাই করে থাকে। প্রয়োগশিল্পে যেটুকু পার্থক্য, সেইটুকুই ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। মানুষ প্রকৃতির কাছে চিরদিনের জন্য এ বিষয়ে ঋণী হয়ে আছে এবং থাকবে। প্রকৃতির অফুরন্ত রহস্য-খনি এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়নি। আণবিক যুগেও প্রকৃতির নকলিয়ানাই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ মুন্সিয়ানা।

এক খিলি মিঠে পান আর একটি টোস্ট তামাকের সিগরেট ধরিয়ে, উদার উদরের পূর্ণ সহযোগিতায় খেয়ালি চিন্তার অম্লমধুর রসে জীর্ণ হচ্ছিলাম। এমন সময়ে মূর্তিমতী সার্থকতার বেশে 'বহুরূপী' এসে উদয় হল। রোজই আসে এই মহাবীর। অশিক্ষিত দেহাতী সে। জরু-গরু মরে গেছে। জমি-জারাৎ বেচে দিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। পুজো আর বড়দিনের মরশুমে কলকাতায় বায়ু-পরিবর্তনকারী বাবুদের মনোরঞ্জন করে নানা

সাজে। নকল করে অনেক চরিত্রকে। মানুষটির সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি। ওর মধ্যে যথার্থ অভিনয়-দক্ষতা আছে আর আছে সহজ সুন্দর শিল্পবোধ। কোনও বাড়াবাড়ি নেই, যেখানে যেটুকু দরকার, সেইটুকুই ফোটায় ও দেখায়। একাধারে প্রাকৃতিক ও সামাজিক জীব। আপন মনেই আসে, আবার চলে যায় সাঁওতাল পরগণার অন্য কোনও শহরে। এই ওর পেশা, এই ওর নেশা। কোনও দিন সাজে গুর্খা দরোয়ান, কোনও দিন কাবুলিওয়ালা। কখনো শহুরে উকিল, কখনও খৈনি-খাওয়া সিপাহী। কাল এসেছিল মথুরা-বৃন্দাবনের গোয়ালিনী বেশে। আজ এল ধোপানীর সাজে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আঁচলটা মাথায় টেনে সামান্য মুচকি হাসি হেসে বহুরূপী বললে, "বেনারসের ধোপানী আছি বাবু। কাপড় কাচি ভালো···"

কৌতুককণ্ঠে প্রশ্ন করলুম: "কি রকম? কত করে শ' কাচো?"

বহুরূপী অমায়িক কণ্ঠে জবাব দিলে: "দাম লাগেনা বাবু। এমনি মুফ্‌তে কাপড় ধোলাই করি। সাফা কাপড় ময়লা করি, ময়লা কাপড় পীলা করি। আস্ত কাপড় ফালা করি, ভাসুরের পিঠে কাপড় ঠেঙাই। বেনারসের ধোপানী আছি, কাপড় কাচি ভালো···"

আজ বহুরূপীর শেষ অভিনয়। গত এক পক্ষকাল প্রত্যহ বিভিন্ন সাজে সেজে আর ছড়া কেটে রঙ্গরস করেছে। আগামী

দেওয়ালীতে ওকে হাজির হতে হবে মুঙেরে। সেখানে কিছু মুনাফার আশা আছে। কিছু বকশিস দিয়ে ওকে বিদায় দিলাম। শাদাশিদে, গোটা মানুষ এই মহাবীর। সহজ ওর শিল্পকলা, অতি সহজ ওর জীবনযাত্রা। যেটা ভালো লাগে, সেইটে নকল করে, সেজে দেখায়। যেখানে খুশি, সেখানে থাকে আবার চলে যায়। খাঁটি যাযাবর মানুষ। পথের সঙ্গে আর মাটির সঙ্গে ওর নাড়ীর যোগ। বর্তমান জীবনের মধ্যে দিয়ে ও চলেছে এবং আনুষঙ্গিক গ্লানিও ভোগ করে থাকে কিন্তু কি এক স্বাভাবিক আশ্চর্য উপায়ে, জটিলতার ধার ধারে না।

সচেতন অথবা অচেতন ভাবে আমরা অনেকেই বহুরূপী। হরেক রকমের রূপসাধনা করে থাকি। তার পিছনে আছে সজ্ঞান চিন্তা অথবা মনন শক্তি। কিন্তু বহুরূপীর মেজাজ আছে কি? দৃষ্টির প্রসন্নতা? ইচ্ছামত অনায়াসে, প্রাকৃতিক অবলীলায় পাতার সবুজ, মাটির গেরুয়া, পাথরের ধূসর কিংবা রোদের সোনালি মেখে কি আমরা মনকে অচেতন-অবচেতনের অভিষেকে স্নাত ও স্নিগ্ধ করতে পারি? কিংবা ঐ মানুষ-বহুরূপীর মতন সহজ প্রতীক-বেশে উপলব্ধির সাহায্যে চিত্র-চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারি? আমাদের আছে বুদ্ধি-জাগর সচেতন মন, আছে দার্শনিকতার অভিমান। নেই অসঙ্কোচ দৃষ্টির অপ্রতিহত প্রসাদ। এক কথায় পোজ্ আছে, নেই সত্যিকারের এ্যাটিচ্যুড। কেন নেই, তার জবাব দেওয়া কঠিন নয়। আর সে জবাব দেবেন সমাজ-দর্শনের বিশ্লেষক পণ্ডিত।

কিন্তু মানুষের মধ্যে যে বহুমুখী সত্তা আছে, যার বিকাশ হয়ে থাকে একই মানুষের নানাবিধ প্রচেষ্টায় এবং আচরণে—সেই বহুমুখী সত্তা বা ব্যক্তিত্বের এক একটি ধারাকে পৃথক্ করে, অবিচ্ছিন্ন করে দেখতে অথবা ফুটিয়ে তুলতে আমরা জানি না। কাজটিও কঠিন। পার্সোন্যালিটির এই ডিসোসিয়েশান যার আয়ত্ত, এক হিসেবে তার আত্মদর্শন হয়েছে। আমাদের দেশের ফকির-বাউল, উদাসী-বৈরাগীর মধ্যে খানিকটা এই সহজ বিশ্লেষণ-শক্তি এবং সেই সঙ্গে একাত্ময়-বোধ ছিল।

বহু দূর থেকে একটা বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। রেল লাইন পেরিয়ে ঘুম্‌টির পাশ দিয়ে কাঁচা সড়কটা যে মাঠের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ মুখ লুকিয়েছে, সেইখানেই বোধহয় উৎসব সুরু হল। গত কয়েকদিন ধরে একটা কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করছি। শীত-রিক্ত মাঠে হেমন্তের সন্ধ্যায় যেমন করে সূর্যের আর্দ্র তিমির ঝরে পড়ে, অরণ্যের প্রত্যাশী পাথুরে রাস্তায় যেমন করে ঝর্ণা-ধারায় পৌঁছুবার আগেই একটা ভিজে হাওয়া আর গন্ধের আমেজ পাওয়া যায়, আমার মনের শূন্য বালিয়াড়ি যেন সেই রকম একটা স্নিগ্ধ ক্ষীণ কল্লোলের আভাস পাচ্ছে ঐ শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে। যেন কিসের একটা পূর্ব্বাশায় মন উদগ্র হয়ে উঠছে, আবার কিসের একটা অভাবে বঞ্চনার সূক্ষ্ম বেদনা সঞ্চিত হয়ে উঠছে।

ঐ দেহাতী উৎসবের বাজনার আওয়াজে বাঙলা দেশের নিজস্ব উৎসবের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করি। মনে হয়, এ বেশ আছি।

প্রবাসে অন্ততঃ জগা-খিচুড়ি উৎসবের বিড়ম্বনা নেই। শারদীয় বাদ্যের রোলে, আকাশের নির্মেঘ চোখ-ঝলসানো নীলাভায়, শস্যহরিৎ প্রান্তরের শ্যামলতায়, কাশগুচ্ছের শুভ্র আন্দোলনে একটা প্রত্যাশা জাগে মনে। বহুদিনের ঐতিহ্য, সংস্কার আর ভাবানুষঙ্গ যেন একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হয়তো এটা অভ্যাস মাত্র। বিশেষ একটি উপলক্ষ্যে শব্দ আর চিত্রের সহযোগিতায় প্রাক্তন সংস্কারেরই অনুবেদন। তার বেশি কিছু নয়। তবু সেই প্রত্যাশা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণতা না পেলে মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা দেশের রাজধানীতে এখন যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা কি করছেন সেই কথাটা ভাবতে চেষ্টা করি। এখানে-ওখানে ঘুরছেন, সপরিবারে কুমারটুলী-বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ-কালীঘাট ঘুরে প্রতিমা দেখে বেড়াচ্ছেন আর অকারণে জনসঙ্কুল যানবাহনের ভিড় বাড়িয়ে তুলছেন। কিসের জন্য আর কি প্রত্যাশায়? উৎসবের প্রাণবস্তুর সন্ধান কি তাঁরা পেলেন? দেখছেন সাজ-সজ্জা আর রঙ আর শুনছেন আওয়াজ···

এক এক পাড়াতেই ছ'সাতখানা মণ্ডপ। অর্থাৎ বারোজনকে নিয়ে এক একটি বারোয়ারী এবং তারই আনুসঙ্গিক দলাদলি। চাঁদা সংগ্রহ, প্যাণ্ডাল বাঁধা আর আয়োজনের বাহুল্য। প্রতিমা গৌণ, মণ্ডপ মুখ্য। পূজা গৌণ, জনসমাবেশ মুখ্য। প্রতিমা সব নূতন ধাঁচের। বাহনগুলি খুঁজে নিয়ে দেখলে হয়তো বোঝা যাবে কে কোন্ দেবতা। কান্তবিদ্যার আধুনিক প্রয়োগে চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। সারাদিন অসংখ্য লোক আসছে যাচ্ছে,

অঞ্জলি দেবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। নীরব কোনও এক মুহূর্তে হঠাৎ বাজনা বেজে ওঠে। বুঝতে পারা যায় সন্ধিপূজার লগ্ন। কিন্তু পূজামণ্ডপে ভদ্র ও সংযত স্তব্ধতা কোথায়? শারদীয়া পূজার শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয় উপকরণ হল লাউড-স্পীকার। দিন-রাত তারই সাহায্যে গ্রামোফোন রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি চলেছে। মণ্ডপ মধ্যরাত্রে জনশূন্য। সিংহবাহনা দেবী নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে শুনছেন, "প্রেম যদি ব্যথা দেয় সেও ভালো, হিয়া মাঝে অনুরাগ তবু ঢালো"। আর মনে মনে আধুনিক গীত-কাব্যের অদ্বিতীয় নায়কের এই সহিষ্ণুতার কৃতিত্বে বিস্মিত হচ্ছেন।

সন্ধ্যার ঝোঁকে আরতির ঘণ্টায় আর সুগন্ধ অর্চ্চনায় মনটা ক্ষণেকের জন্য স্বাভাবিক প্রশান্তি খুঁজে পায়। তারপর দর্শকের দল ভিড় করতে থাকে। বাঁশ দিয়ে ঘেরা লাল শালু-মোড়া নেতাজী-জওহরলাল-মূর্তিশোভিত মণ্ডপের প্রবেশ-পথেই কেউ কেউ প্রণাম সেরে ফিরে যায়। কেউবা এগিয়ে এসে সমালোচকের দৃষ্টিতে অসুরের চোখ মুখ ও গঠন-কৌশলের তুলনা-প্রতিতুলনা করে। মহিলারা সংলগ্ন ষ্টল-এ স্বদেশী তাঁত-শিল্প, আচার-মোরব্বা শিল্পের নমুনা সংগ্রহ করেন, বালক-বালিকার দল কলরব করে, কেউবা হারিয়ে যায়। কিন্তু নিঃশব্দে নয়। লাউড স্পীকারে দেবীমূর্তির পিছনেই ভৈরব কণ্ঠ জেগে ওঠে, "হ্যালো, হ্যালো, সাতাশের তিন জগন্নাথ দাসের লেন থেকে ঝন্টি নামে একটি ন' বছরের ছেলের বাবা বিশ্বম্ভরবাবু ছ' নম্বর গেটের সামনে

দাঁড়িয়ে আছেন। ঝন্টিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোনো স্বেচ্ছাসেবক ঐ নামের কোনো ছেলেকে…” ইত্যাদি।

হয়তো এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। যুগোচিত বিবর্তন। পূজা উৎসবে পূজা নেই, উৎসব পার্টি হয়ে উঠেছে। কোনও নেতা প্রতিমা উন্মোচন করেন, আবার কোন প্রধান অতিথি হয়তো অপ্রধান অতিথিদের জ্ঞানদানে কৃতার্থ করেন। মণ্ডপের জনতা মিটিং-এ এসেছে বলেই মনে হয়। তাতে স্বয়ং দেবীও হয়তো আর বিস্মিত হন না। তবু মেনে নিতে সময় লাগে।

প্রবাসে বসে তাই মনে হচ্ছে, বেঁচে গেছি। শহরে থাকলেই বেরুতে হত। এখানে ওসব হাঙ্গামা নেই। যেটুকু আছে, সেটুকু নির্ভেজাল। বাংলা দেশের মতন বিহার বা যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণ বোধ হয় এখনও অতটা 'সোফিষ্টিকেটেড' হয়ে ওঠেনি। এখনও দশেরা, রামলীলায় খাঁটি উৎসবের গন্ধটা পাওয়া যায়। দশাননের মূর্তি পোড়ে, ডুগি বেজে এঠে। এখনও পুতুল নাচের প্রচলন উঠে যায়নি। কথকতা হয়। ছেঁড়া পাল টাঙিয়ে সামান্য আয়োজনেই আসর বসে। গায়ক গলায় ফুলের মালা পরে মধ্যস্থলে বসে অশিক্ষিতপটু-কণ্ঠে ব্যাখ্যা করে চলে আর গান করে। আনন্দে আর উত্তেজনায় আর মধ্যে মধ্যে উচ্চাঙ্গের তান-মাহাত্ম্যে শ্রোতার দল তৃপ্ত হয়। খোলা মাঠে সারারাতই হয়তো গান-বাজনা চলবে আজ। সন্ধ্যার কিছু আগেই দোকান বন্ধ করে কয়েকটি লোক ঐ পথে গিয়েছে দেখেছিলুম……

আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রাচীন প্রথা বা সংস্কার ছিল, সেগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা চলে না, এই কথাটাই এতক্ষণ বলতে চেয়েছি। যেগুলো নিতান্ত বাহ্য, অর্থাৎ যার প্রাণবস্তু নেই, অনুষ্ঠানই যাদের সর্বস্ব—সেগুলোকে অবশ্যই ছাঁটাই করে নেওয়া দরকার। নইলে জীর্ণ অতীতকে আঁকড়ে থাকতে হয়। ভবিষ্যৎ না ভেবে, অগ্রগতির সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে যুগধর্মের দাবীকে অস্বীকার করতে হয়। যেমন অনেকটা এখন আমরা করছি বাঙলা দেশে। ১৯০৬ সালের মোহ আজও দূর হল না আমাদের জীবন আর সাহিত্য থেকে। তারই পুনরাবৃত্তির জের টেনে চলেছি ভারবাহী জীবের মতন। ১৯৪২ সালের পটভূমিতে যে রঙ লাগল, সেটাও অস্তরাগের। তিন যুগেরও আগে যে সূর্য উঠেছিল, তারই অন্তিম রক্তিমা। এ সহজ সত্যটা আমরা মেনে নিতে চাই না। কেননা তাতে বিপদ আছে, স্বার্থহানির আশঙ্কা আছে।

কিন্তু যা নিয়ে মাটি আর মানুষ তৈরি হয়েছে, হাজার হাজার বছরের ইতিহাস রচিত হয়েছে, কত শত আদর্শ আর ধারণার অজস্র পরিবর্তনের পরও যে গভীর সংযোগ আজও ছিন্ন হয়নি,

তাকে ত্যাগ করা সমীচীন নয় এবং সম্ভবও নয়। সাময়িক উত্তেজনায়, যুগসঙ্কটের চলতি ধূয়ায় সে কাজটা লোভনীয় এবং সহজ মনে হলেও মূল উৎপাটন করা চলে না, যদি সে মূল সুস্থ থাকে। কলমের চারা বাঁধবার সময়ে ডালপালা ছেঁটে নিতে হয়। কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ প্রয়োজনীয় হলেও, শিকড় উপড়ে ফেলা হয় না। কোনো দেশেরই সমাজ-গুরু আর রাষ্ট্র-নায়কের দল একথা বলেন নি। এমন কি সোভিয়েটেও নয়। বিশ্ব-শ্রমিক-রাষ্ট্রকল্পনায় তারা নিজস্ব সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়নি। সেখানেও ক্লাসিক্স্ চর্চা হয়। ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা আছে যথেষ্ট। কিন্তু ঐতিহ্যের শ্রদ্ধেয় অংশের প্রতি অনাদর নেই।

বর্তমান যুগে দুটো জিনিস লক্ষ্য করছি—যে দুটো পরস্পর-বিরোধী। একটা হল ইতিহাস ভালো করে না পড়ে ও বুঝে ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করা। আরেকটি হল বিদেশী শাসনাবসানে উৎকট স্বদেশিয়ানা। অর্থাৎ ঐতিহ্যের মৌখিক প্রেম। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ বনাম সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ।

আমার যুবক বন্ধুদের একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়। আমাদের বর্তমান ইতিহাস যা নিয়ে গড়ে উঠেছে, তার পিছনে বহুযুগব্যাপী যে চিন্তা ও সাধনা আছে, তার কথা কি তাঁরা জানেন? ইতিহাসের সঙ্গে মৌখিক পরিচয় সকলেরই আছে অল্প-বিস্তর, তা জানি। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস-জ্ঞানের কথা বলছি না। আমাদের ইতিহাসের যেগুলি প্রাথমিক

উপকরণ, সেগুলি তাঁরা পড়েছেন অথবা পড়বার চেষ্টা করেছেন কি ? আমার মনে হয় তাঁদের সে ইচ্ছা নেই অথবা সময় নেই। সংবাদপত্র, রাজনীতি আর চিত্রগৃহের তুর্ণিবার আকর্ষণ কাটিয়ে যেটুকু শক্তি বা সময় থাকে, সেটুকু 'পাশের পড়া' অর্থাৎ অধ্যাপক-প্রদত্ত স্যজেশ্যন-সংগ্রহেই চলে যায়। তাঁরা বেদ-পুরাণ মহাভারতের নাম শুনেছেন, তু' চারটে গল্পও জানেন। কিন্তু অনুবাদ মারফৎ। মৌলিক গ্রন্থ পড়া দূরে থাকুক, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দরের বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলী পড়ে আপনাদের ঐতিহ্য-সম্পর্কে জ্ঞানবান্ হতে তাঁরা পারেন নি। এটা তুঃখের কথা। ইতিহাস-সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কৌতূহল এবং দৃষ্টি না থাকলে আমাদের ঐতিহ্যের গুণাগুণ বুঝব কি করে ? পরের মুখে ঝাল খেয়ে স্মার্ট হওয়া যায়, চমৎকার বুকনি কাটা যায়, পাশ করা যায় এবং মুরুব্বি থাকলে চাকরিও জোগাড় হয়। কিন্তু মানুষ হওয়া যায় কি ? মানুষ নিয়েই ইতিহাস তৈরি হয়। আমাদের ভবিষ্য ইতিহাস কি হবে অমানুষিক ? শূন্যগর্ভ কলসীর আওয়াজ মাত্র ?

কি জানি ! চারিদিকে যা দেখছি, তাতে মনে হয়, প্রকৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের অত্যাবশ্যক এবং আন্তরিক বন্ধন শিথিল হয়েছে। এটা শুধু যুগ-সন্ধিক্ষণে সভ্যতারই সঙ্কট নয়, সেইসঙ্গে আমাদের স্বদেশী সংস্কৃতিরও সঙ্কট। দ্বিধাখণ্ডিত দেশে, প্রাদেশিক এবং স্থানীয় সঙ্কীর্ণতায় তুষ্ট মনোভাব নিয়ে, তুর্নীতি দমনের

অছিলায় ব্যাপকতর স্বার্থ-প্রণোদনে এটা আমাদের জাতীয় জীবনেরও সঙ্কট। যেখানে স্থিরবুদ্ধি বিচার-শক্তির অভাব, সেখানে শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অভাব বলে বসে থাকলে, এ সঙ্কট ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির সঙ্কট বলেই গণ্য হবে। বাঙলাদেশে সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনে যে মানবিভ্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার একাধিক এবং অর্থনৈতিক কারণ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু চেষ্টিত আর চরিত্র, নিরীক্ষা আর প্রচেষ্টা—এ ছাড়া সেই মানোন্নতি সম্ভব হয় কি করে ?

এদিকে গত আট দশ বছরে কাগজে-কলমে কত চেষ্টাই না চলেছে। কনফারেন্স, কমিটি, সাব-কমিটির বেড়াজালে শিক্ষা-বিভাগের সংস্কার আজও আবদ্ধ আছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয় হিসেবে বাঙলাকে যথাযোগ্য সমাদরও দেওয়া হয়েছে, যদিচ সেটা মৌখিক। এদিকে উৎকট স্বদেশিয়ানার নমুনাও দেখতে পাচ্ছি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনাদরে। পলিটিকস্-এ বর্জননীতি চলে। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে নীতি গ্রাহ্য কি না এবং গ্রাহ্য হলে কতটুকু, সেটা ভেবে দেখতে হবে। বিদেশী ভাষা বলেই সেটা উপেক্ষার বস্তু নয়। একদিকে ইংরেজী জ্ঞান যেমন কমছে এবং শিক্ষার মারাত্মক ত্রুটিগুলো যেমন গর্হিত বা নিন্দনীয় বলে আর বিবেচিত হচ্ছে না, অপরদিকে দেখি মাতৃভাষার জ্ঞানও কিছু পরিমাণে বাড়ছে না। ইংরেজির প্রতি নিষ্ঠার অভাবে যদি বাঙলার প্রতি

সত্যিকারের শ্রদ্ধা বাড়ত, তাহলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে, স্বজাতীয় সংস্কৃতির উপযুক্ত বাহক হিসেবে সে ভাষার প্রতি মর্যাদাবোধ আরও পরিস্ফুট হত। 'ক্যারেকটার' বা 'জীনিয়স্' লিখতে যে বানান বিভ্রাট সৃষ্টি হয়, 'সন্ন্যাসী'র বর্ণশুদ্ধি সমস্যাও সেই পরিমাণে তীব্র হয়। 'উচিত' লিখতে গিয়ে সাংঘাতিক 'অনুচিৎ' কাজ করে বসি। 'উর্ধ্বে'র তো কথাই নেই, অধঃপতিত হয়ে আছি।

মনে হয় সংস্কৃতের প্রতি ক্রমশ যে বীতরাগ ভাবটা আসছে, সেটাও একটা কারণ। সংস্কৃত যে মৃতভাষা এটা সকলেই জানে। কিন্তু যে সংস্কৃত সংস্কৃতির বাহন, যে ভাষা থেকে ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার জন্ম, তার সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিন্ন হলে দেশের ধর্ম, সমাজ, শাস্ত্র, ইতিহাস জান্‌ব কি করে? শুধু তর্জমা-সাহিত্য দিয়ে কোনও দেশ লাফিয়ে বড় হয়েছে, এমন কথা শোনা যায়নি। আমাদের বেশির ভাগ ছাত্রের কাছে, সংস্কৃত মানে পণ্ডিত মশাই, পণ্ডিত মশাই মানে ব্যাকরণ আর খিঁচুনি। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে আধুনিকতম সার্থক সাহিত্যিক—কেউই সংস্কৃতের প্রতি অনাস্থা দেখান্‌নি। সংস্কৃত-চর্চা বন্ধ করার অর্থ হ'ল ঐ শিকড় উপড়ে শুকনো ডালে জল দেওয়া।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। অতএব শিক্ষা-সংযমের প্রয়োজন নেই। কতকগুলি ধরতাই বুলির সস্তা মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি আমরা। উৎকট স্বাদেশিকতার নমুনা দেখছি সর্বত্র।

সর্ববিধ জাতীয় প্রচেষ্টায় স্বাজাত্যবোধ দেখাতে গিয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এটা যদি ক্রমশ শ্যাভিনিজম্-এ দাঁড়ায়, তা'হলে বিস্মিত হব না। গান্ধীজী-কল্পিত সত্য রামরাজ্য শুধু মহাকাব্যের যুগানুযায়ী কয়েকটি প্রদেশের নামকরণে যেন শেষ না হয় আর গাম্ভীর্য্য-বিহীন স্বাজাত্যবোধ সম্পর্কে কবিগুরুর যে বিভীষিকা ছিল, সেটা যেন বাস্তব হয়ে না ওঠে, এই বিপ্রমুখের প্রার্থনা।

বাঙালীর নিজস্ব উৎসব শারদীয়া পূজার আধুনিক রূপান্তর প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।

স্মৃতি-চিত্র-জাতীয় রচনায় সেকালের সামাজিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। সে সব প্রথা বা সংস্কার আজকের দিনে অচল আর বাতিল, এ কথা মেনেও তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল থাকলে ক্ষতি নেই। বরঞ্চ লাভ আছে। আর কিছু না হোক্, আমাদের দেশীয় সমাজের মধ্যে যে সব অগ্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া এ যাবৎ কাজ করে এসেছে, তাদের একটা মোটামুটি বিশ্লেষণ করবার সুযোগ মেলে। তীর্থ-মাহাত্ম্য, ব্রত-পার্বণ, অর্থহীন লোকাচার আমরা মানব না, এটা ঠিক্। কিন্তু কি সামাজিক আর ঐতিহাসিক কারণে শ্রুতি-স্মৃতির জন্ম আর প্রসার হল, অবনতির যুগে সেই সব আচার-অনুষ্ঠানগুলোই নিষ্প্রাণ হয়েও মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি গেড়ে মনকে অনুশাসনের দাসত্বে বেঁধে ফেলল,

সেগুলো খবর হিসেবে প্রয়োজনীয়। আর প্রাচীন প্রথা বা সংস্কারের মধ্যে যদি কোনও কল্যাণ বা সৌন্দর্যের স্পর্শ থাকে, তা হলে সেগুলিকে বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিশ্চয়ই নেওয়া যেতে পারে। যেমন নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে এমন সব উৎসবের প্রবর্তন তিনি করেছিলেন, যেগুলির মধ্যে সমাজ-মঙ্গলের পরিচয় আছে। রসরাজ অমৃতলাল বসুর লেখা 'কৌতুক-যৌতুকে', বিশেষ করে 'কৌলিক দুর্গোৎসব' নামে রসচিত্রটিতে সেকালের পূজা-উৎসবের ভালোমন্দ দুটো দিক্‌ই দেখানো হয়েছে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রসরচনাতেও এই রকম বাঙালী পূজা-পার্বণের বৈশিষ্ট্য সরসভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

বাঙলা দেশে 'সার্বজনীন' উৎসবগুলির প্রচলনই আজকাল বেশি। বাঙালী মিলে মিশে কাজ করে। তবে পার্টি বা দলের প্রাধান্য এদেশে বরাবরই আছে। আমার মনে হয় বাঙলা দেশের পলিটিক্‌স যে নষ্ট হয়ে গেল, তার প্রধান কারণ হ'ল বাঙালীর বারোয়ারী মনোভাব। চাঁদা তুলতে আমরা যেমন ওস্তাদ, কাজ ভাগ করে দিয়ে নিজে মুরুব্বি সেজে বসে থাকৃতে আমরা যেমন নিপুণ, পরের দোষ দেখিয়ে দলাদলি করে আবার কোনও এক অনুষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গে দিতেও আমরা পিছ্‌পাও হই না। বেশি দিন ধরে কোনও একটা কাজে লেগে থাকৃতে সত্যি আমাদের কষ্ট হয়। কয়েকটি বিশিষ্ট বাঙালী প্রতিষ্ঠান অবশ্য আজও সগৌরবে টিকে আছে, যেগুলি সারা

ভারতের প্রশংসা দাবী করতে পারে। কিন্তু এগুলো হল নিপাতনে সিদ্ধ। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। বাঙলা দেশের সমাজনীতি আর রাজনীতির ব্যাকরণ বড় কড়া জিনিষ। এখানে কোনও কিছু গড়ে ওঠবার আগেই, তার ব্যুৎপত্তি নিয়ে প্রথমে গোলমাল সুরু হয়। গোলমাল যদি বা থাম্‌ল, সুরু হল বিভিন্ন শব্দরূপ। সেটা বা যদি আয়ত্ত হল, সন্ধির অধ্যায়ে গিয়ে আট্‌কে যেতে হবে। সেখানে সব বিচ্ছেদ। সমাসের চেয়ে ব্যাসবাক্যেই আমরা পটু। আত্মনেপদী ব্যাপারের চেয়ে পরস্মৈপদী ক্রিয়াকলাপেই অভিরুচিটা যেন বেশি। আর সব চেয়ে বড় কথা, আমরা সনন্ত ধাতুর পক্ষপাতী। কিন্তু ক্রিয়াপদ শেষ করতে ভয় পাই। আমাদের জিজ্ঞাসা অসীম, পিপাসা অনন্ত। মধ্যে মধ্যে উদার মুহূর্তে চিকীর্ষাও অনুভব করি। দুর্ভিক্ষে বুভুক্ষা যেটুকু ওঠে, সাহিত্যে তার চেয়ে বিবক্ষা হয় বেশি। ছিদ্র-ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা বেশ সূক্ষ্ম, অপরের ব্যাধি-চিকিৎসায় আমরা যত্নবান্। কিন্তু শুশ্রূষা নেই—জিঘাংসা ও জুগুপ্‌সার শক্তি অসামান্য। তবে সব বিষয়েই 'ইচ্ছা' আমাদের আছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু গঠনমূলক যে কোনও প্রচেষ্টায় আমরা নেতিয়ে পড়ি সহজে। আজকাল ব্যবসায়ে দেখি উৎসাহ প্রচুর, বিশেষ করে যুবকদের। কিন্তু বেশি দিন টেঁকে না। সৎ উদ্দেশ্য, সাধু ইচ্ছা সত্ত্বেও এক বছরে একই ঘরে তিন চারবার গণেশ বসেন আবার ওল্‌টান। বাড়িওয়ালার দল বোধ হয় এই সব বুঝেই অগ্রিম

টাকা নেওয়ার বন্দোবস্ত করেন। এর কারণ অনেক আছে অবিশ্যি। তবে যেটা স্পষ্ট দেখতে পাই, সেটা হল আমাদের স্বাভাবিক অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা। মুখে ইংরেজ, জার্মান, জাপানীর মুণ্ডপাত করি, তাদের ব্যবসায়িক কৃতিত্বে ঈর্ষ্যাবোধ করি। স্বদেশী দ্রব্যের বা জাতীয় পরিচয়ের গুণগান করি হাস্যকর বিজ্ঞাপন দিয়ে। মাংসের দোকান শুধু বাঙালী নয়, খাঁটী পশ্চিমবঙ্গীয় বলে অভিহিত করি। কিন্তু দু'চার মাসের মধ্যে আশাতীত সৌভাগ্য উদয় না হলে দোকান বেচে দিই। একটা ব্যবসা বড় করতে হলে তাকে যেভাবে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়, মার খেয়েও লেগে থাক্‌তে হয়, যে সততা আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সুনাম রক্ষা করতে হয়, সেগুলো কাগজে-কলমে আমাদের আয়ত্ত আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিক্রয়-নীতি শিক্ষায় হয়তো কারুর কারুর বিলাতী তক্‌মাও আছে। কিন্তু যখন দেখব, রাতারাতি বড় লোক হতে পারছি না, মুনাফা মিলছে না মনের মতন, তখন মুসড়ে পড়ে অন্য কিছুর চেষ্টা দেখি।

এইখানেই গণ্ডগোল। বইয়ের দোকান না জম্‌ল তো লাগাও মনোহারী দোকান কিংবা সাব-কন্‌ট্র্যাক্ট। দিন কতক বেশ জম্‌জমাট। বেশ স্ফূর্ত্তি করা গেল। মাল কিনে আট্‌কে রেখে খাঁকৃতির দিনে চড়া দামে বাজারে ছেড়ে বেশ দু' পয়সা জমিয়ে নেওয়া গেল। শ্লামপ বা ডীপ্রেশ্যনের জন্য আমরা তৈরী হতে পারি না। 'রেডি রীট্যার্ন' দাবি করি। এতে ব্যবসা স্থায়ী হবে কি করে?

তারপর বন্ধুর দল আছেন। অ্যাকাউন্ট শোধ না করে হাওয়া হয়ে যাবার অস্বাভাবিক নৈপুণ্য তাঁদের আছে। পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করলে স্যুট আছে, সিনেমা আছে। শাড়ী-চকোলেটের খরচা আছে। তা থাকুক, ক্যোটা পারমিট জোগাড় করবার মতন তদ্বির-তাগদ আছে। সেইটেই তো ক্যাপিটাল! দায়িত্বহীন লোকদের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসায়ে নেমে শেষ পর্যন্ত যদি নৌকা ডোবে, ডুবুক্। সাঁতার জানা আছে কিছুটা। পাঁকে জড়িয়ে মরুক্ বোকারা। নিজে ও পারে পৌঁছুবার মতন বুদ্ধি আছে। দেন্‌দারী দায়িত্ব তো নেই। কাগজে-কলমে যখন কিছু লেখা নেই, ভয়টা কিসের! মুনাফার অংশ মিললেই হল, যখন পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। বেগতিক দেখলে কেটে পড়, না হয় বেনামীতে ঝুরো কারবার চালাও। আর কাউকে লাভের আশায় নামিয়ে তার টাকাটা 'রোল্' করিয়ে দাও। বাঙালীর সব চেয়ে আকর্ষণের বস্তুহল এই মুফ্‌তে লাভের আশা। সাধারণ অর্থনীতি শাস্ত্রে যাই বলুক্, বর্তমান যুগে যুবকদের ইকনমিক্স্‌ই আলাদা। তারা আগেকার দিনের মুল্যবোধকে 'লোয়ার ভ্যালুজ' মনে করে। করুক্, তাতে ক্ষতি নেই। যদি নিজেরা লাভবান্ হয়ে একটা নতুন সমাজ-বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারে যেখানে পুরানো দিনের দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক চরিত্র আর অর্থের অর্থ বদলে যায়, তা হলে কৃতিত্ব তাদেরই। কিন্তু দেখা যায়, তারা অতি-বুদ্ধি-সম্পন্ন ও উচ্চতর 'ভ্যালুজ্'-বোধে বিশ্বাসী হয়েও ছেলেমানুষের মত ঠকে যায়।

দু একটা বিষয়ে কিন্তু আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোনও পরিবর্তন হয়নি। বর্তমানে বহুবিজ্ঞাপিত যুগ-সন্ধিক্ষণেও নয়। একটা হল : স্বল্পতম পরিশ্রমে চরমতম লাভ। আর একটা হল : সাইড-বিজ্‌নেস্। মাষ্টারির সঙ্গে দরজির দোকান, হোমিওপ্যাথির সঙ্গে জীবন-বীমা, প্রাইভেট টুইশনের সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ড, কেরাণীগিরির সঙ্গে বি-কম., পুরুতগিরির সঙ্গে ঘটকালি আর পেনস্যনের সঙ্গে শেয়ার মার্কেট, এগুলো ঠিকই আছে। এ যুগের ছেলেরা নতুন কোনও কম্‌বিনেশ্যন বাৎলাতে পারেন?

বাঙলার সামাজিক জীবনে যে এই ধরণের অনেক গলদ আছে, সে কথা সবাই জানেন। নতুন করে পুরানো কথা বললে 'কমনপ্লেস্' অপবাদ কেনবার সম্ভাবনা আছে, এ কথাও মানি। কিন্তু যেগুলো মারাত্মক ত্রুটি, সেগুলো নিয়ে উল্‌টে আমরা অহঙ্কার করি—অবাধ্য সন্তানের গোঁয়াতুর্মির কাহিনী-গুলো নির্বোধ জননী যেমন সালঙ্কারে এবং সাহঙ্কারে শোনাতে ভালবাসেন। যে নিন্দনীয় দোষগুলো জাতীয় বৈশিষ্ট্যের নামে চালাবার চেষ্টা করি, ইংরাজিতে যাকে বলা যায় 'বেন্যালিটিজ্'—সেই সব পোজ্‌কে এক্সপোজ করলে স্বদেশদ্রোহিতা হয় না। ব্রাহ্মণোচিত কটূক্তি বা তীব্র ভাষণ না করে, গুরুমশাইগিরি না করেও সত্য কথা বলা যেতে পারে। দলাদলির যে মজ্জাগত স্পৃহা আর মুফতে মুনাফার যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে অল্পবিস্তর রয়েছে, তার কিছু কিছু চিত্র সাহিত্যের মারফৎ চোখে আসে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে কল্পনার আমেজ আছে বলে হয় তো সে সব চিত্র অনেকখানি বাস্তব হয়েও আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে ভাবায় না। সাহিত্যিক সংস্কারক নন, এ কথা শরৎচন্দ্রকে বলতে শুনেছি। তবু তাঁর 'পল্লীসমাজ' বইখানা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েও সমানুপাতে কার্যকরী হয়নি। যদি হ'ত

তা হলে একখানা বই পড়েই আমাদের চৈতন্যোদয় হ'ত আর পল্লীসমাজের চেহারাটা সত্যিই বদলে যেত সাধারণ পাঠকের আন্তরিক বোধশক্তির তাগিদে। ডিকেন্স, গলস্‌ওয়ার্দির রচনা পড়ে বিলেতে নাকি আইন-সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়েছিল। এদেশে সাহিত্যিক বা লেখকদের কেউ 'সীরিয়স্‌লি' নেয় না। অসংখ্য পত্রিকার উদরপূরক হিসেবে তাঁদের সামাজিক আসন। সিনেমার বই লিখ্‌লে তবে রেস্তরাঁয় চায়ের কাপে যা একটু-আধটু তুফান ওঠে। নইলে ধার করে বই পড়ার ফল আর কতটুকুই বা স্থায়ী হতে পারে!

তবে লেখকদেরও ত্রুটি আছে বৈ কি! তাঁরা ভাবাতে চান্‌ না কিংবা ভয় পান। মধ্যবিত্ত জীবনের আরামপ্রদ সুবিধা, অস্বস্তিকর অসুবিধাগুলোকে একটা মনোরম 'অ্যাটমস্‌ফিয়র' বা আবেশে জড়িত করেন। আমাদের জীবনের যথোচিত স্থানে যথোচিত সুড়সুড়ি বা চিমটি কেটেই তাঁরা ক্ষান্ত হন। গল্পলেখক হয়তো গল্প বেশ ভালোই লিখে চলেছেন। কিন্তু শেষ করে হুঁচোট খেতে হয়। মনে হয়, এ কি হল? এর পয়েন্ট কোথায়? যদি বা থাকে, সেটা এমন কিছু নয় যার জন্য পাঠককে এতটা ধৈর্য্য বা সময় নষ্ট করতে হবে। তা ছাড়া, দু চারটে প্যাঁচ ও মোচড় কায়দা-মাফিক লাগিয়ে এমন একটা বাঁধা পথে এনে ফেলেন লেখক তাঁর বিষয়-বস্তুকে, যে গড়গড়িয়ে আপনি চলে যায়। সোজা সড়ক থেকে নেমে আশেপাশে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে হাঁটবার ভরসা নেই। আজকাল 'ইডিওলজির'

দাসত্ব। স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ও গভীরতায় সাহিত্যের বিচার চলবে না। দেখতে হবে তার প্ল্যান্‌টা কি? ছক কেটে বেরিয়ে যদি কেউ নতুন সাহসী পরীক্ষা করেন তা হলে সেটা নিরর্থক, নিরুদ্দেশ্য। কংগ্রেস সাহিত্যিক হলে ১৯০৬ কিংবা ১৯৩০ কিংবা ১৯৪২ সালের পটভূমি আর বিষয়বস্তু। ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়েও রচনা মন্ত্রমুখর। আর প্রগতিশীল লেখক হলে বেয়নেটের ছন্দের তাল তো আছেই। পাকা ধানের সোনার ফসল চোখে না দেখুন, তে-ভাগার নাম তো জানা আছে। ধানকানা না হলেই তালকানা। বড় লেখকেরাও চলতি পথের যাত্রী। 'ক্যারেকট্যর' অথবা চরিত্রগুলি টাইপস্‌ মাত্র। তারা পুরো মানুষ এবং স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে উঠতে জানে না। আর প্রেরণার বুদ্বুদ ফেটে গেলে, আঙ্গিকের কৌশলে অবচেতন মনের নিরুদ্ধ কাম-বৃত্তির চমকপ্রদ প্রকাশে সেটা পুষিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শক্তি আছে চিন্তা নেই; সত্যকল্পতা আছে, অভিজ্ঞতা বা জীবনবাহী উত্তাপ নেই। সুতো আলগা কিন্তু 'টুইস্‌ট' আছে। তেলের মধ্যে ভেজাল মিশিয়ে ঝাঁঝ ফোটান যায়। নয়তো বাসি চালের গুঁড়ো আর সস্তার সবেদায় রঙীন দরবেশ পাকানো চলে।

তা চলুক্‌। কিন্তু এ আত্মবঞ্চনা আর কতদিন? এখন একখানা কাগজ হাতে থাকলেই হল। অনেক সাহিত্যিকই হয় সম্পাদক, নয় প্রকাশক বনে যাচ্ছেন। দু' জনের হাতেই দলপতির চাবি-কাঠি। চটাবার উপায় নেই। স্তুতিবাদেই

কাজ সারতে হয়। সম্পাদকের মুষ্টি যতই শিথিল হোক, মুষ্টি-যোগের মাহাত্ম্য কিছু কম নয়। আর সে মুষ্টির ভিতর দিয়ে প্রাপ্তিযোগ আছে। অতএব গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে প্রশস্তি রচনাই যুক্তিসঙ্গত। আর সে সব প্রশস্তি স্বকীয় কাগজে অনায়াসে ছাপানো হয়। কেউ বা যুগান্তকারী কবি। শেক্‌সপীয়র দান্তে ছাড়া আর কোনও কবি তাঁর সমকক্ষ নন। কেউ বা অখাদ্য গদ্য লিখে প্রথম সুসভ্য গদ্য রীতির প্রবর্তক বলে আখ্যা পেয়ে থাকেন। কেউ বা গম্ভীর-মূর্খতায় ধূমায়িত বহ্নি। পাণ্ডিত্যে অথবা বামপন্থী সাহিত্যতত্ত্বে তিনি অদ্বিতীয়। কেউ বা নির্বান্ধব গোষ্ঠীপতি। নিজেই স্তাবকের অভাব পুষিয়ে নেন। আর যাঁর কেউ নেই, তাঁর প্রেয়সীর চুল আছে আর আছে ভাড়াটে ছাপাখানা। শুনেছি সাহিত্যিকরা নাকি ভয়ানক অভিমানী। সামান্যতম বক্রোক্তিতেই তাঁদের মানসিক ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা দিলে চলবে কেন? সাহিত্যের নামে যদি তাঁদের স্বাক্ষরে কোনও মাল চালান হয়, বাজারে তার পরখ হবেই। এবং লঘু-গুরু, প্রাসঙ্গিক ও অবান্তর মন্তব্যের জন্য তাঁদের প্রস্তুত থাকা উচিত। সমালোচনা সহ্য করার মতন সহিষ্ণুতা ও নিরাসক্তি না থাকলে এপথে পা বাড়ানো চরম নির্বুদ্ধিতা। "ইল্যুশ্যন" অথবা কোনও একটা রোমান্টিক মোহ নিয়ে প্রেমে পড়া যায়, ছেলেমানুষি করা যায় এবং তার ফলভোগও করতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞ সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ গুণ হল মোহনাশ। উর্ণনাভের তন্তুশোভা কেবল নিশির

শিশিরপাতে। তাই বলে পাঠক-সাধারণের ওপর অবজ্ঞার দৃষ্টি থাকলেই সেটা সৃষ্টির ইঙ্গিত নয় যেমন আত্মম্ভরী হলেই কালোয়াত হওয়া যায় না। বিদেশী সাহিত্যিকের অনেক নজির অবিশ্যি উদ্ধৃত করা যায়—যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পাঠক সমালোচকদের বুদ্ধিমান্ মনুষ্যপদবাচ্যই করেন নি। কিন্তু আভিজাত্য-বোধ থাকলেই স্রষ্টা হওয়া যায় কি? যারা পড়ে এবং মন্তব্য করে, তাদের কথাও কিছুটা ভাবতে হবে বৈ কি! এই একটা জিনিষ আমি বুঝতে পারি না। মুখে বলি, আমরা প্রগতিবাদী লেখক, 'পীপ্‌ল্'দের জন্যে লিখি, তাদের জাগ্রত করবার জন্যে কলম ধরেছি। অথচ মনের মধ্যে আছে সত্য অথবা মিথ্যা অভিমান,—বুদ্ধিজীবীর ঠুন্‌কো কাঁচের পাল্লায় সুবিধাবাদী লেখার প্রসাধন সাজিয়ে রাখি থরে-থরে। যখন যেটা চালু, পুঁজি থেকে সেইটে বার করি। দরকার মতন ব্যঙ্গ-কবিতায় কোনও মতবাদকে ধূলিসাৎ করি। আবার বাজারে চাহিদা বাড়লে সেই মতবাদকেই আশ্রয় করে ঝুলি-ভর্তি প্রশস্তি-মালার ফিরি করে বেড়াই। এই সব লেখক ভুলে যান, জনসাধারণের স্মৃতি-শক্তি স্বভাবতঃ দুর্বল হলেও বহুরূপীর সাজ ও ভোল্ ধরে ফেলে অনেক ক্ষেত্রেই। কয়েকটা দুর্বোধ্য 'কন্‌সীট' কিংবা অপ্রচলিত প্রতীকের সাহায্যে যেমন সত্যিকারের "প্রোগ্রেসিভ" লেখক হওয়া যায় না, তেমনি আবার সস্তা এবং পুরানো ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুকে ভিন্ন পরিবেশে সাজিয়ে দিলেই জনগণপ্রিয় যুগান্তকারী সাহিত্যিক হওয়া যায় না।

'প্যাবলিককে' পাঁঠার দল বলে উড়িয়ে দিলে নিজের গায়ের বোটকা গন্ধ ঢাকা যাবে না। 'কম্যুনিজম' করলেই প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়া যায় না, এটা ঠিক। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, 'কম্যুনিজম্'-বিরোধী হলেই সে লেখক মস্তবড় সাহিত্যিক নন্।

আসল কথা, বাঙলার লেখকদের মন এখনও খানিকটা তরল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দানা বাঁধছে অথবা বেঁধেছে। ভালো গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ যে লেখা হয় না—যেখানে বিশ্বাসের সততা ও আঙ্গিকের দৃঢ়তা আছে—এমন কথা বললে নেহাৎই নিন্দুকপনা করা হয়। কিন্তু কেমন যেন ভেস্তে যাচ্ছে। সবটা জমাট হচ্ছে না। যে কঠিনতায় সুষমাশুভ্র, বিচিত্র, পেলব তুষারকণা অনেক গুরু পদ-ভার সহ্য করতে পারে, পারানীর সঙ্কট থেকে বহু আশান্বিত, পীড়িত ও প্রতীক্ষমান মানুষকে উদ্ধার করতে পারে, সে কঠিনতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন 'আইসিং' লাগানো মিথ্যা-কঠিন কেক্। মুখে দেবার সময় একটু দাঁতের চাপ লাগে, এই যা। কিন্তু তারপরেই মিলিয়ে যায়। নানা রঙে ও কাজে বেশ সুন্দর করে তৈরি ও সাজানো। কিন্তু চকোলেট-ক্রীমে মুখ ভরে গেলেও কোথাও যেন বাসি নারকোলের গন্ধ।

এক কথায় সাজ-বাহার আছে। সাময়িক চরিত্র আর ব্যবহারিক মূল্যও আছে কিছুটা। কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার ফলে যে ক্ষয়িষ্ণু বিবর্ণতা, সেটা স্পষ্টই চোখে পড়ে। মধ্যবিত্ত ঘরের

অতি-প্রসবিনী রমণীর নীরক্ত সন্তানগুলি যেমন জীবনীশক্তির অভাবে স্বাভাবিক বুদ্ধি ও দীপ্তি নিয়েও ঝিমিয়ে থাকে আর তাদের জননী যেমন আপনার ক্ষীয়মান দেহ-সৌষ্ঠবের ম্লানতাটুকু সযত্নে ঢেকে রাখে, বর্তমান সাহিত্যিক নির্জীবতা দেখে সেই উপমাটাই বারবার মনে পড়ে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা এর জন্য অনেকখানি দায়ী, একথা খুবই সত্য। কিন্তু যে সাহসিক নিপুণতায় আর আন্তরিক কর্মচেষ্টায় অতি বড় দুর্দিনেও শিল্পী-সাহিত্যিকেরা দেশে-বিদেশে সৃষ্টির কাজ অব্যাহত রাখেন, প্রতিকূল অবস্থাকে অন্তত লেখনী দিয়ে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন, তার অভাবও লক্ষিত হচ্ছে। বিদেশী শাসন-শৃঙ্খল অপসারিত হলেও, প্রাক্তন অবচেতন আর অবদমনের গোপন কারসাজি এখনও চলেছে। সেই কারসাজির ফলেই আমাদের অনিচ্ছুকতা, পরাঙ্মুখতা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

ভাব-জগতে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে যখন যে আন্দোলনের ঢেউ জাগে, সেটা ধীর ও স্থিরভাবে গ্রহণ না করে আমরা হয় স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই, নয়তো সব নষ্ট হয়ে গেল এই ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। যদি নূতনকে বরণ করি, তা হলে সেইটেই শেষ কথা। তাকে পরখ না করে, যাচাই না করে অকারণে খানিকটা উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয় কিসে, প্রথমে সেই চেষ্টা করি। মজার ব্যাপার এই : যে কারণে সেটা

গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ নূতনত্বের যেটা মুখ্য দাবী ও আকর্ষণ, সেটা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। আর যেটা নিতান্তই বাহ্য আর গৌণ, অর্থাৎ উপলক্ষণ, তাই নিয়ে মাতামাতি করি। যে অনিবার্য সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কারণে নূতনত্বের জন্ম, তাগিদ ও প্রেরণা, সেই মূল সূত্রগুলি না তলিয়ে বুঝে শুধু বিচলিত হই মাত্র। এতে সৃষ্টি হয় না, হয় বিসৃষ্টি। কালগুণে এক একটা আন্দোলন ওঠে। তা নিয়ে তর্ক-আলোচনা চলে। সেটা প্রাণশক্তিরই লক্ষণ, রস-বিচারের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু হুজুগ হল অন্য জিনিস। তাতে কাজ এগোয় না। ভাব-প্রবণ, উত্তেজনাশীল অসংযত লেখক-শিল্পীরাই প্রগতির প্রধান শত্রু।

আর যাঁরা অতি মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, অন্তর্মুখী, কৈশোর-সুলভ আত্মপ্রীতি এবং সৌন্দর্যমোহে আপনাদের সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর মনটিকে মুড়ে রাখেন, তাঁরাও কিছু কম ধোঁয়ার সৃষ্টি করেন না। তাঁদের রচনার বর্ণ-মণ্ডলটি তাঁদের স্বকীয় মানস-দৃষ্টির অনুরঞ্জন মাত্র। ভাব-ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত কম বিষয়গত বলেই তাঁদের ব্যক্তিগত সাড়া পিছন দিকে প্রেরণা খোঁজে। বিবেকচালিত হয়ে, বর্তমানের সম্মুখীন হয়ে, তাকে বোঝবার চেষ্টায় যে কর্তব্য এবং দায়িত্ব আছে, সেইটাকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে চান। ফলে স্মৃতি-বিন্যাস আর অতীত প্রয়াণই তাঁদের কাছে বেশী কাম্য এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সাহিত্যের তিলাঞ্জলি। সেটাও কম

মারাত্মক নয়। গলা টিপে শ্বাসরোধ করাও খুন, আবার বহু দিন ধরে মর্ফিয়া-আর্সেনিক সেবন করানোটাও খুন।

আমাদের সাহিত্য এখন এই দোটানায় পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। দুই মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থেকে হয় নব জন্ম। আইরিশ নাট্যকার সিন্‌জ্‌ বলেছিলেন—'Is not style born out of the shock of new material?' কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সত্যিকারের 'শক্' এখনও আসেনি। শুধু কয়েকটা অনুভূতির স্পন্দন; সিজমোগ্রাফে ধরা পড়েছে বহু দূরের সূক্ষ্ম ভূ-কম্পন রেখা। যে প্রচণ্ড বেদনায়, অক্লান্ত সহন-সাধনার নিষ্ঠায় জীব-জন্মের সম্ভব হয়, সে বেদনায় আকস্মিক সত্যের চকিত দর্শন পাই মধ্যে মধ্যে। কিন্তু সে বেদনা-বোধ এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাতসার। মানসের বাধ্যতামূলক সৃষ্টি নয়। দ্বন্দ্বের সংস্থান কোথায় আর সমাধানের সূচনা কোথায়, এই কথা যদি আন্তরিকভাবে চিন্তা করা হ'ত, সংযম-সাধনায় পরীক্ষায় এবং বলিষ্ঠ প্রকাশে যদি সেই প্রতিপাদ্যকে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা চলত, তা হলে আমাদের সাহিত্যে এত দলাদলি, ব্যক্তিগত তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হ'ত না। প্রত্যাশী পাঠকরাও শুধু দ্বন্দ্বের আকর্ষণ-বিকর্ষণে দোলা খেত না। একটা কিছু চিন্তা বা বিষয়ের সুচিন্তিত এবং সুচিত্রিত বিকাশে তৃপ্ত হত। নৈরাশ্যজনিত আক্ষেপের জন্ম হয় নৈরাশ্য থেকেই। আমরা এখন দেখছি বুদ্ধি ও ভাব-জগতের মাৎসন্যায়, যেটা সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির বর্তমান পরিস্থিতিকে অনুসরণ করে চলেছে।

সমুদ্রের লবণাক্ত জল ছেড়ে ইলিশের দল মিঠে জলের সন্ধানে বহুদূর চলে আসে তাদের বার্ষিক দুঃসাহসিক অভিযানে। তারা নিয়ে আসে সমুদ্রের স্বাদ, নিয়ে যায় স্রোতস্বিনীর স্মৃতি। কাজটা স্থায়ী হয় না; দলভ্রষ্ট হয়ে অনেকেই মারা পড়ে। তবু সে অভিযান সাময়িক হলেও সার্থকতার আংশিক তৃপ্তি বহন করে অপরের মুখে।

আর ঝর্ণা ধারার খানিক দূরে উপল-ঘেরা একটুখানি জলাশয়ে বাস করে অজস্র ব্যাঙাচি। তারা ছোট ছোট লেজ নাড়ে কিন্তু স্থানচ্যুত হয় না। প্রাণপণে আঁকড়ে থাকে পাথরের গায়ে পুরানো সবুজ শ্যাওলাকে। অদূরেই তাজা জলের ফেণা, কল্লোল আর প্রবাহ। আশ্রয় ছাড়ার সাহস নেই। জীবন-লীলায় জীবনকেই ছলনা করে' চোখ বুজে মরা পাথরের রঙ দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নির্মূল জলজ শৈবালে পায় সামুদ্রিক বনের অতল ছায়া, ক্ষুদ্র পল্বলে দেখে বৃহৎ আকাশের খণ্ডিত স্বপ্ন। ভাবে—এই সত্য, এই পরম বিশ্রাম, শান্তির আশ্লেষময় আবেষ্টনীতে এই সম্পূর্ণ জীবন।

ভাঙ্গন নদীর নিমন্ত্রণ-কূলে বিস্তৃত পলিমাটি, তারও পিছনে দিগন্ত-প্রসারিত কুমারী মৃত্তিকা। রিক্ত প্রান্তর দেখি, বেদনায় বিহ্বল হই। কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিই না অথবা নির্ভুল সঙ্কেতকে ভুল ভাবি। ফসলের ইঙ্গিত ফলাই; শূন্য কুটীরে নিঃস্ব বৈরাগীর উদাসী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করি।

নয় তো মাত্র তিন বিঘা জমির জমিদারী নিয়ে আত্মগরিমায়

বিভোর থাকি। আগাছা ছেঁটে, সরু আল দিয়ে বেঁধে, খোঁচা-খোঁচা কাঁটা-তারের বেড়ায় ঘিরে জমিটুকুতে কেবল সবুজ ঘাসের স্বপ্ন দেখি। নিজের চোখের আর পীড়িত, নিরুদ্ধ মনের ক্ষুধা মিটিয়ে জগৎ-জোড়া ক্ষুধার নিরসন করি। ভাবি, সবাই চাষ-করা ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকুক।

এই যে চোখ বন্ধ করে থাকা, প্রকৃতিকে আপনারই আবেগ-বাহন কল্পনায় রঞ্জিত করে নিয়ে মানুষকে খাটো করে রাখা—এটাই হল কূপমণ্ডুকতা।

মণ্ডুকের কাছে কূপের মাহাত্ম্য অবশ্য অসীম। কেন না কূপোদকে স্নান-পান-তর্পণ সবই চলে। মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায়,—আকাশের অত বড় পরিধিটা কেমন সহজে আয়ত্ত হয়ে এসেছে! বার-দরিয়ার ঝড়-তুফানের বালাই নেই অথচ অন্তঃসলিলা ভোগবতীর উৎসারিত শান্ত প্রেরণায় হৃদয় কেমন ভরপুর। যতটুকু বাস্তবের উষ্ণতা সহ্য করা যায়, ততটুকু মেলে। বাঁধানো বৃত্তপ্রাচীরের মধ্যে শৈত্যের উৎপাত নেই। কোমল উত্তাপ আছে। অগ্নিময় গ্রীষ্ম আসুক; পাঁকের মধ্যেও আত্মগোপন করে বেঁচে থাকা এমন কিছু কষ্টকর নয়। খরস্রোত আর খরবায়ু—দুটোই অস্বস্তিকর।

কূপণ্ডুকের কথা লিখেছি এই কারণে যে, বর্তমানে আমার এই প্রবাস-গৃহে কয়েকটি কুয়োর ব্যাঙ নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি। আজ সারা সকালটা ওদের পিছনেই গেল।

নিজে ঠিক কূপমণ্ডুক নই। তবু বলতে পারি যে দুপাশে দুটি ছোট কিন্তু ফলবান্ পেঁপে গাছের মাঝখানে শান-বাঁধানো এবং চত্বর-ঘেরা ইঁদারাটি আমার বিশেষ প্রিয়। বাথরুমে গেলে যেমন গানের বেগ আসে, ঐ কুয়োতলায় গেলেই আমার ভাবাবেগ উপস্থিত হয়। শীতের প্রারম্ভে যতটুকু সূর্যের আলোর প্রয়োজন, সেইটুকুর সঙ্গে অল্প একটু ছায়া মেখে জায়গাটি সত্যি মনোরম। গা শিরশির করে অথচ চড়চড় করে না। প্রথম শীতের মিঠে আমেজ লাগে দেহে, আর ভাবনার বন্ধ কবাট যায় খুলে। ভাবছিলুম অনেক আজে বাজে কথা......

এমন সময়ে পুত্র শশব্যস্তে এসে খবর দিলে: "তুমি এখান থেকে একটু সরো। হরি, দেবেন, সুখিয়া, কণ্ঠি মালী, সবাই এসে গেছে......"

জিজ্ঞাসা করলুম: 'কেন এখানে কি হবে এখন?'

"বা রে! কুয়ো থেকে সেই ব্যাঙেদের তুলতে হবে না? তুমি যে বলেছিলে পরশু, এরি মধ্যে ভুলে গেলে?"

অদূরেই সাঙ্গোপাঙ্গরা দাঁড়িয়ে আছে। কুয়োর কাঁটা, দড়ি, ঝুড়ি, বালতি নিয়ে সবাই এমন ভাবে তৈরী যে, সমুদ্র-গর্ভ থেকে মুক্তা তোলার জন্য ডুবুরির দল সিগন্যালের প্রতীক্ষা করছে……

মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে ব্যাঙগুলোর সম্পর্কে একটা অন্যমনস্ক মন্তব্য করেছিলুম। তারই ফলে এই অভিযান। ক'দিন ধরে শুনছি: "কুয়োর মধ্যে যা ডাগর ডাগর ব্যাঙ ভাসছে—আবার ড্যাব্‌ ড্যাব্‌ করে চেয়ে থাকে, কি বিশ্রী! ঐ জল হাতে-মুখে নিচ্ছি, ভাবলেও গা কেমন করে!" কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতন নয়, কিন্তু কি-বা করা যায়। ব্যাঙের গায়ে বিষ আছে কি না আছে তা জানি না। তবে জলচর প্রাণী জলেই থাকে। ইঁদারায় ঝুঁকে পড়ে দেখলুম একদিন—একজোড়া বেশ হৃষ্টপুষ্ট ব্যাঙ। স্তব্ধ নিতল কুয়োটির মধ্যে পরম উদাসীনতায় দুজনে ভাসছে, দুদিকে মুখ ফিরিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন হয়তো শুরু হয়ে থাকবে। কিন্তু কোন অভিযোগ নেই। বিনা আওয়াজে, চুপ করে সিমেণ্ট করা প্রাচীরের গায়ে অসীম সহিষ্ণুতায় লগ্ন হয়ে আছে। পুত্র একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করার ফলে জলে একটু আলোড়ন হল। ওরা দুজনেই সরে গেল—এবার পাশাপাশি। উঁকি দিয়ে দেখছি, এমন সময়ে শীতের এক টুকরো ময়লা মেঘ নড়ে উঠল। হঠাৎ ওদের ওপরেই ঝক্‌মকিয়ে উঠল অনেক উঁচু নীলের পরিষ্কার ছায়া আর তারি কোলে উড়ন্ত পাখীর দু'একটা অস্পষ্ট ফোঁটা। মনটা খারাপ হয়ে গেল……ইঁদারার জলের গভীর কালোয়

ওদের পিঠের শ্যাওলা-সবুজ রঙ আর ওপরের সাদাটে নীল—সব মিশিয়ে একটা কাব্য-দর্শনের ভ্রূণ সৃষ্টি করলে। বললুম: "আহা বেচারী! চিরজীবন এই কূপের মধ্যে ওরা বন্দী আছে এবং থাকবে। যতদিন পরমায়ু, ততদিন সাঁওতাল পরগণার এই অখ্যাত জায়গাটিতে নিভৃত ও সংক্ষিপ্ত পরিসরেই ওদের বেঁচে থাকতে হবে। ওদের মুক্তি দিলে কেমন হয়?"

কথাটি বড় ধরল পুত্রের কল্পনাপ্রসারী মনে। বালকোচিত উৎসাহে প্রশ্ন করলে: "কবে তুলবে ওদের? চিনা-বাদাম আর পালং শাকের ছোট্ট ক্ষেত দুটোর মাঝখানে যে সরু নালীটা রয়েছে, ঐখানে বেশ ঝির-ঝিরে বালির ওপর দিয়ে জল আসে মালীর বাগানের চৌবাচ্চা থেকে। পেছনেই পেয়ারা গাছের ছায়া……কোনও কষ্ট হবে না……"

শিশু কন্যা মাথা দুলিয়ে দাদার কথায় সায় দিলে: "নাঃ, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। এইখানে উঠে এসে ওরা বেশ খেলা করবে, আমরা দেখবো। তখন কেমন মজা হবে!"

মজা হল। একটা ছেলেমানুষী প্ররোচনায় মেতে উঠলুম। কাজ আরম্ভ করে কিন্তু দেখা গেল, সত্যিই কঠিন। বালতি ফেললে জলে প্রথমতঃ শব্দ হয়। সন্তর্পণে নামালেও ব্যাঙকে তার মধ্যে ধরা যায় না। বেতের ঝুড়ি অচল। ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, কেবলি ভাসতে থাকে। অবশেষে একটি কেরোসিনের খালি টিন যখন অর্ধেক ভর্তি হয়েছে, একটি ব্যাঙকে তার মধ্যে কোনও প্রকারে বন্দী করা গেল। শূন্যপথে

যখন কপি কলের সাহায্যে টিন উঠছে, তখন নির্ভুল একটি তাগ্‌ করে লাফ দিতেই আমার বন্দী আবার ইঁদারার জলে আত্মগোপন করলে। নানাবিধ চেষ্টা করা গেল, কিন্তু কোনটাই সফল হল না। অনেক বেলা হয়ে গেছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাই তখন উত্তেজনায় অধীর এবং অন্যমনস্ক। শেষকালে মগজে এক প্রেরণা এল। একটা ছেঁড়া মশারির দুই প্রান্তে দুটি রশি বেঁধে ইঁদারার দুই দিক থেকে দুজনে আস্তে আস্তে সেটা ঝুলিয়ে দেওয়া গেল। অশেষ কসরতের ফলে ভেক-দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। তাদের তুলে এনে বাগানের ছোট্ট চৌবাচ্চার নালীটার পাশে যখন রাখা হল, তখন উভয়েই হাঁপাচ্ছে। রোদে আমাদের পিঠ ও মাথা গরম, উত্তেজনায় শ্বাস বেশ দ্রুত হয়ে উঠেছে। পুত্রের মুখে জেনারেল 'মন্টি'র বিজয়ী উল্লাস।

আমাদের সাধু ইচ্ছা এবং পরোপকার সাধনা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল। বিকেল বেলায় দেখা গেল, একটি মৃত। চিৎ হয়ে অগভীর জলে ভাসছে। অপরটি খাবি খাবার জোগাড়।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জীবন্মৃত, সাথীহীন মণ্ডুককে পুনরায় তার আবাসস্থলে নামিয়ে দেওয়া হ'ল। আশ্চর্যের বিষয় সেটি বেঁচে আছে আজও। অপরটিকে যথাবিহিত সংকার করে মনে মনে আমাদের সদিচ্ছা-প্রণোদিত অপকর্মের মারাত্মক পরিণতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলুম। প্রতিজ্ঞা

করলুম, অপরের কাজে অথবা জীবন-যাত্রায় অযথা হস্তক্ষেপ কখনো করবো না। যেটা মনে হচ্ছে ভালো কিংবা প্রয়োজনীয়, সেটা অপরের পক্ষে একান্ত মন্দ অথবা নিষ্প্রয়োজন হতে পারে, এ সত্যটি তো হাতে-নাতেই প্রমাণ হয়ে গেল। আমার এ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যদি আর কিছুকাল স্থায়ী হয়, তাহলে আদর্শ গৃহস্বামীর সার্টিফিকেট নিশ্চয়ই মিল্‌বে, এমন আশা পোষণ করি।

কিন্তু ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের সাহিত্যে, জীবনে ও সমাজে যে কূপমণ্ডূকতা লক্ষ্য করি, সেটা আমাদের নিত্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই অপরিহার্য হয়ে গেছে। হঠাৎ আগল ভেঙ্গে যদি বেরিয়ে আসি, পুরানো জীবনের ঘুণ-ধরা ভিত্তি যদি নড়ে ওঠে কোনো কারণে, বহু দিনের অভ্যাস আর সংস্কার যদি টলমল করে ওঠে কোনো অত্যাবশ্যক অবস্থান্তরে, তা হলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ যাবে কেটে। হয়তো মারাই পড়বো। শুধু তাই নয়,—কোনও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটে গেলেও অনেক দিন পর্যন্ত আমরা সেটাকে অস্বীকার করতে থাক্‌বো। আমাদের কুনো অপবাদটা একেবারে মিথ্যা বা অতিরিক্ত নয়। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত বাঙালী কয়েকজন একত্র বাস করলেই প্রবাসে একটি দল গড়ে ওঠে। উদরান্নের খাতিরে মুখে কিছু না বললেও রবিবাসরীয় মজলিসে অন্নদাতা প্রদেশের অধিবাসীদের মুণ্ডপাত করে থাকি। বাঙ্গালীর উদারতার সুবিধে নিয়ে অপরাপর প্রদেশের লোকেরা কেমন

গুছিয়ে নিচ্ছে, সে খবরটা আংশিক সত্য হলেও, সমস্ত ক্ষণ অবিচারের প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে কাজ করি। বাঙালীর প্রতি অবাঙালীর মনোভাব আজ সুস্পষ্ট। সমাজে এবং আন্তঃপ্রদেশিক ব্যবহারে সেটা ক্রমশঃ রূঢ় মূর্ত্তি নিচ্ছে। কিন্তু কেন ?

এতো দিন ধরে বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশীদের খাইয়ে, লেখা পড়া শিখিয়ে আমাদের অদৃষ্টে এমন পুরস্কার জোটে কেন ? এ প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব : আমরা মনে-প্রাণে কর্ম্মক্ষেত্রকে গ্রহণ করি নি। অর্থ উপার্জন করেছি, স্বদেশে জমি কেনার জন্য টাকা জমিয়েছি, ঘরে মনি অর্ডার করেছি নিয়মিত। সে অঞ্চলের লোকদের কৃপাচক্ষে দেখেছি। পরচর্চা করেছি, থিয়েটার করেছি। কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেছি, কমিটিও গঠন করেছি আর শনিবার রাত্রে ব্রিজ খেলে পাঁঠার মাংস খেয়েছি। সে মাংস হজম হয়ে গেছে। কিন্তু এ্যাসিডের আধিক্যবশে মনের গাঁটে গাঁটে বাত ধরিয়ে দিয়েছে।

বাঙালীকে কূপমণ্ডুক অপবাদ দিলে শুনতে হয়ঃ 'কেন ইংরেজ জাতটাই তো গোমড়া-মুখো। সারা য়ুরোপ এক ট্রেণে একই কামরায় গেলেও সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমাতে ইংরেজ জানে না। মুখের ওপর গাম্ভীর্যের মুখোস টেনে বসে থাকে, নয়তো খবরের কাগজ আড়াল দিয়ে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে। কেউ কেউ আলাপ করলে বড় জোর 'ফাইন্ ওয়েদার' বলে আবার থম্‌থমে হয়ে যায়।'

কথাটা ঠিক। বাইরে থেকে ইংরেজ যেমন অমিশুক এবং এবং অসামাজিক বলে মনে হয়, অন্য কোনও জাতের মানুষ অমন হয় না। ফরাসীরা স্ফূর্তিবাজ, স্পেন-ইতালীর লোক দ্রাক্ষারসে স্নিগ্ধ হয়ে একটু বেশী কথা বলে। রুশ জাত না কি বাঙালীর মতনই, তর্ক আর আলোচনার গন্ধ পেলে আর কিছু চায় না, নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। তবে ইংরেজকে যতখানি অসামাজিক এবং রসজ্ঞানবর্জিত মনে হয়, ততখানি সে নয়। মাত্রাজ্ঞান, শোভনতা, রুচিজ্ঞানের আতিশয্য বশেই সে বেশী চুপ করে থাকে। নইলে তারও রসবোধ আছে, আছে অতিথি-পরায়ণতা। প্রিস্ট্‌লি সাহেবের একটা চমৎকার প্রবন্ধ আছে ইংরেজ জাতীয় চরিত্রের ওপর। সে যাই হোক, ইংরেজ বাইরে

কূপমণ্ডূক যদি বা হয়, ঘরে সে অন্য মানুষ। আমরা মনের মধ্যে ঘরের মধ্যে কূপমণ্ডূক। বাইরে ফড়ফড় করি, গায়ে পড়ে আলাপ জমাই, স্থানে অস্থানে অন্তরঙ্গতার দাবী জানিয়ে মাত্রাহীনতার পরিচয় দিই, কেউ সাড়া না দিলে বিশেষ করে বিদেশীকে ধরে বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতির বড়াই করি।

কিন্তু গায়ে পড়ে আলাপ-জমানোর চেষ্টা, একটা ক্ষীণ সূত্র ধরে খামকা নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাকে জাহির করার চেষ্টা অথবা অকারণে অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনে, সস্তা এবং পুরানো রসিকতার সাহায্যে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা কিংবা দু মিনিটের আলাপে হৃদয়ের কবাট খুলে একেবারে গোপন পারিবারিক সংবাদ শুনিয়ে দেবার চেষ্টা, এগুলো যত বড় হৃদয়বত্তার পরিচয় হোক না কেন, বিরক্ত না হয়ে তাদের প্রসন্ন মনে গ্রহণ করা রীতিমত কঠিন। যিনি পারেন, তিনি মহাপুরুষ।

আর যিনি অযাচিতভাবে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে চেষ্টা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি কৃতকার্য হন না। উল্‌টে অনেক সময়ে অসহিষ্ণুতা এবং সন্দেহের উদ্রেক করে বসেন। হয়তো বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এসেছেন কারুর সঙ্গে দেখা করতে। এদের যদি তিনি সূক্ষ্ম স্তুতিবাদ না করে স্থূলভাবে নিজেকেই জাহির করতে শুরু করেন, তা হলে যাঁর কাছে প্রার্থী হয়ে আসা, তিনি মনে মনে চটবেনই। যেখানে বিনয়-নম্রতার প্রয়োজন, সেখানে নিজের কথায় সাত কাহন করে আপনারই বিচার-বুদ্ধির বিজ্ঞাপন দিলে কাজ উদ্ধার হবে কি

করে ? আসল কথা—আমাদের প্রধান অভাব হচ্ছে 'ট্যাক্ট'। কথাটার মধ্যে একটু পালিশের গন্ধ আছে। সোজা অপ্রিয় কথা এড়িয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে কাজ আদায় করার ইঙ্গিত আছে। তা থাকুক। আমরা বড় বেশী হৃদয় মেলে ধরি। আর একটু হৃদয় সঙ্কোচ করলে বাঙালীর বুদ্ধি-সঙ্কোচ হবার আশঙ্কা নেই। ইংরেজ যেমন বেশী ফর্মালিষ্ট, আমরা তেমনি বেশী 'সিন্‌সিয়ার'। এই 'সিন্‌সিয়ারটি' অথবা আন্তরিকতার আতিশয্যেই বাঙলার সমতট হৃদয় প্লাবিত। আরামে ও ভোজনে তৃপ্ত করে, মনে সুড়সুড়ি দিয়ে অনেক পয়মাল আমরা চালান করতে শিখেছি। আমরা আন্তরিক, তাই ফুলশয্যার রাতে নববধূর কাছে সমস্ত অতীত একেবারে উজাড় করে দিই। পরের কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। তাই হাম্‌লে পড়ে পরোপকার ব্রতে আত্মনিয়োগ করি। প্রতারিত হলে আত্মদুঃখে বিভোর হয়ে পরকে ধরে আপনার বুদ্ধিহীন উদারতার জন্য আক্ষেপ করি। অযথা কষ্ট দিতে ভালোবাসি না। তাই সহযাত্রীকে চোখ রাঙাই আবার রেল কোম্পানীর কর্মচারীকে সামান্য একটু সুবিধা দানের কৃতজ্ঞতায় জলপানি দিই।

রেল কোম্পানীর উল্লেখ করতে গিয়ে মনে পড়ল আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গায়ে পড়ে আলাপ জমানো আর অকারণে বেশী কথা বলে সহযাত্রীকে উত্যক্ত করা, এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলবে রেল ভ্রমণে। ট্রেনের কামরায় যে অন্তরঙ্গতা ও সাহচর্য, তা যেন মনে হয় বহু জন্মের বন্ধুত্ব। অথচ কামরায়

প্রথমে ওঠা নিয়ে দুই সহযাত্রীর মধ্যে যে বাক্যযুদ্ধ হয়েছিল, সেটা যে কি আশ্চর্য উপায়ে মুষ্টিযুদ্ধে পরিণত হতে পায়নি, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। প্রথমে অশুদ্ধ অনর্গল ইংরেজি, অতঃপর তৃতীয় পক্ষের লজ্জা-দানে রাষ্ট্রভাষার চোস্ত ব্যবহার। কিন্তু দশ পনের মিনিট পরেই দুজনে পাশাপাশি বসে সাংসারিক সুখ-দুঃখের অথবা নরাধম ভাইপোর অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেছেন। কি করে এটা সম্ভব হয়, সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। স্বাধীনতায় আমাদের কি লাভ হয়েছে তা ঠিক জানি না—মানে এখনও পুরোটা সমঝাতে পারিনি। তবে ইংরেজ চলে গিয়ে আমাদের মুখ আর কলম যে বেপরোয়া হয়েছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আগেকার দিনে শিক্ষায়তনে, কর্মস্থলে যেটুকু নিয়মানুবর্তিতা অথবা সংযম-শালীনতার বালাই ছিল, এখন সেটুকু ঘুচে গিয়েছে। ভালোই হয়েছে। মন আর হৃদয় যা বলে, যা চায়, তাই করা বোধ হয় সঙ্গত। তাকে ঢেকে রেখে চাপা দিয়ে কাজ কর্‌লে 'সিন্‌সিয়ার' হওয়া যাবে না তো! আশা করি—এই সরল সত্য কথা নিরীহ মনে বল্‌লে দেশদ্রোহিতার অপবাদ কিনতে হবে না। দীনবন্ধু মিত্র থেকে শুরু করে রসরাজ অমৃতলাল, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লেখকই ইংরেজ-নবিশদের ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। বর্তমান যুগে ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালের পর যে নব্য বাঙলায় উৎকট স্বদেশিয়ানার জন্মলাভ হল, তার যথাযথ সরস চিত্র নিরপেক্ষ শিল্পীর তুলির প্রতীক্ষায় বসে আছে। অবশ্য একটা

কথা ঠিক যে স্বাধীনতা হঠাৎ এসে পড়াতে এখনও আমরা ধাতস্থ হইনি। অগভীর খাতে দামোদরের প্রবল বন্যায় কেমন যেন চঞ্চল ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছি। দামোদর পরিকল্পনা কাজে পরিণত হলে সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি আর কৃষি-লক্ষ্মীর উন্নতি সাধনে উদর-তৃপ্তির উপকরণ করায়ত্ত হলে এ রকম বেসামাল ভাবটা হয়তো কেটে যাবে।

তবু আকস্মিক অন্তরঙ্গতার উৎপাত কমবে কি? অযাচিত হিতোপদেশ?

মনে করুন—স্বাধীন দেশের রেল কামরায় চলেছেন লম্বা সফরে। মাঝ পথের একটা ষ্টেশনে অনেক যাত্রী নেমে গেল। গাড়ীটা খালি খালি। মনে মনে ভাবছেন, বাঁচা গেল। একটু হাত-পা ছড়িয়ে আরামে যাওয়া যাবে। বিছানাটি টান করে পাতবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময়ে বহু তল্পি-তল্পা সমেত এবং কয়েকটি জীবন্ত পোঁটলা নিয়ে এক ক্ষীণকায় ভদ্রলোকের আবির্ভাব হল। অনেক সোরগোলের সৃষ্টি করে, আপনার মালপত্রগুলি এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে তিনি কাছে এসে আপনার বিছানায় পা দুটি মুড়ে বসলেন। তারপর পরমাত্মীয়ের মতন হঠাৎ আপনাকে প্রশ্ন করলেন, "দাদা যে দেখছি একলা!" আপনি যতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন, ততক্ষণে তিনি আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন—তাঁর নাম-ধাম, গোত্র-নিবাস। কোথায় তিনি যাচ্ছেন আর কতদিনই বা সেখানে থাকবেন, ফেরবার পথে বর্ধমানে নেমে বড় মেয়েটাকে নচ্ছার

শাশুড়ীর কবল থেকে কয়েকদিনের জন্য উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন—এ সব কথা বলা হয়েছে ইতিমধ্যে। "মাইনেটা এবার তিনশো হল, তাই সেকেণ্ড ক্লাশ পাশ মিলেছে। তবে রেলের চাকরিতে আর সুখ নেই দাদা, উপরি কমে গেছে। তার ওপর মেজ মেয়েটা, ঐ যে বসে আছে, যা বাড়ন্ত গড়ন…হাতে পাত্তর টাত্তর আছে না কি?" বলেই, 'ওগো'র কাছ থেকে ভারি পানের ডিবেটা নিয়ে একটি সগুণ্ডী বোটকা গন্ধের পান চুন-খাওয়া এঁটো হাতেই আপনার মুখে গুঁজে দিতে আসেন। তখন আপনি কি প্রতিদান দেবেন?

গায়ে পড়ে আলাপ যেমন মানুষের কাছে বিরক্তিকর লাগে, গায়ে পড়ে কৈফিয়ৎ দিতে আসাটাও তেমনি রীতিমত অস্বস্তিকর। যিনি কৈফিয়ৎ দিতে আসেন, তিনি নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে অপ্রস্তুত বোধ করেন কিংবা কোনও কারণে আপনাকে একটু দোষী মনে করেন। তাই কৃতকর্মের সাফাই না করলে তাঁর অস্বস্তি। কিন্তু তিনি যতই আত্মস্ফালনের চেষ্টা করুন না কেন, তাঁর ত্রুটির কিছুমাত্র লাঘব হয় না। বরঞ্চ বেড়েই চলে। তার চেয়ে তিনি যদি দয়া করে একটু নীরব থাকেন, তাহলে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে। তাঁর সত্যিকারের ত্রুটি অতখানি প্রকট হয়ে ওঠে না। আর যাঁরা শুনছেন, তাঁদেরও অকারণ স্নায়ুপীড়া ঘটে না। আসল কথা, এই কৈফিয়ৎ দিতে আসাটাই এক রকম 'ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স'।

ট্রামে-বাসে কত লোক স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় পা মাড়িয়ে দেয়, ধাক্কা দেয়। আমরা সাধারণ পথচারী সেটা গায়ে মাখি না। কারণ চলতি পথে যান-বাহনের মধ্যে প্রাইভেট মোটর গাড়ির নির্ঝঞ্ঝাট আরামটুকু প্রত্যাশা করাই অন্যায়। কিন্তু সাধারণ একটু ভদ্রতাজ্ঞান অথবা 'সিভিক সেন্স' প্রত্যাশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। পয়সা বেশি খরচ করে ট্যাক্সি চড়তে পারছি

না, এটা অবিশ্যি খুবই দুঃখের বিষয়। আর শহরে অসম্ভব লোকাধিক্য হয়েছে, যার জন্য অর্ধেক লোক ফুটবোর্ডে, ম্যাডগার্ডে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে—এটাও প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু তাই বলে সকলের অসুবিধা সমানভাবে ভাগ করে না নিয়ে নিজের সুবিধাটুকু বাগিয়ে নেবার চেষ্টাটা যদি অশোভনভাবে প্রকাশ হয়, তাহলে সেটা শুধু চোখেই লাগে না, মনেও লাগে। উপরন্তু যিনি সকলের সামনে আপন স্বার্থপরতার দৃষ্টান্তটি জাহির করলেন, তিনি যদি কাজটা এমন কিছু খারাপ হয়নি, এই মর্মে একটি বক্তৃতা ফাঁদেন, তাহলে শ্রোতা এবং দর্শকের মন অসহিষ্ণু এবং বিরক্ত হবেই। দুনিয়াটা শক্তের ভক্ত—একথা অনেকটাই খাঁটি। কিন্তু তাই বলে যিনি অপকর্ম করেন, উপরন্তু চোখ রাঙান অর্থাৎ যা বলছি তাই শোনো এবং মেনে নাও—এইভাবে কথা কন, তাঁকে দুনিয়ার লোক মেনে নিতে রাজি হয় না, হবেও না। গায়ের জোর যার কম, সে ব্যক্তি চুপ করে থাকবে—এই পর্যন্ত। কিন্তু অপরের গা-জুরিটাও মনে মনে সহ্য করবে না, এটা ঠিক। যিনি অকারণে চেঁচামেচি করেন, অভদ্রতা করে পাঁচটা বাজে তর্কের সৃষ্টি করেন, 'বুলি' করে আত্মসমর্থনের দাবী করেন, তাঁর সাহসটা আসলে কাপুরুষের বদসাহস।

কথাটা শুধু পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, মেয়েদের ক্ষেত্রেও। এমন স্ত্রীলোক আছেন, আপনারা অনেকেই হয়তো দেখেছেন—যাঁরা অল্প উত্তেজনাতেই তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দেন।

অন্যায় করেন, অথচ এমন ভাব দেখান যেন এই গলাবাজি নিতান্তই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। শান্ত এবং শান্তিপ্রিয় আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে শ্লেষবাক্যে জর্জরিত করে ঈর্ষ্যা-নীচতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে হয়তো বড় গলায় বলেন, ভবিষ্যতে ভালোর জন্যই আর সাংসারিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্যই অপ্রিয় এবং কটু কথা বলাও মাঝে মাঝে দরকার। অথচ এঁরা অন্যের কথা, এমন কি, মৃদু ইঙ্গিত পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পারেন না। আসলে এ সব মানুষের মর্যাদা-জ্ঞান খুবই কম।

এই কৈফিয়ৎ আর সাফাই অর্থাৎ ভজাভজির ব্যাপারটা শুধু সংসারের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজের বিস্তৃত সংস্পর্শেও ওর নজির দেখা যায়। বেশির ভাগ দেখা যায় এমন সব জায়গায় যেখানে লোক-সমাগম বেশি অর্থাৎ সিনেমায়, সভা-সমিতিতে, পোষ্ট অফিসে কিংবা ট্রাম-বাস, ট্রেন-ষ্টীমারে মানুষের এই প্রবৃত্তিটা কেমন যেন বিশদভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অপরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিজের একটুখানি সুবিধা নেবার এই নিরন্তর এবং আপ্রাণ চেষ্টা বহু সময়েই হয়তো আপনার চোখে পড়েছে এবং বিরক্তির উদ্রেক করেছে। সকলেরই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আশা করি। চলতি পথে কত দৃশ্যই চোখে পড়ে মানুষের। যেগুলো খারাপ লাগে, সেগুলো কিছুটা হেসে উড়িয়ে দিতে হয়, নয়তো চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু ওরি মধ্যে কয়েকটা ঘটনা মনের মধ্যে গেঁথে থাকে যা সহজে ভোলা যায় না।

যাচ্ছি বাসে চড়ে। এক হাতে একটি বড় প্যাকেট। অপর হাতে ব্যালেন্স রক্ষার চেষ্টায় মাথার ওপরে লোহার ডাণ্ডা আঁকড়ে আছি। কনডাক্টর দু-একবার টিকিটের জন্য কাছে এল। কিন্তু কি করি? অন্য দিন পয়সা হাতেই রাখি, এলেই দিয়ে দিই। আজ দুটো হাতই আবদ্ধ। ব্যাগ বার করে পয়সা গুণে দেওয়া সত্যিই অসম্ভব। ছুটন্ত বাসের আঁকাবাঁকা গতির মধ্যে টাল সামলে আর হঠাৎ ঝাঁকি দিয়ে থেমে পড়ার অবসরে একটি হাতও পকেট খুঁজে পাচ্ছে না। ইত্যবসরে সামনের এক সীট থেকে এক ভদ্রলোক উঠলেন। ভাবছি ঐ জায়গাটা দখল করে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে পয়সা বার করব। কিন্তু ঐ নিমেষের ভাবনার অবকাশে এবং চকিতে পলক ফেলার অবসরেই পিছনের এক ভদ্রলোক কি অদ্ভুত কায়দায় কনুই দিয়ে আমাকে ঠেকিয়ে রেখে পাশ কাটিয়ে এবং পা মাড়িয়ে দিয়ে ঐ জায়গাটুকুর সঙ্গে এঁটে গেলেন, তা ভালো করে বুঝতেই পারলুম না।

কিন্তু ব্যাপারটা গড়ালো আরো কিছু দূর। পাশেই আর একটি সীট খালি হতে বে-দখলকারী ভদ্রলোক এক গাল আপ্যায়নের হাসি হেসে বললেন, 'বসুন না, এই যে জায়গা হয়েছে।' অযাচিত আহ্বানের প্রত্যুত্তরে কিছু না বলেই বসে পড়লুম। তবু ভদ্রলোক রেহাই দিলেন না। বলে চললেন, 'আপনার পেছনেই ছিলুম। ভদ্রলোক উঠবার চেষ্টা করতেই আমায় এগিয়ে আসতে হল। আপনি ইতস্তত করছেন দেখে

মনে হল, আপনিও বুঝি নামবেন। তাছাড়া দেখছেন তো, হাতে এই থলে নিয়ে...কিছু মনে করেন নি তো?'

বিরস বদনে বললুম, 'নাঃ—তাতে আর কি হয়েছে? তবে আপনি যে রকম হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লেন, তাতে মনে হল... মানে অবাক্ হয়ে গিছলুম, এই আর কি।'

'ও কথা আর বলবেন না মশাই! ভিড়ের মধ্যে কত কষ্ট আর কসরৎ করে একটু জায়গা করে নিতে হয়, বুঝলেন না...'

'তা বুঝেছি। তবে সবাই যদি ধীরে সুস্থে...'

'তা যদি বলেন, অনেক কথাই এসে যায়। কি জানেন—তাড়াহুড়ো করাটা আমাদের জাতের স্বধর্ম।'

বললুম, 'এতো তুচ্ছ কথায় জাত আর ধর্ম এনে ফেলবেন না। ওটা হল ব্যক্তিগত স্বভাব অথবা প্রবৃত্তি।' ভদ্রলোক ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলেন। বললেন, 'এটা কি এমন নীচ প্রবৃত্তি হল মশাই?'

বলতে বাধ্য হয়েছিলুম, 'কথাটা যদি পছন্দ না হয়, ফিরিয়ে নিয়ে বলছি— উঞ্ছবৃত্তি।'

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ হল তাকে বাধ্য হয়ে ভদ্রতার মুখোস পরে এমন লোকের সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা করতে হয় কিংবা এমন মানুষ নিয়ে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করতে হয়, যাকে দেখলে শরীর আতঙ্কে বা বিরক্তিতে শিউরে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার নেই। নিরুপায় অক্ষম আক্রোশের অনির্বাণ আগুনে নিজেই দগ্ধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সভ্যতার কৌমযুগে মানুষ দল বেঁধে বাস করত। কেননা, তখন দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে পরিবার, কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গোষ্ঠী, আবার কয়েকটি গোষ্ঠী নিয়ে একটি ছোট সমাজ। সেই সব সমাজ দলবদ্ধ হয়ে একটি জাতি বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হত। তখনকার দিনে এমন সঙ্ঘবদ্ধ জীবন ছিল যে, গোষ্ঠী বা সমাজ বা দলের বাইরে কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না। প্রাচীন কালে প্রত্যেক সুসভ্য দেশের ইতিহাসেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করা যায়। ভারত, মিশর, চীন, গ্রীস ও রোম, সর্বত্রই গোষ্ঠী ও সমাজের নেতৃত্বে এবং নির্দেশে ব্যক্তির জীবন চালিত হত। কৃষি-সভ্যতার যুগে এ প্রথার বিকাশ হয়। গোষ্ঠীপতি, গ্রামবৃদ্ধ, সমাজের নায়ক—এঁরাই সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার

জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁদেরই সুচিন্তিত নির্দেশে জমি বিলি এবং কৃষি-ক্ষেত্র বণ্টন করা হত এক-একটি পরিবারের আয়তন ও চাহিদা অনুসারে। জীবন ছিল সমষ্টিগত, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থান বা অবসর ছিল না বললেই হয়। পরিবারের যিনি কর্ত্তা, অথবা গোষ্ঠীর যিনি চালক, তাঁর মতামত না মেনে উপায় ছিল না। কেননা পিতৃ-তন্ত্র-চালিত পরিবার ও সমাজের অনুশাসন অমোঘ, অলঙ্ঘ্য।

বর্তমানে পরিবার-বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে গিয়েছে। য়ুরোপ, এমন কি, প্রাচ্য ভূখণ্ডে বহু সংরক্ষণশীল সমাজেও পারিবারিক জীবন-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে কিংবা পেতে বসেছে। কাজটা ভাল অথবা মন্দ, পরিবর্তনটা নিস্প্রয়োজন অথবা ন্যায্য ও স্বাভাবিক, তার বিচার করবেন সমাজতত্ত্বজ্ঞ চিন্তাশীল ভাবুক ও লেখক সম্প্রদায়। আমরা শুধু, দেখি, সমাজ-গঠনের ধারা ধীরে ধীরে বদলেছে এবং প্রধানত অর্থনৈতিক সমস্যার চাপেই সে বদলটা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় বলেই বিবেচিত হয়েছিল। কেন এই পরিবর্তন দরকারী মনে হয়েছিল, সেটা জানা দরকার। কৌমযুগের প্রথম দিকটায় অধিকাংশ দেশেই গোষ্ঠী আর সমাজপতিদের নেতৃত্ব স্বীকার করা হয়েছিল উপায়ান্তর ছিল না বলে। কিন্তু ক্রমশঃ বিরক্তির ভাব ঘনিয়ে উঠতে লাগল। ব্যক্তি যখন স্বাধিকার খোঁজে, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা কামনা করে, অর্থনৈতিক চাপে পিষ্ট আর স্বাতন্ত্র্যবিরোধী সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বন্দী থাকতে আর

রাজি হয় না—তখন পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে কৃষি-সভ্যতার যুগ অস্তমিত হয়ে এল। যন্ত্র-শিল্পের ক্রমোন্নতির ফলে ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ-উপার্জন, সম্পত্তি-সঞ্চয় সহজ হতে লাগল। বৃহৎ গোষ্ঠীর স্বৈরাচার তখন অঙ্গীকার করে নেওয়া কষ্টসাধ্য। ওরি মধ্যে উদ্যমী ও উৎসাহী ব্যক্তিরা পৃথক পরিবার স্থাপন করতে শুরু করল আপনাকে কেন্দ্র করে। কেউ বা দেশেই রইল স্থানান্তরে সরে গিয়ে। কেউ বা দেশান্তরী হল ভালো জমি, নূতন জায়গা, আর ভাগ্যোন্নতি লাভের আশায়। এইভাবে বৃহৎ সভ্যতার গোষ্ঠী-পরিবারভুক্ত অসন্তুষ্ট এবং সাহসী লোকের দল পারিবারিক জীবনের কঠোর বন্ধন কাটিয়ে দূর দেশে গিয়ে ঘর-সংসার পাতল। গড়ে উঠল ঔপনিবেশিক বসতি। রাষ্ট্রনায়করা বাধা দিল না, বরঞ্চ উৎসাহ দিল আপনাদেরই স্বার্থের খাতিরে। বিশিষ্ট শ্রেণী ও সমাজের হাতে তখন শক্তি এসেছে। নিঃসম্বল ভূমিস্বত্বহীন অসন্তুষ্ট মানুষ দলবদ্ধ হলেই জিজ্ঞাসা ধূমায়িত হবে বিপ্লবে। পরে সুবিধামত রাষ্ট্র এগিয়ে এসে সেই সব ঔপনিবেশিক বসতিগুলি বাণিজ্য-রক্ষার অছিলায় করায়ত্ত করে নেবে।

আড়াই হাজার বছরেরও আগে এই আন্দোলন শুরু হয় গ্রীসে তার প্রথম সূত্রপাত। রোম্যান সাম্রাজ্যবাদে তার স্বাভাবিক রূপান্তর। কত কাল কেটে গিয়েছে। মাঝে কত নূতন আন্দোলন ও পরীক্ষা চলল, এল আবার প্রতিক্রিয়া। ব্যক্তিতন্ত্রের পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা এখন আমরা

দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মোটামুটি আমরা ঠিকই আছি। পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের দেশে বংশগৌরব আর কুল-জ্ঞান, যাব যাব বলে' কিন্তু আজও টি'কে আছে। যৌথ পরিবারের সুবিধা-অসুবিধা জেনে মানুষ ইচ্ছা এবং অনেকটা মনের জোরেই অশান্তির কেন্দ্র থেকে সরে এসে পুরানো সমাজে ভাঙন ধরিয়েছে। কিন্তু কাজটা সম্পূর্ণ হয়নি। মনের মধ্যে 'কনডিশ্যনড্ রিফ্লেক্স'গুলো এখনো রয়ে গেছে। শুধু এদেশে নয় বিদেশেও। য়ুরোপে তো যৌথ সংসারের বালাই নেই। কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে, মধ্য য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, বিশেষ করে বলকান প্রদেশে, এখনও গৃহধর্মের জের মেটেনি। গ্রামাঞ্চলে পিতৃতন্ত্রের এবং গোষ্ঠী-জীবনের প্রাধান্য আজও রয়েছে কিছু কিছু।

এর প্রধান কারণ হল ভয়। যেদিন মানুষ গুহা ছেড়ে মাটিতে বাসা বাঁধে, সেদিন জঙ্গলের ভয় কেটে গিয়ে নতুন সব ভয় এসে তার মনকে অধিকার করে। সেই সব প্রাথমিক ভয়, আদিম মনের ভয় আমাদের রক্তধারায় এবং মজ্জার মধ্যে মিশে আছে এবং আছে বলেই আমরা দল বাঁধি, দল ভাঙ্গি, নতুন দল গড়ি, শ্রেণী-স্বার্থের চেতনায় এবং আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে শারীরিক আর মানসিক গণ্ডী রচনা করি। একটা ভয় যায়, আর একটা ভয় আসে। হিংস্র শ্বাপদের ভয় কেটে যায়, আসে মানুষের ভয়। নৃতত্ত্বে যে সাম্যের কথা লেখা আছে, সেটা পুঁথির কথা। আসলে মনের মধ্যে অনেক রকম ভয় জড়িয়ে

জটিল জুজুর সৃষ্টি করেছে, যেখানে অচেতন, অবচেতন, সচেতন মনের অত্যাচার, নিরোধ, দমন মিলে এমন একটা জটিল পরিমণ্ডল রচনা করেছে যে সাময়িক ও সাহসী চেষ্টা সত্ত্বেও সেগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আজও দুটো জিনিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে। একদিকে মন চাইছে স্বাধীনতার প্রসার, ব্যক্তিত্বের প্রসার—যেটা আত্মবিকাশের সাহায্য করতে পারে। ঠিক উল্টো দিকে টানছে আর একটি পুরানো আদিম প্রবৃত্তি 'হার্ড ইনস্টিংট'—যেটা একত্র দল বেঁধে বাস করতে অজানা বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মনকে আহ্বান করে। একাকিত্বের ভয়, অনিশ্চিতের ভয়, সামাজিক অসাম্য আর আর্থিক বৈষম্য —এইগুলো মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ অথবা শ্রেণীবদ্ধ করে তোলে।

যে সব ছেলেমেয়ে বহুদিন পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে মানুষ হয়েছে, যে পরিবারে কর্তার অসীম কর্তৃত্ব, তাদের মনের মধ্যে একদিন না একদিন অসন্তোষ ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু বহু দিন ধরে আওতায় প্রতিপালিত হওয়ার ফলে নিজস্ব পদার্থ বিশেষ কিছুই থাকে না, আত্মনির্ভরতা যায় কমে। কোনও কিছু সৎসাহসিক কাজ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। অথচ যৌথ পরিবারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে। এইটাই স্বাভাবিক। ছোট্ট অথবা বড় সংসারে একত্র বাস করে' পরস্পরকে জড়িয়ে থাকা, শত অসুবিধা এবং ব্যক্তিগত সমস্যায় অশান্তি বহন করার মধ্যেও একটা তৃপ্তি আছে—যেটা মর্ফিয়ার প্রভাবের মতই কাজ করে।

প্রায়ই দেখা যায়—দুজনের মধ্যে বনছে না, কিংবা আর্থিক তারতম্যের ফলে একজনের উপর চাপ পড়েছে, পরিবারের কোনও কোনও দায়িত্বহীন ব্যক্তি নিশ্চিন্ত আরামে কানে তূলো দিয়ে ভর পেটে দিবানিদ্রা দিচ্ছে, কোনও শান্ত মহিলার ওপর অযথা উৎপীড়ন হচ্ছে, কোনও নিরীহ ভদ্রলোককে কৌশলে শোষণ করা হচ্ছে। তবু সংসার আর সমাজের অছিগিরিকে আঘাত করবার মতন যথেষ্ট উদ্যম থাকে না......

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যৌথ সংসারের শৃঙ্খলে ফাট্ ধরেছে। পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে আমরা কেউই রাজি নই, অন্ততঃ মনে-মনে। কিন্তু এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়। প্রথমতঃ স্বতন্ত্র সংসার রচনায় যে আনুষঙ্গিক হাঙ্গামা বা অসুবিধা আছে, সেটা বহন করতে মন স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত হয়। যাঁরা বৃহৎ পরিবারের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন ও জেনেছেন একান্নবর্তী পরিবারে বাস করায় যেটুকু নিশ্চিন্ততা, তার দায়িত্ব বোধ হয় তার চেয়ে বেশী। এ ছাড়া স্বার্থপরতা, নীচতা, কুশ্রীতা প্রভৃতি জীবনের কদর্য দিকটা অনেক সময়েই এমন প্রকট হয়ে ওঠে এবং তাতে নিজের ও ছেলেমেয়েদের মনে এতটা গ্লানি ও কুশিক্ষার উদাহরণ জমে উঠে ভবিষ্যতে চরিত্র-গঠনের পথে এমন কতকগুলো প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, যে গুরুজনস্থানীয় আত্মীয় আত্মীয়ার মনঃকষ্টের কারণস্বরূপ হলেও পৃথক্ পরিবার স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

শুধু এক সংসারে বাস করেই যে কুশিক্ষা হয়, একথা অবশ্য বলা চলে না। তবে অপ্রীতিকর দৃশ্য আর প্রসঙ্গ কিংবা বয়স্থ ব্যক্তিদের সাংসারিক আলোচনা আর সাধারণ অন্তঃপুরিকাদের

সরিকি হাল-চাল ছোটদের অল্প বয়সে এত পাকিয়ে তোলে যে, তাদের কথা শুনলে মধ্যে মধ্যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তবে বাপ-মায়ের সঙ্গে ছোট সংসারে থেকেও যে ছেলেমেয়েরা খারাপ হতে পারে, এটাও সত্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে—সংসার বলতে তিনজন। বাপ মা ও ছেলে। ত্রি-সীমানায় কোনও কুপ্রভাব নেই। তবু কুশিক্ষায় ছেলে ভরপুর। বাপ-মা সাধারণ শিক্ষাদানে আর গোটা দুই তিন গৃহশিক্ষক রেখে আর ভাল স্কুল কলেজে পড়িয়ে, ভাল খাইয়ে-পরিয়ে নিজেদের কর্তব্যের কোনও ত্রুটি করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যায়, প্রবঞ্চনায়, আলস্যে আর দায়িত্বহীনতায় ছেলে মানুষ হল না। বেয়াড়া এবং অকর্মণ্য সন্তানের জনক-জননী বাকি জীবনটা আক্ষেপ করে আর নিজেরা ধর্মকর্মে মন দিয়ে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। পাঁচজনে বলাবলি করে, এমন ভদ্র পরিবারে এমন অভদ্র সন্তান হয় কি করে !······সবই প্রাক্তন...কর্মফল !

কিন্তু কেউই ভাবতে পারেন না যে, এটা পূর্বজন্মের কর্মফল নয়,—ইহকালেই স্বকৃত কর্মের ফল এবং বাপ-মাই অনিচ্ছাকৃত অবহেলায় অথবা যত্নবত্তার আতিশয্যে কিছুটা বুঝে এবং কিছুটা অবুঝ হয়ে ছেলের সর্বনাশ করেছেন। যখন শাসনের প্রয়োজন ছিল, তখন আদর আর স্নেহের অনুশাসন কার্যকরী হয়নি। যে সময়ে সন্তানকে স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা দিতে হয়, সে সময়ে তাকে হাতে-হাতে সমস্ত জিনিস জুগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ছেলে যখন যা চেয়েছে, তাই সে পেয়েছে

এবং করা হয়েছে। কার্যত তার মানসিক অধঃপতন আর চরিত্র-শৈথিল্যের জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী তার পিতা ও মাতা। এখন মৌখিক অনুযোগে নতুন করে সংস্কার সাধন অসম্ভব হয়ে ওঠে। ছেলেবেলা থেকে সন্তানকে পুতুলের মতন সাজিয়ে পাউডার মাখিয়ে, খাইয়ে ও শুইয়ে যে তৃপ্তি—তারি ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অতৃপ্তি। আসল কথা এই, ছোটদের আমরা নিষ্প্রাণ পুতুল মনে করি। তাদের ছেড়ে দিই না, একলা হতে দিই না, আপনা-আপনি কাজ করতে কিংবা বাইরে বেরুতে দিই না। আমাদেরই মনের ইচ্ছা ও সাধ মেটাই তাদের দিয়ে। বাপ ও মা নিজেদের রুচি ও ধারণামত মানুষ করতে গিয়ে হয় এতো বেশি প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন, নয়তো সন্তানের ফুটন্ত মন আর স্বাধীন চিন্তা এবং উদ্যমকে এতটা অবদমিত করে নষ্ট করে ফেলেন যে, পরে মনোমত চরিত্র-গঠন হলো না বলে আক্ষেপ করার কোনও অর্থ থাকে না। ছেলেমেয়েরা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ভাব-সংস্কার, বিশ্বাস-ধারণার প্রতিবিম্ব হয়ে উঠুক, এইটেই সব বাপ-মা মনে মনে কামনা করেন। সেই মত কাজ করেন আর ছেলেমেয়েরা যদি অন্যপথে পা বাড়াবার চেষ্টা করে, তখনই অভিভাবকের আহত অভিমানে তাঁরা নীরব ও গম্ভীর হয়ে যান, নয়তো খিট-খিট শুরু করেন। এইভাবে স্বাধীন সত্তার বিকাশটুকু অঙ্কুরেই শীর্ণ হয়ে যায়।

আর একটি কথা। অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়ঃ বাপ-মা কষ্ট করে, আত্মবঞ্চনা করে, ছেলেমেয়ে মানুষ করেন। কিন্তু

যে সময়ে যেটুকু করা দরকার অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা যখন শুরু হয়, তখন যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, সেটুকু না করে ভবিষ্যতের ভাবনায় অর্থ সঞ্চয় করেন। এ অর্থ-সঞ্চয় কি নিরর্থক নয়? জীবনের গোড়ায় যখন ছেলেমেয়ের শিক্ষা আর চরিত্র-গঠনটাই বড় কথা, তখন সে শিক্ষা মামুলিভাবে সেরে দিয়ে তার স্বাবলম্বন বৃত্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে', তার উন্মেষিত মনের সুকুমার বৃত্তি কোন্ পথে ও ধারায় বিকশিত হতে চায়, সে তত্ত্ব না বুঝে সাধারণ শিক্ষাদানে আপনার দায়িত্ব সম্পন্ন করে নিয়ে, অজানা-ভবিষ্যতের অনাবশ্যক চিন্তায় পুঁজি সঞ্চয় করার কি কোনো মানে হয়? ছেলে তো বুঝবেই, কোনো মতে তালি-চাপা দিয়ে ফাঁকা শিক্ষার ঘুণধরা বনিয়াদের ওপর দুটো পা নিয়ে একটু দাঁড়াতে পারলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গণ্ডী অন্ততঃ লাফিয়ে পার হওয়া যেতে পারে। তারপর একমাত্র ছেলে হলে তো কথাই নেই। অচিরেই বিবাহ, ফুলশয্যা, নতুন জীবনের মাদকতা, বাপ-মায়ের আড়ালে নির্বিরোধ গতানুগতিক জীবনের নিশ্চিন্ত দায়িত্বহীনতা। সন্তানাদি হলে মানুষ করবেন নতুন ঠাকুরদা ও ঠাকুমা। এবং তাঁদের দেহান্তে সঞ্চিত অর্থ যখন হাতে এসে পৌঁছুবে, তখন ইতিমধ্যে বিরক্ত এবং অবসন্ন, অল্প বয়সেই সংসার-পীড়িত নাবালক সাবালকটি কোনও মঠে গিয়ে সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়ে গুরুদেবের পাদপদ্মে আশ্রয় খুঁজবে, না কি শনিবার রেসের মাঠে টিপ্ দেখে কদম-চাল

ঘোড়ার পায়ে সে টাকা বাঁধা রাখবে—কেউই বলতে পারে না।

সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে বহু সন্তানের মধ্যে কয়েকটি সন্তান গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষ হয়, হয়তো তার মধ্যে থেকে কৃতী ও মেধাবী ছাত্র বেরিয়ে আসে তা জানি। কিন্তু সেটা সব সময়ে হয় না। যদি বা হয়, তা হলে পিতৃদত্ত দশ বিশ হাজার কোম্পানীর কাগজ আর একখানি পৈতৃক বাড়ীর মধ্যে আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। যে অর্থটুকু তার পিতামাতা অনেক বাঁচিয়ে ও ভেবে-চিন্তে সঞ্চয় করে গিয়েছেন, সেটা অর্থহীন মনে হয় বাড়ীর মধ্যে গোয়াল ঘরের দিকে তাকিয়ে। ভাই-বোনদের দায়িত্ব তখন বোঝার মতন ঘাড়ে চড়ে বসে। অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মানুষগুলি আর অভিমানিনী জননীকে নিয়ে সেই মানুষ-হওয়া পুত্রটি তখন চোখে অন্ধকার দেখে। বিবাহিত হলে তো কথাই নেই। জটিলতার সূত্রে পরলোক পর্যন্ত বন্ধকী রাখতে হয়। তাই তার মনে হওয়া স্বাভাবিক—পিতা যদি এ ভাবে অর্থসঞ্চয় না করে সকলকেই সাধ্যমত কিছু কিছু শিক্ষা দিয়ে পায়ের ওপর দাঁড়াতে শেখাতেন, তাহলে ভালো হত।

আমাদের সমাজ গঠনের ভিত্তিটা খারাপ নয়। তবে আপনাদেরই অবহেলায় এবং নিষ্কর্মতায়, লোকাচার আর চক্ষুলজ্জার খাতিরে সেই মূল ভিত্তিটার ওপর এতো ডালপালা, আগাছা-আবর্জনার সৃষ্টি করেছি যে, সেই বহু পুরাতন দীর্ণ

ঐতিহ্যের বনিয়াদ আর খাড়া থাকতে পারছে না। অথচ সেটাকে ভেঙ্গে সারিয়ে, কালোচিত পরিবর্তনের সঙ্গে তার সংস্কার সাধন করবার মতন আমাদের উদ্যম অথবা সাহস নেই। যখন দেখি—মনঃপূতভাবে সংসার চলছে না, সমাজের হাওয়া বদলানোর ফলে ছেলেমেয়েরা অন্যপথে চলতে চায়, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, অর্থাৎ—এক কথায় মধ্যবিত্ত সংসারের যাবতীয় বিড়ম্বনা বর্ত্তমান অথচ কোনো সুরাহা হচ্ছে না,—তখন নিজেরা পুরাতন প্রথাকে আঁকড়ে থাকি, স্মৃতির রঙীন কাঁচে কল্পিত আদর্শের প্রতিবিম্ব দেখি। গলদ কোথায়, কর্তব্য কি,—এ কথাগুলো ভেবে সেইমত চলতে ভরসা পাই না। অকারণে বর্তমান যুগের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ও সামাজিক গতির মুণ্ডপাত করি……

কোনও একটা জিনিষকে আঁকড়ে থাকার স্পৃহা মানুষের মজ্জাগত। বহু দিনের বিশ্বাস, সংস্কার টপ করে ছেড়ে দেওয়া বা কাটিয়ে ওঠা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু তাই নয়, একটা আন্তরিক মমতার আকর্ষণ মনের ভেতর থেকে কাজ করে। যার ইংরেজি নাম হল 'লয়্যালটিস্'।

পারিবারিক অথবা সাংসারিক বন্ধনের মোহ হল এমনি একটা লয়্যালটি। গৃহকে কেন্দ্র করে মানুষ বেঁচে আছে বহুদিন। সেই গৃহের অর্থাৎ যৌথ-পরিবারের অশরীরী আকর্ষণ কাটানো সত্যিই দুরূহ। আমরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত লোক মুখে বলি—আর পারি না! এত বড় সংসারের-দায়িত্ব একার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে আর সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে—এ কেমন কথা? কিন্তু মুখে যতই নালিশ করি, হুমকি দেখাই, কাজের বেলায় এড়িয়ে যেতে পারি না। তার কারণ—কিছুটা চক্ষুলজ্জা, কিছুটা সমাজের অনুশাসন। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, সংসারের চাপ যেখানে অত্যাচারের সামিল, সামাজিক অনুশাসন যেখানে অন্যায় বলে বুঝতে পারছি অথচ আমরা নিরুপায় হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকি, বৃহৎ পরিবারের স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্রতা যখন অনায়াসে দায়িত্ব অর্পণ করে আপনি জগন্নাথ সেজে বসে থাকে,

স্নেহান্ধ সংসার যখন পিছু টানে, আত্মোন্নতির সাহায্য না করে' প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তখন ঝেড়ে ফেলার সাহস না থাকলে তাকে বোধ হয় কাপুরুষতা বলা চলে। যারা লয়্যালটির গিল্টি পালিশ দেওয়া যূথ-বন্ধনের আদিম মনোভাবকে নিরুত্তম ভীরুতা বলে চিনে ফেলেছে, তারা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। মুক্ত আকাশের নীচে নিরুপদ্রব, অকারণ কলরববর্জিত পৃথক একটি নীড় রচনায় প্রয়াসী হয়।

পুরুষের হাতে অর্থ, হাতে ক্ষমতা। তাই ঝাঁপ দেবার ভরসা সে রাখে অথবা রাখতে পারে। কিন্তু নারীর পক্ষে যৌথ-পরিবারের মারাত্মক গণ্ডী কাটানো কঠিন। হয়তো তার সে ইচ্ছা আছে, ক্ষমতাও আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে পয়সারও হয়তো অভাব নেই। তবু সংসার ত্যাগ করে নিজের স্বামী-পুত্রকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র ঘর পাতবার উত্তম তার বড় একটা থাকে না। তার প্রধান কারণ, আমাদের সমাজ। পুরুষ দুঃসাহসী, উচ্ছৃঙ্খল হলে বড় জোর সংসারের প্রশান্ত সমুদ্রে একটা চঞ্চলতা জাগে। নারী স্বাতন্ত্র্যাভিলাষিণী হলে ওঠে ঝড়-তুফান। উপরন্তু দুর্ণাম, গঞ্জনা, অপবাদের আশঙ্কা আছে। যদি কোনও মহিলা সংসারের নীচতায়, কুটিল স্বার্থপরতায় বিব্রত, উৎপীড়িত বোধ করেন, তাঁকে চুপ করে থাকতে হবে। বোবার শত্রু নেই। নীরব দর্শক আর শ্রোতা সেজে, কৃত্রিম শিষ্টতার মুখোশ পরে' যদি কাউকে না চটিয়ে সকলকে তুষ্ট করার চেষ্টায় তিনি নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারেন, তাহলে সংসার তাঁর

স্তুতিবাদ করবে। গম্ভীর হলে তুষ্ট আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত তাঁকে খাতির করবে, সমীহ করে চলবে। কিন্তু এক হিসেবে তাঁর মনের ওপর যতখানি চাপ পড়ে, তার দাম কে দেয়? স্বামী তাঁর প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখেও বুঝতে পারেন না, তাঁর সহিষ্ণুতার মাত্রা কতখানি। মনের চাপ ক্রমশ দেহকেও পীড়িত করে, স্নায়ুগুলোকে টান করে রাখে। কিন্তু গোপনে কি ভাবে তাঁর আত্মিক অধঃপতন হচ্ছে, সে খবর কে রাখে?

অনুকূল পরিবেশে এমন কোন মহিলার স্বাভাবিক বিনয়-সৌজন্য, শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংযম তাঁর ব্যক্তিত্বকে আরও কতখানি সাহায্য করতে পারত! কিন্তু তাঁর সমস্ত শক্তি সর্বক্ষণ নিয়োজিত হচ্ছে হতশ্রী সংসারের শ্লেষ-কলহ-নীচতার সঙ্গে শান্ত সংগ্রাম চালিয়ে। পাছে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয়, কিংবা একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে যায়—এই ভয়েই তিনি অধিকাংশ সময় আড়ষ্ট থাকেন। সংসারের ছায়া-নাট্যের 'ক্রনিক' উত্তেজনায় তিনি এতটা উচাটন থাকেন, অন্যমনস্ক, নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে পড়েন যে, সংসারই তখন তাঁকে দোষ দেয়—হয় তিনি অতিরিক্ত চাপা এবং দাম্ভিক, নয়তো তিনি বেচারী নির্বোধ। কিন্তু যে সংসারের ভারসাম্য খুঁজতেই তাঁর জীবনের সমস্ত সরসতা নষ্ট হল, স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং প্রাণের বিকাশ সেখানে খুঁজতে গিয়ে যদি না মেলে, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সংসারে আন্তরিক বিতৃষ্ণা এসে গেলেও কিন্তু এঁরা সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন না, কেননা, সংসার এঁদের

রেহাই দেয় না। সবাই জানে এবং বুঝে ফেলে—যদিও স্বীকার করতে কেউ চায় না যে আসলে এই মানুষটার ওপরই নির্ভাবনায় দায়িত্ব ফেলে দেওয়া চলে। সামঞ্জস্য আর শ্লীলতা-জ্ঞানে এই মানুষটা কদর্যতার উর্ধ্বে। এর দ্বারা আর কিছু না হোক, অনিষ্ট হবে না। কর্তব্যবোধে আর ভদ্রতা শিক্ষায় আপনার স্বার্থকে বড় করে দেখবে না, আর বিপদে এই লোকটাই নীরবে এগিয়ে আসবে। অন্য মহিলারা যখন সামান্য একটু কাজ করেই বিজ্ঞাপনের ডামাডোল বাজাতে শুরু করেন, অযাচিতভাবে স্বামী-গৌরব, পুত্র-গৌরব, আর কিছু না থাকলে বাল্যকালের পিতৃগৃহের কল্পিত মাহাত্ম্য কীর্তন করতে শুরু করেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের কথা সাত কাহন করেন, তখন এই মানুষটা কিছুই করে না। চুপ করে শোনে, দেখে—বড়জোর একটু হাসে। মনে মনে একটা সন্দেহ আর অস্বস্তি হয় বৈকি! কিন্তু এই মানুষটাকে মুখ ফুটে কিছু বলা যায় না। আঁচলে আঁচল লাগিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে কলহ-মনান্তর প্রকাশ্যে বাধানো অসম্ভব। তাই সংসার এই ধরণের মহিলাদের রেহাই দেয় না। আবার অমন ধরণের পুরুষদেরও রেহাই দেয় না। মাঝখান থেকে এদের দিয়ে আপনার স্থবিধাটুকু বাগিয়ে নেয়......

এই হল আমাদের পুরুষালি সমাজ; এই হল আমাদের মেয়েলি সংসার। ইতরবিশেষ আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 'এক্সপ্লয়েট' করবার প্রবৃত্তিটা উদগ্র হয়ে আছে। এই

সমাজই নাকি আমাদের ধর্ম। অর্থাৎ আমাদের ধারণ করে আছে। বলা যেতে পারে—ধারণ করে ছিল একদিন, যখন গোষ্ঠী-সমাজের বাইরে পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না। এখন আর ধারণ করে নেই, জড়িয়ে আছে। অনেকটা নাগপাশের মতন। এই সমাজ ও সংসার যতদিন পারবে, আমাদের শোষণ করবে। অনিশ্চিতের ভয়, ভবিষ্যতের ভয় আর অভ্যাসের মৌতাত মিলে আমাদের মনের চারিদিকে এমন একটা জটিল ও কঠিন জাল বুনে রেখেছে যে, সেই জাল সহসা কেটে বেরিয়ে আসা শক্ত। তবে দুনিয়াটাও শক্তের ভক্ত। যে সমাজে ব্যক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠা আছে, যে সংসারে মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা হয় ন্যায়ত এবং আইনত—যেমন য়ুরোপ—সেখানে সাবালকত্ব অর্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক গার্হস্থ্যের সূচনা হয়। জন্মগত মমত্ব-বন্ধন তাতে নষ্ট হয় না। অথচ তাকে ঘাড়ে চেপে বসার সুযোগও দেওয়া হয় না। মাঝখান থেকে ভদ্রতা, উদারতা, শ্লীলতা এবং সামাজিক সমবেদনা পুষ্টিলাভ করবার সুবিধা পায়।

দ্বিতীয় পালা

যৌথ সংসারে মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংসারের দাসত্ব করেন,—অনেকটা দায়ে পড়ে। এর জবাবে কেউ-কেউ বলতে পারেন, তাঁরা দাসত্ব করেন কেন? অর্থনৈতিক কারণটাই প্রধান নয়। যাঁদের মনের জোর আছে, অধিকার আছে অর্থাৎ নিজস্ব কর্তৃপক্ষের অসম্মতি নেই, অযথা হস্তক্ষেপও নেই, তাঁরা বৃহৎ পরিবারের লৌহ-শৃঙ্খলে নিজেদের বেঁধে রাখেন কেন? আসলে তাঁরা পর-গাছা। একটা কিছু জড়িয়ে থাকাই তাঁদের সার্থকতা। সকলের সংসারে যখন থাকেন, তখনও তাঁদের মুখভার। আবার নিজের সংসার যখন করেন, তখনও তাঁদের মনভার। অসন্তোষটা হল মনের অতি-প্রয়োজনীয় পোষাক। তবু ছাড়তে তাঁরা পারেন না এবং জানেন না। সংসার ছাড়লে তাঁরা প্রেমেন মিত্রের 'অনাবশ্যক' গৃহিণী। কাজেই ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, তাঁরা সংসারকে আঁকড়ে থাকেন। একান্নবর্তী সংসারের ঝামেলা নিয়ে পুরুষকে আর নিজের অদৃষ্টকে গঞ্জনা দেন। আবার পৃথক্ সংসার হলে হাঁপিয়ে ওঠেন। কথা বলতে না পেয়ে এবং কাউকে কিছু শোনাতে না পেরে আকণ্ঠ ফুলে ওঠেন। অতএব দেখা যাচ্ছে—নারী হলেন 'কনজ্যারভেটিভ', সংরক্ষণশীল।

নারীর রক্ষণশীলতা অবশ্য সত্য কথা। কিন্তু পুরুষ প্রগতি বেশী পছন্দ করে, না কি নারী—এ বিতর্ক বহু পুরাতন।

সভ্যতার প্রথম ও মধ্য যুগে এই তর্কের তেমন প্রয়োজন ঘটেনি, অবকাশও ছিল না। কিন্তু যবে থেকে সংসারের ও সমাজের অর্থ বিস্তৃত হয়েছে, নারীর সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তবে থেকে পুরুষের ও নারীর নিজস্ব মনন এবং স্বাতন্ত্র্যকে মেনে নেওয়া হয়েছে। এখন সেই মন ও স্বাতন্ত্র্য কোন্ ক্ষেত্রে বাধা মানে না, এগিয়ে যেতে চায়—অর্থাৎ প্রগতি-কামী, আর কোন্ ক্ষেত্রেই বা বেশী দূর এগুতে ভরসা পায় না, পুরানো জীবন-আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থাকে,—অর্থাৎ সংরক্ষণশীল, সেটা বিবেচনার বিষয়।

হাবে-ভাবে, আচরণে, চিন্তা-ধারায় এবং মত প্রকাশে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য আছেই এবং থাকতে হবে, জীব-তত্ত্বের অমোঘ নিয়ম-নির্দেশে। কারণ প্রকৃতি উভয়পক্ষকে একই ছাঁচে ঢালাই করে নি। কিন্তু একথাও ঠিক্ যে কয়েকটি স্বভাব আর গঠন-গত বৈষম্যের ওপর একটা সাধারণ প্রস্তাব খাড়া করা শক্ত এবং সমীচীনও নয়। তবে নারীর যে সামাজিক ও পারিবারিক রূপের পরিচয় আমরা নিত্য পেয়ে থাকি, তাঁদের মনের ও আচরণের যে ক্রিয়া ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াগুলি প্রায়ই লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই, তাই থেকে মোটামুটি বলা চলে যে অনেক স্থলেই তাঁরা সংরক্ষণশীল—একটা আকস্মিক অথবা বড় রকমের পরিবর্তনের পক্ষপাতী তাঁরা নন। বিধাতার

সৃষ্টির গড়নে তফাৎ থাকলেও, আজকাল অবশ্য অনেক মহিলাই শিক্ষায় দীক্ষায়, আচরণে ও মতবাদে, স্বাধীন চিন্তায় এবং অন্তঃশক্তির বলিষ্ঠ প্রকাশে আধুনিক বিদগ্ধ পুরুষের সমকক্ষ,—কোনও কোনও জায়গায় তাঁরা আরও অগ্রসর হয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কর্মক্ষেত্রে, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে নারী শুধু পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার ক্ষমতাই অর্জন করেন নি, অনেক সময়ে পুরুষের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

কিন্তু আমি বলছি সাধারণ সংসার ও মধ্যবিত্ত সমাজের নারীর কথা। শতকরা আশি পঁচাশি জন মহিলা সমাজের যে গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন, যে মানসিক স্তরে তাঁদের চিন্তা-শক্তি ও বুদ্ধি বিচারের ব্যবহারিক প্রয়োগ সীমাবদ্ধ আছে,—তারই কথা। দেখা যায়—সেখানে নারীমনের স্বাভাবিক ঝোঁকটা প্রগতি বা বিপ্লবপন্থী নয়। দু চারজন থাকতে পারেন—যাঁদের সাহস আছে, নতুন জীবন-ধারা কিংবা একটা পরিবর্তন বা আন্দোলনকে যাঁরা পুরুষের চেয়ে সহজে বরণ করে নিতে পারেন অথবা বেশি উন্মাদনা নিয়ে চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতন মনের জোর দেখাতে পারেন। কিন্তু গড়-পড়তা হিসেবে বোধ হয় এ কথা বলা চলে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক মেলা-মেশায় মেয়েরা মজ্জাগত সংস্কারকে উড়িয়ে দিতে চান না—কারণ উড়িয়ে দিলে চলে না। তাঁদের স্কন্ধে যে রক্ষণ-দায়িত্ব সমাজ চাপিয়ে দিয়েছে, সেটা না মেনে

উপায় নেই। তাই আবহমান কালের ঐতিহ্য আর সামাজিক তথা পারিবারিক আদর্শে পুষ্ট নারীর মন স্থিতিশীল বিচার-বুদ্ধির ওপর আস্থা রাখে এবং নির্ভর করে বেশি মাত্রায়। সমাজ-সংসারের ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়ে যদি আসে কোনও পুরানো প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠানের আকস্মিক বিপর্যয়, তাহলে নারীর মন তাকে তেমন আন্তরিক প্রসাদে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

নারী-চরিত্রের এই বিমুখতা কিন্তু মনোবিকারের চিহ্ন নয়, মানসিক সঙ্কীর্ণতার পরিচয়ও নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফেরে, সমাজ-ব্যবস্থার কল্যাণে এই মনোভাবটাই যে ন্যায্য ও নিতান্ত স্বাভাবিক ফল,—সেই কথাটা আবার জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। সভ্যতার আদিম যুগ থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত নারীর ধারিণী শক্তির এপর অনেকখানি গুরুভার চাপানো হায়ছে এবং সেই শক্তির জোরেই আজও ভারতীয় সমাজ ও সংসার-ধর্ম অনেকটা দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। এতে ভালো হয়েছে অথবা মন্দ হয়েছে, এটা এখন আমাদের বিচার্য বস্তু নয়। তবে নারীর স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা যে সমাজ-নীতি আর রাষ্ট্র-নীতি-ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, সেটা অবিসংবাদিত সত্য। বহু দিন ধরে বিশেষ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে এবং আবেষ্টনীতে বাস করে তাঁরা 'কন্‌ডিশানড্' অথবা দেশ-কাল-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

নারী-মনের স্বাভাবিক উদারতা পুরুষের চেয়ে কিছু কম নয়। তবে যে সব স্থলে, যে বিশেষ পরিবেশে নারীমনের সহজাত সঙ্কোচ এবং প্রতিক্রিয়া, সেগুলি লক্ষ্য না করলে এই আলোচনা অর্থহীন হয়। তাই মেয়েদের ধারণায়, মতামতে ও সামাজিক ব্যবহারে যে প্রগতির অভাব বা পরিবর্তনের বিরোধিতাটুকু নজরে পড়ে, তার উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রথমে সংসার-পরিচালনার কথাই ধরা যাক্। পুরুষ বাইরে যতই প্রভাব আর প্রতিপত্তিশালী হোন্ না কেন, গৃহ-ধর্মে এবং সংসারের নিত্য কর্মে নারীর মত ও ব্যবস্থাকে তিনি কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কারণ এ স্থলে দ্বৈতবাদ চলে না। শৃঙ্খলার খাতিরে বোধ হয় চলাও উচিত নয়।,.....

সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে, নারী যে ব্যবস্থাবিধি অনুসারে গৃহধর্ম প্রতিপালন করেন, গৃহকর্ম পরিচালনা করেন,—সেটা অধিকাংশই শাশুড়ী অথবা মা-পিসিমা-ঠাকুমার কাছ থেকে পাওয়া। যেটা বহুদিন ধরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, যে জিনিসটা বরাবর চলে আসছে এবং বিনা বিতর্কে যে বস্তুর প্রতিষ্ঠা—তাকে অস্বীকার করতে কিংবা তার অদল-বদল করতে নারীর মন স্বভাবতই অনিচ্ছুক। ঝি-চাকর নিয়ে তাঁরা যে নিত্য কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করে থাকেন এবং সে দুর্ভোগের সবিস্তার বর্ণনা করেন প্রতিবেশিনী অথবা বান্ধবীর কাছে, তার একটা কারণ বোধ হয় যে তাঁরা বর্তমান কালের দাবীকে এবং যুগোচিত অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে এক কথায় মুখ বুজে মেনে নিতে রাজি নন। যদি সমরোত্তর কালের সামাজিক রূপান্তরকে অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করতেন, তাহলে সংসারের ও পরিবারের কিছু কিছু সমস্যা অযথা জটিল হয়ে উঠত না।

এ ছাড়া, ছেলে-মেয়েদের প্রতিপালনে, শিক্ষাদানে, মানুষ করবার রীতিতে, তাদের সাজ-সজ্জায়, চাল-চলনে—এমন কি স্নানাহার, বেশভূষার মতন দৈনন্দিন তুচ্ছ ঘটনায় এবং খুঁটি-নাটির মধ্যেও মেয়েরা খোঁজেন তাঁদেরই আবাল্য-সঞ্চিত অভ্যাস,

তাঁদের নিজস্ব পরিবেশে পুষ্ট এবং অর্জিত অভিমত ও অভিরুচির প্রতিচ্ছবি। এইখানে, আধুনিক যুগ-ধর্ম এবং সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিয়ে সাংসারিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বোধ হয় কিছু দেরি হয়। অথচ মজা এই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভিন্ন পরিবারে, একান্নবর্তী সংসারের নতুন আবেষ্টনীতে এসে প্রতিকূল অবস্থায় পড়েও মেয়েরা নিজেদের চমৎকার মানিয়ে নিতে জানেন এবং পেরেও থাকেন। কিন্তু যে সব ধারণা তাঁদের বদ্ধমূল হয়ে আছে, যে সব সংস্কার তাঁরা বহু দিন ধরে আচরণ করে এসেছেন, সেগুলিকে নতুন কালের পরিবর্তিত অবস্থায় না পারেন ছাড়তে, না পারেন কিছুটা বদলাতে। সবাই কিছু বিশ্বেশ্বরী বা আনন্দময়ী নন। তবে সুখের কথা এই যে, অনেক তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যেও রক্ষণশীলতার প্রভাব লুকিয়ে থাকে। অতএব মেয়েরাই শুধু এ বিষয়ে পিছিয়ে আছেন, তা নয়।

কিন্তু সামাজিক মেলা-মেশায় মেয়েদের সব চেয়ে নির্মম, সজাগ সমালোচক হলেন মেয়েরাই। কতোটুকু নড়-চড় হলে মেয়েদের আচরণে আতিশয্য-দোষ এসে পড়ে; কতোখানি আব্রু সরে গেলে তাকে বে-সরম বলা চলে; সরল ও সপ্রতিভ কথাবার্তার কতোটুকু সীমা লঙ্ঘন হলে সেটা বাচালতার পর্যায়ে পড়ে, আবার নীরব গাম্ভীর্যের কতোটুকু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা সম্ভ্রমহীন দাম্ভিকতায় পরিণত হতে পারে—এ সব সূক্ষ্ম সংবাদ পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশি জানেন। সমালোচনা-প্রক্রিয়ার

আনুষঙ্গিক যে বিশেষণগুলির সুনিপুণ ও শ্লেষাত্মক প্রয়োগ হয়ে থাকে, সেগুলি বোধ হয় শুধু মেয়েলি অভিধানেই মেলে। যে সব সমস্যার সঙ্গে নারীর স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সে সব ক্ষেত্রেও—স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, নারীর আইন-অধিকার প্রভৃতি জরুরী সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টাতেও মেয়েরা অনেক স্থলে স্বজাতির বিরোধিতাই করেছেন।

সামাজিক আচরণে, পারিবারিক জীবনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা, নৈতিক আদর্শ থেকে এতোটুকু স্খলনও তাঁরা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন। পুরুষের চরিত্র-গত ত্রুটিকে, বিশেষ করে আত্মীয়-স্থলে, তাঁরা স্নেহান্ধতা বশে মার্জনা করে নিলেও স্বজাতীয় ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিকে তাঁরা নির্মম চোখেই দেখেন। একজন বয়স্থা মহিলা আর এক অল্পবয়সী বিধবার আচার-ব্যবহাব, বেশ-ভূষা, আহার-নিদ্রা এবং মেলামেশাকে যেমন তীব্র সন্দিগ্ধ এবং শাণিত দৃষ্টিতে দেখেন, একজন পুরুষ একজন ভাবী গাঁটকাটাকেও তেমন চোখে দেখেন না। তাই মনে হয়—দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ নারীর মনোভাবে আর আচরণে যে রক্ষণ-বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ পুরুষের স্বভাবে বোধ হয় ততোখোনি প্রগতি-বিরোধিতা নেই। না থাকার অবশ্য একাধিক সামাজিক কারণ রয়েছে। কিন্তু সে কারণ মুখ্য হলেও, স্বভাব এবং সহজাত প্রবৃত্তির চাপটাও নিতান্ত গৌণ নয়।

কি পুরুষ আর কি স্ত্রীলোক—আমাদের সামাজিক

ব্যবহারে অনেক কিছু গলদ আর আড়ষ্টতা আছে। সেগুলো আমাদের অবদমিত সামাজিক সত্তারই প্রতিফলন। কিন্তু তার দোহাই দিয়ে সেগুলিকে আর পুষে রাখা চলে না। যদি সেইসব তুচ্ছ সঙ্কীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এখনও আঁকড়ে থাকি, তাহলে নবলব্ধ রাষ্ট্র-স্বাধীনতা সত্ত্বেও মনের স্বাধীনতা আমাদের অপূর্ণই থেকে যাবে। মন যেখানে উদার হল না, প্রসারিত হল না, সমগ্র মানব-সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকায় আপনাকে আয়ত ও বিস্তৃত করে ধরতে শিখল না, সেখানে রাষ্ট্র-স্বাধীনতা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। যখন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বড়াই করি, ভারতের অথবা বাঙলার বিশিষ্ট দানের কথা স্মরণ করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করি, তখন চোখ দুটো ভেতর দিকে ফিরিয়ে দেখলে বোধ হয় লাভবান্ হতে পারি। আর একটু উদ্যোগী হলেই সেই সব ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতার আগাছাগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করা যায়। কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে অবশ্য খারাপ লাগে। কেন না, বহু দিন ধরে' যে সমস্ত অভ্যাস, আত্মতৃপ্তি আর আত্মবঞ্চনার উপকরণ আমাদের মনকে মুড়ে ঘিরে আছে পুরানো মাকড়সার জালের মতন, তাতে খোঁচা লাগলে মন খারাপ হবারই কথা। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন—কেউ কেউ অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকতে ভালোবাসেন। একটা ঘরেই শোয়া-বসা-খাওয়াপরা চলছে কিন্তু অন্য ঘর পড়ে আছে অব্যবহৃত অবস্থায়। কেউ গুছিয়ে জিনিষপত্র সরিয়ে রাখলে তিনি খেপে যান। টেবিলে রাশীকৃত বাজে কাগজ, ঘরের কোণে বাসি

কাপড়, ভিজে তোয়ালে, কমলালেবুর খোসা আর পানের বোঁটা পড়ে আছে। কিন্তু আর কেউ যদি আবর্জনা সরিয়ে ঘরটা একটু বাসযোগ্য করে তোলেন, ঘরের মালিক রীতিমত অসন্তুষ্ট হন। অবশ্য দরকারী কাগজগুলো যদি যেখানে থাকবার সেখামে না থাকে, কিংবা জামা-কাপড়গুলো পরিচিত জায়গায় হাতের কাছে না পওয়া যায় সুনিপুণ গৃহিণীপনায়, তাহলে অবশ্য অনেকেই চটে যান এবং আমিও অধীর হয়ে উঠি, স্বীকার করছি।

কিন্তু মলিনতার সংস্কার-সাধনে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এলে যদি কেউ অসন্তুষ্ট হন, তাহলে সে অপরিচ্ছন্নতার শিকড় মনের মধ্যে গভীরে প্রবেশ করে আছে, বুঝতে হবে। আমি একজন ভদ্রলোককে দেখেছি যিনি ধোপা এলে অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। লুকিয়ে কিংবা জোর করেই তাঁর জামা-কাপড় কাচা হয়। এসব 'কেস' অবশ্য প্যাথলজিকাল। আর সমাজে ও সংসারে যে সব অতি সাধারণ ত্রুটি বা মনের গলদ লক্ষ্য করি, সেগুলো অনেকটা পুরানো ক্ষতের শুকনো আবরণের মতই গা-সওয়া হয়ে গেছে।

সংসারের ঝামেলা যতই পোহাতে হোক আর পারিবারিক অশান্তি যতই তীব্র হোক্, বংশ-গৌরব আমরা সহজে ছাড়তে পারি না এবং ছাড়তে চাই না। মনের কোণে, অলক্ষিতে এই গৌরববোধ কাজ করতে থাকে। অথচ কত মিথ্যে আর ঠুন্‌কো এই কৃত্রিম আভিজাত্য। আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন যে কোনও কোনও লোক এই আভিজাত্যের মোহে নিজের এবং সন্তানদের পরকাল ঝরঝরে করে দেন। "কত বড় ঘরের ছেলে আমি," 'কত বড় বংশে জন্মেছি' ইত্যাদি উক্তিগুলো খুবই পরিচিত এবং যখন শুনি, তখন মনে মনে হাসি। চাকরি করার মতন ছোট কাজ কিংবা দোকান দিয়ে জীবিকানির্বাহ করা সত্যি এঁরা অত্যন্ত অপমানজনক বিবেচনা করেন। অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চেয়ে চিন্তে হয়তো সংসার চালাতে হচ্ছে। এমন কি ধার করে লুচি-মাংস খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু সে দীনতা সহ্য করবার মতন ধৈর্য থাকলেও, কষ্ট করে কাজ করতে অথবা কাজ খুঁজে নেবার জন্য আর পাঁচজনের কাছে এগুতে তাঁদের বিরক্তি আর অধৈর্য আসে। বড় বংশে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁদের দায়িত্ব সবশেষ হয়ে গেছে। অসুস্থ ও জীর্ণ ধমনীতে নীল রক্তের ক্ষীণ স্রোতটুকু বাঁচিয়ে রাখাতেই যেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব।

আসল কথা হচ্ছে—এটা আলস্য। দেহের তো বটেই, মনেরও। দেহের আলস্য তবু জয় করা যায় বিপদে আপদে, কষ্ট স্বীকার করেও বাধ্য হয়ে দেহটাকে কখনও খাটানো সম্ভব। কিন্তু যে মন ঘুণ-ধরা শরীরের জীর্ণ তক্তে একবার চড়ে বসেছে, উপোসী ছারপোকার মতন সে মন কি করে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, সেইটেই আশ্চর্য। মনের আলস্যটাই প্রধান রোগ। কিছু না করে, কিছু না ভেবে, শুধু অতীতের ছেঁড়া গদির ফাঁকে নিজেকে সে লুকিয়ে রাখে। পাছে কেউ তাকে টেনে বার করে। পাছে কিছু কাজ করতে হয়—এই মানসিক ভয়টাই হল আসল প্রতিবন্ধক। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন—এমন লোক আছেন যাঁরা পরের কাজে ফোঁপর দালালি করে বেড়ান কিংবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে মোড়লী করতে বেশ ভালোবাসেন, অথচ নিজের এবং সংসারের উদরান্নের সংস্থান করবার জন্য যেটুকু ন্যায্য পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেটুকু স্বীকার করতে তাঁরা নারাজ। যদি মাথার ওপরে কোনও অভিভাবক গোছের কেউ থাকেন, তাহলে তাঁর স্কন্ধে নির্বিবাদে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে এঁরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ান। যদি শ্বশুর থাকেন, তাহলে কথাই নেই। কন্যা যখন তাঁর, কন্যার অসুখ অথবা প্রসবের খরচটাও তাঁর। রোজগারের চিন্তা না থাকলে আর অন্য ভাবনা কিসের? দরকার হলেই স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আর কন্যাটি যখন বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠে, সে সময় হঠাৎ বৈরাগ্য বশে কিছুদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হলে সঙ্কট উদ্ধার হয়। এই

রকম কয়েকটি ঘটনা শুধু আমিই দেখি নি। অনেকেই শুনেছেন বা দেখেছেন। "আমাদের বংশে কেউ কখনো চাকরি করে নি", এই মনোভাব নিয়ে মানিয়ে কাজ করা সত্যি মুস্কিল। এক ভদ্রলোককে জানি, যিনি শ্বশুরপ্রদত্ত একটি ভালো কাজ এমনি ভাবে হারিয়েছেন এবং তার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন। বরঞ্চ গর্বিত এবং তৃপ্ত। এবং শ্বশুর-মশায় দরকার ও দাবী অনুসারে রসদ না যোগাতে পারলে, স্ত্রীকে কথা শুনিয়ে এবং বেশ খানিকটা অপমান করে পৌরুষ দেখান।

পুরানো একটা চলতি কথা আছে 'ঘটি ডোবে না, নামেই তালপুকুর'। জল কবে শুখিয়ে গেছে। কিন্তু তার অতল স্মৃতির আলস্য-স্বপ্নটাই মারাত্মক।

কথাটা শুধুই পুরুষদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। মেয়েদের কথাবর্তায় হাবেভাবে অনেক সময়ে এই মনোভাবটা ধরা পড়ে। "বড় ঘরের মেয়ে হয়ে কোথায় পড়েছি"—মনের এই নিত্য অপ্রসন্ন ভাব থাকলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায় না, একথা বলা বাহুল্য। আর্থিক বৈষম্যের ফলে যে অসুবিধা, সেটা বোধ হয় মানিয়ে নেওয়া চলে যদি অন্য দিকে তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ থাকে। মেয়েরা যে আশ্চর্যভাবে মানিয়ে নিতে পারেন, সেটা মানি। কিন্তু নীরবে মানিয়ে নেওয়া এক, আর চুড়ির অর্থপূর্ণ ঝনৎকারে দগ্ধ ললাটের জন্য আক্ষেপ জানিয়ে মানিয়ে নেওয়া আর এক জিনিস!

"কম্‌প্রমাইজ"-এর মূলসূত্রই হল কথা কম বলা। আর

বা ঈর্ষ্যা-কাতর হবার কিছু নেই। আসল কথা এই, সন্তান-গৌরব আত্মগৌরবেরই নামান্তর। ওর মধ্যে নিজেদের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থ, ব্যর্থতা সব কিছুই প্রতিফলিত হয়ে আছে। গাড়ী-বাড়ী ফার্নিচারের মতই আমাদের সন্তান তাদের বেশ-ভূষা, শিক্ষাদীক্ষা আর চেহারা নিয়ে আমাদের আত্মপ্রসাদের ইন্ধন জোগায় মাত্র।

এক মহিলাকে জানি যাঁর সঙ্গে আধঘণ্টা আলাপ করলেই তাঁর স্বামী, পুত্র, কন্যা, বাড়ীর মাষ্টার, খানসামা—এমন কি তাঁর দরজির 'ওয়াণ্ডারফুল ডিজাইন' উদ্ভাবন করবার 'ব্রেইনের' কথা জানা যায়। ছেলে মেয়ে থেকে সুরু করে স্প্যানিয়েল কুকুরটি পর্যন্ত অতুলন প্রতিভার অধিকারী এবং প্রতিটি ব্যাপারে কৃতিত্ব যে তাঁরই, সেটা কথার তুবড়ির মধ্যে নিয়তই ফুল কাটছে। আপনারাও হয় তো এমন চিজ্ দেখেছেন। কেবল, সুযোগ মাফিক 'স্নাব্' করতে পারেন নি—এই যা দুঃখ।

বংশ-গৌরব আর ভূঁয়ো মর্যাদার মতন আরো কয়েকটি ধারণা এবং লোকাচারের বশবর্তী হয়ে আমাদের কাজ করতে হয়। এগুলো হল ঘুণ-ধরা বাঁশ--যার সাহায্যে মধ্যবিত্ত জীবনের নড়বড়ে কাঠামোটাকে প্রাণপণে খাড়া রাখবার চেষ্টায় আমাদের অর্ধেকের ওপর সময় ও শক্তির অপচয় হয়ে থাকে। মাঝারি গৃহস্থ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিশাপ হ'ল এই লৌকিকতার দাসত্ব।

যে সময়ে লৌকিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থাটা অন্য রকমের ছিল নিশ্চয়ই। শায়েস্তা খাঁর আমলে যেটা বাজার দর ছিল, সেটা এখনকার তুলনায় সত্যযুগের স্মৃতি। তবু এমন একদিন গেছে যখন একশো টাকায় শতাধিক অতিথিকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা যেত। সংসার ও সমাজের অর্থনৈতিক বন্ধন সে যুগে এতটা কঠিন নাগপাশের মতন কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসে নি। সেটা এমন বেশি দিনের কথাও নয়। আজ থেকে বারো-চৌদ্দ বছর আগেও এটা সম্ভব হত। শুধু খাদ্যবস্তু নয়। সোনা-রূপোর দরও এমন চড়া ছিল না। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে গিনি সোনার ভরি ছিল, এ কথা ভেবে প্রৌঢ়া গৃহিণীরা আক্ষেপ করেন। কি বোকামিটাই

তাঁরা করেছিলেন আরও কিছু স্বর্ণসঞ্চয় না করে। আধুনিকারা ভাবেন, আরও কিছুদিন আগে জন্ম নিলে মন্দ হত না। অন্ততঃ বাপের-বাড়ী থেকে পঞ্চাশ ভরির বদলে পনেরো ভরি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী আসতে হত না। কিন্তু সে কথা যাক্, অকারণে লোভ বৃদ্ধি করতে চাই না।

আমার বক্তব্য হচ্ছে লৌকিকতার অত্যাচার। যে সময়ে ব্রাহ্মণভোজনের পর দক্ষিণাস্বরূপ একটি ছোট্ট রূপোর সিকিতে ব্রাহ্মণ গদগদ হতেন, উপনয়নে নবীন ব্রহ্মচারীর ভিক্ষার ঝুলিতে দুটি রৌপ্যমুদ্রা পড়লে সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের কথা ভুলে যেত, নববধূর মুখ দেখানি দশটি টাকা দিলে ধন্য ধন্য রব পড়ে যেত, অথবা কোন মেয়েকে পাঁচ টাকায় একখানা উৎকৃষ্ট বেলেডাঙ্গা শাড়ী দিলে সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেখানি পোষাকী কাপড় হিসেবে ব্যবহার করত, সে সময়ে লৌকিকতার অত্যাচার অতটা গায়ে লাগত না। অবশ্য এ কথা ঠিক, সস্তা গণ্ডার দিনে মানুষের রোজগারও ছিল কম। তবু দরিদ্র মধ্যবিত্ত ওরি মধ্যে মানিয়ে এবং বাঁচিয়ে সংসার করতেন এবং কালে-ভদ্রে লৌকিকতা করতেন। কিন্তু আজকাল এই মুদ্রাস্ফীতির দিনে, মানুষের অর্থাগম সেই অনুপাতে ঠিক বাড়েনি। অন্ততঃ যতটা বাড়লে ভদ্রতা-রক্ষা হয়। শিক্ষকের বেতন, ডাক্তারের দর্শনী, উকিলের ফি মোটামুটি একই রকম আছে। তাই সাধারণ গৃহস্থ জীবনে এই লৌকিকতার দাবী ভয়াবহ অত্যাচারে দাঁড়িয়েছে।

লৌকিকতার উদ্ভব হয়েছিল ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে।

তার অর্থও ছিল নিরীহ। অকারণ অর্থব্যয়ে এবং প্রায় বাধ্যতা-সূচক লেন-দেনে সেটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেনি এবং সামাজিক মর্যাদার অঙ্কুশ-বিশেষ হয়ে ওঠে নি। তত্ত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, প্রবাসিনী কন্যার খোঁজ নেওয়া। জামাতা বাবাজীর ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে ভেট পাঠানো নয়। সন্দেশের অর্থ ছিল নিতান্তই আক্ষরিক, সংবাদের আদান-প্রদান। এবং সেই সূত্রে শুধু-হাতে যাওয়ার প্রথাটা উঠে গিয়ে মিষ্ট উপমাটি তিক্ত দায়িত্বে পরিণত হল। এইভাবেই নিরীহ আচার অনুষ্ঠানগুলো অবশ্য কর্তব্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন লৌকিকতার প্রচ্ছন্ন মাধুর্যটুকু লুপ্ত হয়ে যায়। এক পক্ষ থেকে জন্মায় প্রত্যাশা, যেটা নিরুক্ত দাবীর সামিল। অপরপক্ষে জন্মায় অসামর্থ্য এবং অক্ষমতার মিনতি অথবা প্রতিবাদ। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে দুর্বল, সেখানে সামাজিকতার অনুশাসন প্রবল। তাই ধার করে তত্ত্ব করতে হয় নব-বিবাহিতা কন্যার শ্বশুর-বাড়ীতে। এবং কম-সে-কম তিন-চারটি তত্ত্ব প্রথম দু-এক বছরের মধ্যে না পাঠালে কন্যাকেই সুনিপুণ শ্লেষ-গঞ্জনায় উৎপীড়িত হতে হয়।

মধ্যবিত্ত জীবনে এই লৌকিকতা রক্ষা যে কত বড় বালাই, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মাসের শেষ দিকে যদি নিমন্ত্রণ এসে পড়ে, তাহলে শূন্য তহবিলের দিকে তাকিয়ে শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাসই পড়ে। শুভ-কর্মের মরসুম এক এক সময়ে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। অর্থাৎ দু-এক মাসের মধ্যেই তিন-চারটি

জায়গা থেকে আহ্বান আসে। যদি একান্নবর্তী পরিবার অথবা বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকেন, তাহলে তো কথাই নেই। দায়িত্ব এবং দেনার ঠেলা সামলাতেই পুরো একটা বছর কেটে যায়। আপনার নিজের সংসার হয়ত খুবই ছোট এবং চাহিদাও খাটো। কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে একত্র বাস করার এবং সমাজে অতি সাধারণ প্রতিষ্ঠাটুকু রক্ষা করার অতিরিক্ত শুল্ক আপনাকে দিতেই হবে। দাদার সম্বন্ধী আপনার একমাত্র পুত্রের উপনয়নে যখন আংটি দিয়েছিলেন তাঁর কালোবাজারী আয়ের একটা নগণ্য নমুনা দেখিয়ে, তখন তাঁর পাঁচটি দুহিতার বিবাহ, আশীর্বাদ অথবা জন্মতিথি উপলক্ষে আপনার সামান্য আয় থেকেই তার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে হবে। তারপর আপনার নিজের আত্মীয়-স্বজন, কুটুম্ব বান্ধব আছেন যাঁরা শুধু মিষ্টান্নে অথবা মিষ্ট কথায় তৃপ্ত না হতে পারেন। হয়তো আছে শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্কে কুটুম্বিতার নানা শাখা-প্রশাখা। শুনেছি শ্যালিকা নাকি রস-মাধুরী, দাম্পত্য জীবনের টনিক-বিশেষ। কিন্তু টনিকের সিরাপ ও মাদক উত্তেজনা অচিরেই লুপ্ত হয় যদি শ্যালিকার সংখ্যা হয় একাধিক। আপনার গৃহিণী হয়তো দুটি সন্তান দানেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যদি হন সুখ-প্রসবিনী ?

আপনার যখন পড়তি বয়স, ঘাটতি দেনা এবং বাড়তি সংসার, তখন লৌকিকতা কি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায় না ? যখন দেখি সকালে কোথাও শানাই বাজছে, তখন আমার মন খারাপ

হয়। শানাইয়ের করুণ সুরে দুহিতার আসন্ন বিয়োগব্যথাই শুধু মূর্ত হয় না। হয় অন্য কিছু। প্রথমে মনে হয়, কন্যার পিতা আগামী এক বছরের তত্ত্বের খরচ হিসাব করে রেখেছেন তো, না কি কন্যাকে সমর্পণ করার সময়ে ভাবপ্রবণ হয়ে বেহিসাবী খরচ করছেন? দ্বিতীয় কথা হল—এই দুর্দিনে যেচে কেউ বিয়ে করে? একা নিজের কাছা সামলানোই দায়। তার ওপর গাঁট-ছড়া। তৃতীয় কথা হল নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্বের দল। কেউ বা হয়তো বিবাহ-প্রাঙ্গণে উপহারের মোড়কটি চাদরের আড়ালে রেখে শেষ ট্রামের সময় উত্তীর্ণ হবার উদ্বেগে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন। কোন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মীয় হয়তো মাসকাবারী সংসার জ্বালায় জর্জর হয়ে অবশেষে মরিয়া হয়ে ধার করেছেন। কারুর বা মুখ হয়তো গম্ভীর ও বেজার। লৌকিকতার চাপ, উপহারের নমুনায় গৃহিণীর উত্তাপ ইত্যাদি নানা আভ্যন্তরিক কারণে হয়তো মুখমণ্ডল আরক্ত, অপ্রসন্ন।

তখন মনে হয়—এ বিড়ম্বনা আর কত দিন? র‍্যাশনিং-এর কড়া নিয়মে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'-এর পালা তো চুকেই এসেছে। নিমন্ত্রণ-পত্রের শেষে মাত্র জলযোগের উল্লেখও থাকে। এটা যখন ছাঁটাই করে কমিয়ে আনা হয়েছে, তখন লৌকিকতার অত্যাচারটুকু উঠিয়ে দিলেই হয়! আপনারা হয়তো বলবেন, কেন—'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়'—কোনও কোনও চিঠিতে লেখা থাকে তো আজকাল। নিশ্চয়ই। সেটা

আমরাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মনের কোণে লেখা আছে 'যদি-আসো, ভালো প্রেজেন্টটাই এনো'। বিবাহ-সভায় যদি কোনো কবি অথবা লেখক-বন্ধু কিছু ফুল অথবা স্ব-রচিত দু' একখানা বই নিয়ে যান, তা নিয়ে সমাদরের অভিনয় চলে। পাঁচজনের কাছে বলা হয়, 'অমুক লেখক এসেছিলেন'। কিন্তু উপহারের টেবিলে সে বই আর ফুল সরিয়ে অন্যান্য মূল্যবান্ এবং দীপ্তিময় উপহারের যে মোড়ক খুলে রাখা হয়, সেটাও তো নজরে পড়ে। তাই মনে হয়, সবাই যদি উদ্যোগী হয়ে খাদ্যবস্তুনিয়ন্ত্রণ-নীতির অনুসরণে উপহারনিয়ন্ত্রণ-সূচক আইন পাশ করাতে পারেন, তবেই এই আচার-সর্বস্ব দেশে গৃহস্থের ক্ষীণ প্রাণ আরও কিছুদিন বাঁচে।

লৌকিকতা-প্রসঙ্গে এমন একটি ছুটি অনুষ্ঠানের কথা এসে পড়ে যা সত্যিই অর্থহীন, অকারণ অপচয়।

সাধারণ মানুষের জীবনে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনটির মধ্যে কিছুটা দৈবস্পর্শ আছে। কাজেই এসব অনুষ্ঠানে দেব-পূজা বা আরাধনার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেগুলি এককালে ছিল সরল সমাজ-ধর্মের প্রতীক, এখন সেগুলি দাঁড়িয়েছে বিশেষ ব্যয়-সাপেক্ষ এবং জটিল। একজন বিদেশী পণ্ডিত বলেছিলেন সাধারণ হিন্দুর জীবন সংস্কারের মধ্য দিয়েই কাটে এবং সে সব সংস্কারের পালন আবশ্যিক ধর্ম এবং কর্তব্য। জাতকের জন্মের আগে থেকেই সুরু হয় লোকাচারের শাসন। তারপর জন্মাবার পর থেকে চলতে থাকে বিবিধ আচার-অনুষ্ঠানের পালা। বর্তমান দিনে পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কারগুলি পালন করা হয় না। কিন্তু কাটাই-ছাঁটাই করেও যেগুলি আজও টিঁকে আছে, তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গোড়ার দিকে অন্নপ্রাশন আর সম্ভবস্থলে উপনয়ন এখনও বহু সংসারে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের তো কথাই নেই। নতুন যুগের নতুন ভাবধারা যতই দেশের হাওয়া বদলে দিক, বিবাহ-অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি অর্থব্যয় এবং

তার সামাজিক গুরুত্ব কিছুমাত্র কমেছে বলে মনে হয় না। তারপর, মরেও শান্তি নেই। সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর থেকে যমের দুয়ারে পৌঁছানো পর্যন্ত যত হাঙ্গামা আছে, সেগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভুক্তভোগীমাত্রেই সে লৌকিকতার দাসত্বের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত।

কিন্তু মৃত্যু এসেও পূর্ণচ্ছেদ টান্‌তে পারে না। এক বছর পর্যন্ত তার জের চলে। শতকরা পঁচিশজন আদ্যশ্রাদ্ধ করেই যবনিকা ফেলে দেন। কিন্তু বাকি পঁচাত্তর জন এখনও মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক কৃত্য উঠিয়ে দিতে পারেন নি। পুরোহিতের মুখে হয়তো শুনে থাকবেন যে 'চণ্ডী, কুশণ্ডী আর সপিণ্ডী' এই তিনটি বড় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। অর্থাৎ দুর্গাপূজা, বিবাহের পর কুশণ্ডিকা, আর মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ—এগুলি ভারি হাঙ্গামার কাজ অথচ হিন্দুর অবশ্য পালনীয়। দুর্গোৎসব সৌভাগ্যক্রমে বারোয়ারি হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিয়ে আর শ্রাদ্ধ তো চাঁদার ব্যাপার নয়। যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ এবং সাধ্যমত সমারোহের সঙ্গে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন না হলে পিতৃ-পুরুষরা অসন্তুষ্ট হবেন। তাই মধ্যবিত্ত মানুষ মরি-বাঁচি করে এই দুটি বোঝার ভার আজও টেনে চলেছে। যদি বলা যায়, এত সব বাজে খরচের দরকার কি—কমিয়ে দিলেই হয়? তা হলে সাগ্রহে সম্মতি জানাই। বোঝা নামিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে পুরো নিঃশ্বাস টানবার ইচ্ছা কার না হয়, বলুন? কিন্তু বিদ্রোহটা সাময়িক। আবার পুত্রের বা কন্যার বিবাহে ফর্দ ধরে

ও ধার করে জিনিস কিন্‌তে বাজারে ছুটি এবং পিতৃ-মাতৃ-দায়-গ্রস্ত হলে দীন-হীন-মলিন বেশে আত্মীয়-স্বজনের দুয়ারে ধন্না দিই। যতক্ষণ না কাজগুলি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, মনে উদ্বেগের অন্ত থাকে না—পাছে কোনও ত্রুটি থেকে যায়, লোকে নিন্দা করে।

এই লোকলজ্জা, চক্ষুলজ্জা, নিন্দাভয় প্রভৃতি জিনিসগুলোই সাংঘাতিক। অবিশ্যি চক্ষুলজ্জা আর লোকলজ্জা আছে বলেই সমাজ, নীতি ও ধর্ম হয়তো টিঁকে আছে। পাছে পাপ হয়, অকল্যাণ হয়, অসামাজিক বলে অপবাদ হয়, এই ভয়েই মানুষ খানিকটা ভদ্র ও সংযত হতে শেখে। কিন্তু তাই বলে অভদ্র রকমের ভদ্র সাজবার চেষ্টাটুকু কি নিরর্থক এবং সময়ে সময়ে মারাত্মক হয়ে ওঠে না? আমার যা দৈহিক সামর্থ্য, যেটুকু আর্থিক সঙ্গতি, আমি সেইমত কাজ করব। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পালন করে অতিরিক্ত শক্তি বা অর্থব্যয়ের ক্ষমতা যদি আমার না থাকে, তাহলে আমাকে জোর করে ও ধার করে কি লোক-দেখানো আড়ম্বর সৃষ্টি করতে হবে? মাতৃশ্রাদ্ধে যদি কেউ বারোটি ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করে, বিবাহ-উপলক্ষ্যে যদি কেউ খাদ্যবস্তুর তালিকা সংক্ষিপ্ত করে, তা হলে ক্ষতিটা কি? যে-যে বাড়ীর সঙ্গে লৌকিকতা আছে অথবা আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে, তাদের সকলকে পাল্টা নিমন্ত্রণ করবার সময় ও সঙ্গতি যদি না থাকে, তাহলে কি সেটা অপরাধ? সঙ্গতি যদি থাকেও, আমার যদি ইচ্ছা না হয় ভূতভোজন করাতে, তাতে কার কি? পুরাতন জামাই যদি বাড়ী আসেন, তাঁকে প্রতিবারই এক গ্লাস জলের সঙ্গে এক থালা মিষ্টান্ন গলাধঃকরণ করতে হবে কেন?

এসব প্রশ্নের জবাব আছে জানি—সংস্কার। না করলে ভালো দেখায় না। মেয়ে বাপের বাড়ী থেকে যখন ফিরে যায়, সঙ্গে মিষ্টি দিতে হয়। পূজোর সময় নাতি-নাত্‌নীদের পরিধেয় বস্ত্র উপহার দিতে হয়। নইলে শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ের কথা শুনতে হয়। একটু শুনলে ক্ষতি কি? না-ই বা ভালো দেখাল? শুন্‌তে শুন্‌তে জবাব আপনি জোগাবে, আর দেখতে দেখতে চোখ-সওয়া হয়ে যাবে। কাজেই নিজের মত বা ইচ্ছা খাটাতে গেলে অপর পক্ষের সঙ্গে যেটুকু সংঘর্ষ অনিবার্য, সেটুকুর জন্য প্রস্তুত হবার উপযোগী একটুখানি মনের জোর থাকলেই অপর পক্ষ আপনি মাথা নত করবে। আপনি যদি বৈবাহিকের অকারণ খোসামোদ না করেন, প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও পরে তিনি আপনাকে যথেষ্টই খাতির করবেন। আপনি যদি ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষ্যে শক্ত হয়ে বলেন, এই দুর্দিনে অযথা আড়ম্বর আমি করব না। লোক-বাহুল্য আর ব্যয়-বাহুল্য বর্জন করব, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খরচ করব, একটি পয়সাও অপব্যয় করব না। মেয়ে-নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে গাড়ী পাঠানো, কুটুম্বিতা উপলক্ষ্যে বিশ্ব-রাজ্যের মহিলা, তাঁদের গুম্ফযুক্ত বাহন আর অপোগণ্ডগুলিকে একত্রে জড়ো করবার মত উৎসাহ ও প্রবৃত্তি আমার নেই। এতে যদি আমার অপবাদ হয়, হোক। জাঁক-জমক, ফুল, আলো, আর বাজে আচার-অনুষ্ঠান বাবদ অযথা অর্থ নষ্ট করব না। তাহলে আপনি জিত্‌বেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কল্যাণ হবে।

আসলে উদ্যোগী হয়ে কেউ অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে চান না। শুধু তাই নয়—অনেক সময়ে উপযাচক হয়ে নিজে খরচ করে, লোক-দেখানো বড়মানুষি আর মুখ-হাসানো ছেলেমানুষি করে একটা অসৎ দৃষ্টান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। আপনার না হয় দুটি মেয়ে, আর কেউ নেই। সবই তারা পাবে। তাই কন্যাদের বিচ্ছেদব্যথায় ভাবপ্রবণ হয়ে জামাতা-বাবাজী ও তাঁর অভিভাবকের পদে সাতখানা বেনারসি, সত্তর ভরি সোনা আর নগদ সতেরো হাজার ঢেলে দিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ভেবে দেখুন এর ফলাফল কি? আর পাঁচজন মেয়ের বাপের কি সর্বনাশটা আপনি করছেন। অকারণে খাঁই বাড়িয়ে সমাজের কতটা ক্ষতি ও অমঙ্গল করলেন, সেটা শান্ত মনে ভেবে দেখবেন। আপনার হয়তো কিছুটা বিজ্ঞাপন হল! কিন্তু লাভবান্ হলেন কি? তাই আজও বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে যখন মণ্ডপে দাঁড়াই, দেখি বড় বড় গাড়ীর আনাগোনা, ফুল আর রেশম আর সোনায় সাজা লীলাচঞ্চল মূর্তিগুলির উচ্চকিত কণ্ঠস্বর, পৃথক কক্ষে সযত্নে সাজানো নিখুঁত দানের ঘটা, পরিচয়-পত্র-সমেত উপহারের রাশি আর সেই সঙ্গে দেখি উচ্ছিষ্ট খাদ্যের স্তূপাকার, তখন মনে মনে বলি—এই বুদ্ধিহীন হৃদয়হীন সমাজের আইন যদি কিছু থাকে, সেখানে ফাঁকির কারবারই ষোল আনা। আইন ভঙ্গ করলে দণ্ডব্যবস্থা আছে আবার সুবিধামত দণ্ড এড়িয়ে যাবার উপায়ও নাকি আছে। কিন্তু সমাজ-আচরণে পরকে ও নিজের মনকে নিত্য যে ঘুস দিয়ে থাকি, তার বিরামও নেই, শাস্তিও নেই।

উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করা সামাজিক মানুষের ধর্ম। তাতে সামাজিক মেলা-মেশার সুযোগ পাওয়া যায়, মনে আনন্দ ও তৃপ্তি আসে। কালগুণে অবশ্য তাদের চেহারা বদলে যায়। কখনো আসে আতিশয্য যার ফলে একটা উচ্ছৃঙ্খল ভাব মনকে অধিকার করে বসে। কখনো বা অতিরিক্ত মার্জিত রুচির বশে অকৃত্রিম আনন্দের উৎসমুখ আমরা চেপে ধরি। নয়তো কাটাই ছাঁটাই করে কোনো একটি প্রাচীন অনুষ্ঠানের এমন রূপান্তর করে ফেলি যে, অনেক সময় বোঝাই যায় না, এট কি বস্তু।

সম্প্রতি দুটি অনুষ্ঠান দেখবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমার ঘটেছে। প্রাচীন ভারতে মদনত্রয়োদশী তিথিতে সুবসন্তক কিংবা কার্তিকী পূর্ণিমায় যক্ষরাত্রি উৎসবের কথা পড়েছি। সহকারভঞ্জিকা, নবপত্রিকা কিংবা পাঞ্চালানুযান প্রভৃতি রঙ্গক্রীড়ার কথাও শুনেছি। সে কালের নাগরিকরা এই সব উৎসব-কৌতুক কিভাবে পালন করতেন তার মোটামুটি বর্ণনাও সংস্কৃত সাহিত্যের দৌলতে পাওয়া যায়। এ সব জিনিস আজকাল নেই। কিন্তু যেগুলি আছে, তাদের অনুষ্ঠান কিভাবে পালন করা হয়, তাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও সম্প্রতি পেলাম। তাই এ প্রসঙ্গ অবতারণা করছি।

হোলি আমাদের দেশের একটি প্রাচীন উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা মুখ্যতঃ একটি ধর্মমূলক অনুষ্ঠান। কিন্তু কালক্রমে এই উৎসব বৈষ্ণব গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করে হিন্দু ভারতের একটি প্রধান আনন্দ-অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধু হিন্দু নয়, মুসলিম শাসনকালেও হোলির কদর কমে নি। শোনা যায়, শায়োন-উৎসবে হিন্দুদের সঙ্গে অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারও যোগদান করতেন। দোলা খাটিয়ে, কাজরী গান গেয়ে হিন্দু মুসলিম জাতিধর্মনির্বিশেষে একদিন নগর-গ্রাম-পল্লী সঙ্গীতমুখর করে তুলেছিলেন। তখন ইউরোপীয় মানুষ তাদের কাঁচের পেয়ালা, লেস্, ছুরি-কাঁচি, পিস্তল আর রঙ-বেরঙের বনাত নিয়ে সবে ভারতে আমদানী হতে সুরু করেছে। 'ইউনিটি' কথাটা তখনও সৃষ্টি হয় নি, সাগর-পার থেকে আমদানী হয় নি। কাজেই এই বিলিতি 'ইউনিটির অভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব তৈরি হয়নি। শাসক এবং শাসিত হয়েও তাঁরা একসঙ্গে পাশাপাশি থাকতেন। একত্র বাসের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সহজ-সরল সামাজিক আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে হিন্দুরা সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ বলে পূজো করতেন, গাইয়ের প্রথম দুধ দরগায় পাঠাতেন। এমন কি শোনা যায়, অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহরমে তাজিয়া বার করতেন। অপরপক্ষে মুসলমান পরিবার থেকে হিন্দুদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশায় কোনও কুণ্ঠা ছিল না। হিন্দুদের পৌত্তলিক পূজা-পার্বণে তাঁরা অংশ গ্রহণ না করলেও শ্রাবণে

হিন্দোলায় ছুলতেন, কাজরী গাইতেন। নব-বসন্তে ফাল্গুন মাসে তাঁরা হোলি গাইতেন, ফাগ খেলতেন। পরস্পরের বাড়ি আবীর-কুঙ্কুমের সঙ্গে বাদাম-পেস্তা, মনোক্কা-মোরব্বার ভেট্ পাঠানো হত। অনেক মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞ হোলির গানের কদর করতেন, কেউ কেউ বা 'কাহ্নাইয়া' 'নন্দলালা'র রঙ্গলীলা অবলম্বন করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ-সৃষ্টি করে গেছেন। হোরি ধ্রুপদ ও ধামার, হোলি খেয়াল, বসন্ত-ভৈঁরো-বাহার-পরজ প্রভৃতি সুর ও গায়ন-পদ্ধতি এই হোলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

কিন্তু সঙ্গীত অথবা সমাজ-বিবর্তনের কথা যাক্। বর্তমানে কি দেখলুম, সেই কথাই বলি। গত ছুয়েক বছর ধরে এই উৎসবের নামে শহরে যে তাণ্ডবলীলা চলে থাকে, সেটা যে কোনও সভ্য দেশের সামাজিক কলঙ্ক। যে উৎসবে প্রত্যাশা করা যায় আনন্দ, রুচি, ভদ্রতার পরিচয়, তাতে এসেছে এমন অশোভন, অভব্য বিশৃঙ্খলা যে হোলির নামে এখন সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস-সঞ্চার হয়। জাতিধর্মের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতের মতন সেজে, সারাদিন পাগলের বেশে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানোই হল বর্তমান দিনের দোললীলা। নবলব্ধ স্বাধীনতার যে এমন অপপ্রয়োগ কোনদিন হতে পারে, সুস্থ মানুষ তা কল্পনাও করেন নি। যে স্বাধীনতা আনে সংযম, মর্যাদাজ্ঞান এবং আন্তরিক পূর্ণতা, আমাদের বেলায় সেটা দাঁড়িয়েছে একটা বিশ্রীরকমের উগ্র,

বেপরোয়া মনোভাবে। অপরের সুবিধা-অসুবিধা, সংস্কার, এমন কি ব্যক্তিগত রুচি ও স্বাধীনতাকে পদদলিত করাই যেন দোললীলার আসুরিক পরিচয়। মাইফেল-জশমের দিন না হয় চলে গেছে। বাঙলা দেশ থেকে সঙ্গীত-সংস্কৃতিও না হয় বিদায় নিয়েছে, তার বদলে হয় তো এসেছে নতুন ধরণের একটা উচ্ছৃঙ্খল চেতনা। কিন্তু তাই বলে একটি বহুদিনের সমাদৃত উৎসব-অনুষ্ঠান যে গুণ্ডামিতে পরিণত হয়ে যাবে, পাড়ায় পাড়ায় মারামারি চলতে থাকবে এবং উত্তেজিত রঙ্গমত্ত মানুষদের ধরপাকড় করে চালান দিতে হবে—এমন সামাজিক চিত্র অনুমান করা সমাজ-নেতাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

আর একটি ঘটনা। কিছুদিন পূর্বে একজন পরিচিত ভদ্রলোক এসে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। কিন্তু কি উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, সেটা বললেন না। বরঞ্চ মনে হল, যেন একটু গোপন করলেন। পূর্বেও একাধিকবার বিড়ম্বনা ঘটেছে, উৎসবের কারণ না জানার ফলে বিনা উপহারে নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত হয়ে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়েছি। কিন্তু এবারে চেষ্টা করেও জানতে পারলুম না। ভদ্রলোক আম্‌তা-আম্‌তা করে বললেন, "তেমন কিছু ঘটার ব্যাপার নয়। একটু কীর্তন গান-টানের ব্যবস্থা এবং লঘু জলযোগের আয়োজন........."

সভায় উপস্থিত হয়ে কেমন যেন মনে খট্‌কা লাগল। সভামণ্ডপ নিখুঁতভাবে সাজানো। রঙ্গ-বেরঙ্গ কাপড়ে, শালু-মোড়া খুঁটিগুলো ফুলের মালায় জড়ানো। প্যাণ্ডালের

এক দিকে ফরাস্ বিছানো, অপর দিকে চেয়ার সাজানো। মধ্যে আসর, জাজিম-পাতা। সুন্দর এবং সুরুচিকর ব্যবস্থা। তবে ভাবলুম, বিশেষ কোনও উপলক্ষ না হলে এমন আয়োজন যেন অসঙ্গত ঠেকে। বাইরে ক্রমশঃ গাড়ির ভিড় বাড়তে লাগল এবং নানাধরণের স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী সভামণ্ডপে প্রবেশ করতে লাগলেন। তারপর আসরে একদল সুসজ্জিতা তরুণী আসন গ্রহণ করলেন, অপর দিকে ঠিক মুখোমুখি একদল সুবেশ তরুণ সার বেঁধে বসলেন।

সময়ে এবং পেটা ঘড়ির নির্দেশমত হঠাৎ কোরাস্ গান সুরু হল আধুনিক ঢঙে। তারপর কীর্তনের পালা। দ্বৈত-কীর্তন। তরুণের দল ধুয়ো ছাড়লেন তো তরুণীর দল উতোর গাইলেন। মধ্যে মধ্যে বিরতি। পান, সিগারেট ও চা অকৃপণভাবে বিতরিত হল। কীর্তন শেষ হলে নৃত্য আরম্ভ হল। ঠিক বিষয়-বস্তুটা বুঝতে পারলুম না, তবে অনুমান করলুম কি একটা করুণ ব্যাপার নিয়ে মূক নৃত্যাভিনয় চলছে। রাত দশটার পর সভা ভঙ্গ হল। গৃহকর্তা এগিয়ে এসে সমাদরে পাশের আর একটি জায়গায় আমাদের জলযোগের জন্য নিয়ে গেলেন। আহার-পর্ব চুকে গেলে যখন বিদায় নিচ্ছি তখন তাঁকে প্রশ্ন করলুম, 'ব্যাপার কি বলুন তো?' তিনি একটু শোক-গম্ভীর মুখের ভাব ফুটিয়ে দেয়ালে ঝোলানো পুষ্পশোভিত একখানি ফটো দেখিয়ে বললেন, "আমার কাকা। আজ আদ্য-শ্রাদ্ধ......"

স্তম্ভিত হলুম। এ-ও একরকম সামাজিক বিবর্তন।

মৃত্যুভয় জিনিসটা বড় সাংঘাতিক।

কথাটা খুবই সোজা এবং সকলেই জানেন। কিন্তু এই ভীতি কিভাবে আমাদের সমস্ত জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে, আমাদের বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠান এবং যাবতীয় সংস্কারকে কতখানি অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত করে ফেলেছে এবং এমন কি অনাগত ভবিষ্যৎ চিন্তাকে পর্যন্ত প্রভাবিত করছে, সেটা তলিয়ে দেখলে একটু বিস্মিত হতে হয় বৈকি! যদি কেউ বলে—আপনি ভীষণ গোঁড়া লোক, পাঁজি না দেখে এক পা নড়েন না, তখন আপনি মনে মনে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেও মেনে নেবেন। কিন্তু যদি কেউ বলে, আপনার এই অন্ধ সংস্কারটা আসলে মৃত্যুভয় থেকেই আসছে, আপনি সহসা সেটা স্বীকার করতে চাইবেন না। তবু কথাটা সত্যি। যাত্রা, শুভকর্ম প্রভৃতি কাজে যোগিনী, ত্র্যহস্পর্শ, নক্ষত্রদোষ প্রভৃতি জিনিসগুলোর যখন খোঁজ করেন, বারবেলা কালবেলা প্রভৃতি অশুভলক্ষণ এড়িয়ে যেতে চান, তখন পাছে কিছু অমঙ্গল ঘটে, নিজেরই হোক বা আর কোনও বিশিষ্ট আত্মীয়েরই হোক, কোনও আপতিক বাধা না পড়ে, এই মনোভাবটাই তখন আপনার সাবধানতার পিছনে কাজ করছে। আবার সেই সাবধানতা

আসছে মৃত্যুভয় সম্পর্কে অতি ন্যায্য সতর্কতা থেকে। গ্রহ-বৈগুণ্য খণ্ডাবার জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা এবং রুষ্ট শনির প্রীত্যর্থে নানাবিধ ক্রিয়া-কলাপ অনেকেই করে থাকেন এবং এ সব চেষ্টা যে নিছক মৃত্যুভয়-প্রসূত, সেটা বলে দেবার দরকার করে না।

ভূতের ভয় একটা অত্যন্ত সাধারণ মনোবৃত্তি। মুখে স্বীকার করি আর না করি, অকারণে অশরীরী আত্মা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তেমন ইচ্ছুক আমরা নই। কারণ সেই একই অজানার বিভীষিকা। মৃত্যুর পরে কোথায় যাবো, কি করবো, কি অবস্থা হবে—এই চিন্তাগুলো যখন আমাদের স্নায়ু-মন পীড়িত করে, তখনই অজ্ঞাত পরলোকের অস্বস্তিকর ভাবনা এড়াবার জন্যে কয়েকটা কাজ করি, কয়েকটা বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করি এবং পার্থিব আশ্রয়ের ভিতর দিয়ে একটা স্থায়ী, পারলৌকিক সান্ত্বনা খুঁজি। এটা মানবমনের সহজাত প্রবৃত্তি।

যিনি বৈদান্তিক, যিনি বৈজ্ঞানিক, যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী, তিনি অবশ্য কোনও সংস্কারেই বিশ্বাস করেন না। যুক্তিতর্ক দ্বারা অবচেতন মনের সঞ্চিত ভয় ও সংস্কারকে খণ্ডন করে দেন। যে জিনিস অপ্রত্যক্ষ, যে অস্তিত্ব প্রমাণ-সাপেক্ষ নয়, যে ভয় অজ্ঞাত অবাস্তবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে, তাকে স্বীকার তিনি কখনো করেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষ, এমন কি শিক্ষিত মানুষ পর্যন্ত এই মৃত্যুভয় এবং তারই আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ কাটিয়ে উঠতে পারেন না। যে বৈজ্ঞানিক জগতের অত্যাশ্চর্য

ব্যাপারগুলিকে অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করেন, যিনি বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা ব্রহ্মের সন্দেহজনক অস্তিত্ব অপ্রমাণ করতে উদ্যত, তিনি অবশ্য পরলোকে বিশ্বাস করেন না, করতে পারেন না। পদার্থতত্ত্ববিদ্ পরমাণুর বিস্ময়কর গঠন ও শক্তি নিয়ে গবেষণা করেন, পরমাণুর ভগ্নাংশকে প্রচণ্ড এক বিশ্বশক্তির মূলীভূত আধার রূপে ব্যবহারিক প্রয়োগে সার্থক করবার চেষ্টা করেন। কখনো কখনো হয়তো পরমাণুবিদ্ ক্ষুদ্রতম এই শক্তিবিন্দুর আচার-ব্যবহারে একটা অব্যক্ত, বিস্ময়কর অনুভূতির অধিকারী হন, যেমন জ্যোতির্বিদ্ কোটি কোটি যোজন-বিস্তৃত মহাশূন্যে বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলী ও অদৃশ্য নীহারিকাপুঞ্জের ধ্যান-ধারণায় একটা আধ্যাত্মিক মানসিক পর্যায়ে উন্নীত হন। কিন্তু সজ্ঞানে অথবা প্রাক্তন সংস্কারে আস্থাবান্ হয়ে, মৃত্যুর পরে অজ্ঞাত প্রেতলোকের অবস্থিতি সম্পর্কে মাথা ঘামাবার সময় অথবা প্রবৃত্তি তাঁর নেই। না থাকার প্রধান কারণ শুধু যুক্তিবাদী মনোভাব নয়, বিজ্ঞানসাধনার অনন্যদৃষ্টি এবং অবসরের অভাব। যদি অবসর পেতেন, তা হলে তাঁর মন অধ্যাত্ম-চিন্তার দিকে ঝুঁকত কিনা কে জানে! বৈজ্ঞানিক হয়েও হয়তো তিনি দার্শনিক হতেন এবং দার্শনিক হয়ে, দৃশ্য জগতের স্বরূপনির্ণয়-প্রসঙ্গে অ-দৃশ্য এবং অ-দৃষ্টের তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত থাকতেন।

বৈদিক যুগের তত্ত্বজ্ঞ এবং সত্যান্বেষী মানুষ আর বর্তমান যুগের সংসারে বীতরাগ, পারমার্থিক সাধনায় নিযুক্ত মানুষ, উভয়েই সেই একই প্রাথমিক তথ্য অথবা তত্ত্ব-চিন্তায় আকৃষ্ট

হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মানুষ যত বিভিন্ন উপায়ে তত্ত্ব-সাধনা করেছেন, তার হিসাব-নিকাশ করলে বোঝা যায় পথের তফাৎ থাকলেও গন্তব্য একই। মানুষের মন দেহ-কষ্ট, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুভয় কি করে কাটিয়ে উঠে অপার্থিব সুখের অধিকারী হতে পারে, আত্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে মৃত্যু যে মাত্র একটি নিতান্তই শারীরিক অবস্থান্তর এই সত্য উপলব্ধি করে মরণোত্তর নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হতে শেখে, পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম ও দর্শন সেই প্রচেষ্টারই ইতিহাস। উপনিষদের ঋষি, বুদ্ধ, খৃষ্টান মিস্টিক, বৈষ্ণব মরমিয়া, সুফী সকলেই মৃত্যুর বিভীষিকা জয় করবার চেষ্টায় সাধনা করেছেন। আত্মার অমরত্ব আর দেহের নশ্বরত্ব—এ দুটি তত্ত্বই মৃত্যু-চিন্তা থেকে আসছে। মৃত্যুর মতন এমন একটা সহজ, সাধারণ, জৈব বিবর্তন যে এত জটিল তত্ত্বচিন্তায় মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, বিভিন্ন ধর্ম অথবা দর্শনের সৃষ্টি করেছে যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে। খুব সহজ একটা শারীরিক অবস্থা-বিপর্যয় বলেই মৃত্যু এত অবিশ্বাস্য, ভীষণ।

একদিন সকালে উঠে সূর্য আর দেখা যাবে না। রাতের আকাশ, বসন্তের হাওয়া, চাঁদের আলো উপভোগ করবার জন্য এই দেহ-মন থাকবে না। পৃথিবীর চিরপরিচিত পথে অপরিচিত মানুষ হেঁটে বেড়াবে, সংসারের চাকা চলবে নিয়মিত অভ্যস্ত মসৃণ গতিতে। সাময়িক অভাবের বিলাপে শূন্য ঘর কিছুদিন স্তব্ধ ও ভারি হয়ে থাকবে, তারপর "আত্মার আত্মীয়া" গা ঝেড়ে

উঠবেন, যথানিয়মে বড়ি দেবেন অথবা ভাঁড়ারের তদারক করবেন। অতি প্রিয় খাদ্য, বেশ-ভূষা অব্যবহৃত থাকবে। প্রিয়তম আত্মীয়ের হৃদয়ে এই দারুণ মৃত্যুশোক ক্রমশ বিলীয়মান একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে। বহুদিনের সঞ্চিত অভ্যাস, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা প্রভৃতি ব্যক্তিগত রুচি, অভিজ্ঞতা, এমন কি এই শরীরকে কেন্দ্র করে যে বুদ্ধি যে অন্তঃকরণ, যে কল্পনা, যে ব্যক্তিত্ব এত দিন ধরে বেড়ে উঠেছিল, দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেসব হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে—এই সব চিন্তা সত্যিই মারাত্মক।

চিন্তাগুলো নিছক আত্মপ্রীতির নমুনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের যা কিছু কর্ম ও চিন্তা, সবই তো আভিমানিক। যিনি এই আত্মকেন্দ্রিকতা জয় করে' জীবন তথা শরীরধর্মের তুচ্ছতা উপলব্ধি করেন, প্রসারিত করেন আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তাকে কাল-পরিমাণহীন অনন্তকর্মের আর জ্ঞানের প্রেরণায়, তিনিই মহাপুরুষ। এক কথায় তিনি মৃত্যুভয় জয় করেছেন। কেন না মৃত্যুভয়প্রসূত যে সমস্ত চিন্তা আর জীবনের প্রতি অসীম মমত্ববোধের ফলে যে সমস্ত চেষ্টা মানুষের দৃষ্টিকে খণ্ডিত করে, সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, সেগুলোকে তিনি দূরে সরাতে পেরেছেন। বহু কষ্ট করে এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হয়। জগতে এমন মনীষী নেই বললেই হয় যা'কে আত্মনিগ্রহ ভোগ করতে হয়নি। টেনিসনের 'ক্রসিং দি বার্' আর রবীন্দ্রনাথের 'সম্মুখে শান্তিপারাবার' অল্প

আয়াসলব্ধ মুক্তির শান্তি নয়। আর আমরা সাধারণ মানুষ? সময় থাকতে ভোগ করে নিই, নয়তো ভবিষ্যতের সংস্থান চিন্তায় মোটা অঙ্কের জীবনবীমা করি কিংবা আশ্বাসপ্রদ শাঁসালো এক গুরু সংগ্রহ করি।

গুরু-সংগ্রহ করা যে অন্যায় কাজ, তা বলতে চাই না। বরঞ্চ যথাসময়ে দীক্ষা গ্রহণ একটি সংস্কার বিশেষ, ধর্মজীবন আর সদাচার প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিরই পরিচয়। গুরু গ্রহণের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি আছে, সেগুলো বোঝা এমন কিছু কঠিন নয়। প্রত্যেক সভ্য সমাজেই ধর্মের বিশিষ্ট স্থান আছে। এবং সে ধর্ম পালন করার জন্য তার যথার্থ ব্যাখ্যার জন্য একজন উপদেষ্টার প্রয়োজন। পাদ্রী, মৌলবী, গুরুর জন্ম এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অধ্যাত্ম-সাধনায় পথ চিনে নেবার জন্য বিজ্ঞ ও হিতার্থী গুরুর উপদেশ এক জিনিস। আর ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, অহেতুক এবং অন্ধ গুরুভক্তি আর এক জিনিস। যিনি বুদ্ধিবাদী, যুক্তি ও বিচারপন্থী, তিনি জ্ঞানমার্গ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করতে নারাজ। কেন না তিনি বিবেককে চোখ ঠেরে, বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে গুরুভক্তির মতন মৌতাত সেবনে অনিচ্ছুক। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের মতন ধীমান্ সংশয়বাদী ব্যক্তিকেও পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের অসাধারণ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের কথা হচ্ছে না। পৃথিবীতে যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ একবারই আবির্ভূত হন। গান্ধীজীকেও শিষ্য সংগ্রহ করতে বেরুতে হয়নি। অবর্ণনীয়

ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে স্থূল, জড়বাদী ও কুটিল সত্তাও আপনা হতেই মাথা নত করেছে মহাত্মার কাছে।

জনসাধারণের গুরুপ্রীতি এবং অন্ধ, অর্ধোন্মাদ, কামনাপূর্ণ ব্যাকুলতার কথা উত্থাপন করছি এই কারণে যে, এ জিনিষটা উন্নতির সহায় না হয়ে চারিত্রিক অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়ে। মানুষ নিজে কিছুমাত্র ভাবতে শেখে না। যা বলেন, যা করান গুরুদেব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একজন কুলগুরু থাকেন এবং যথাসময়ে তাঁর কাছে সস্ত্রীক দীক্ষিত হওয়া গার্হস্থ্য আশ্রমধর্মের অঙ্গবিশেষ। এতে কোনও আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু আপত্তি ওঠে যখন নিতান্তই পার্থিব কামনা নিয়ে বিপদে-আপদে গুরুদেবের শরণাপন্ন হই। গুরু যদি প্রকৃত গুরু হন, তিনি শিষ্যকে নিষ্কাম ধর্মাচরণ দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ ও সংযত করতে শিক্ষা দেবেন। কিন্তু মোটামুটি দেখতে পাই, গুরু শিষ্যদলের প্রীতি ও সন্তোষবিধানের জন্য অকারণ বাগ্‌বাহুল্য করছেন এবং ব্যয়-বাহুল্য করাচ্ছেন। দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে মানুষ সর্বদাই উন্মুখ। তাই গুরুর মারফৎ শিষ্য চান "মির‍্যাক্‌ল্।" আপনার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য অনেক গুরুকে তাই নীচু ধরণের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন থাকে, তাহলে গুরুর অনুষ্ঠিত প্রক্রিয়া অথবা ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয় নিতান্তই ঘটনার আকস্মিক পরম্পরায়। তখন শিষ্যরা অন্ধ ভক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে স্তুতিগান জুড়ে দেয়। যিনি খাঁটি সাধক প্রকৃতির

মানুষ, তিনি গুরুর কাছে পারমার্থিক শান্তি ও কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করেন না। আর যিনি সত্যিকারের গুরু, তিনিও উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু বিতরণ করেন না। বিভূতির মায়া দেখিয়ে তিনি আপনাকে খেলো করেন না অথবা ঈশ্বরকে অবমাননা করেন না।

আমার মমে হয়—কথায় কথায় গুরুদেবের কাছে ছুটে যাওয়া, তাঁর পাদোদক সেবন করা ইত্যাদি কাজগুলি মানুষ স্বেচ্ছায় করে না। অনেকটা যন্ত্রচালিত হয়ে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় করে। গুরুর কাছে মানুষ লজিক চায় না, চায় ম্যাজিক। চায় এমন ঐশী শক্তির নমুনা—যাতে বিপদ পালায়, সৌভাগ্য করতলগত হয়, চোখ বুজে অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মলাভ হয়। বিপদের সময় লোকে যেমন যায় জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্যগণনা করাতে কিংবা কোষ্ঠী-বিচারে অশুভ রিষ্টি খণ্ডন করাবার জন্যে শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে, গুরুদেবের কাছেও তেমনি শিষ্যদল ছোটে অনেকটা এই মনোভাব নিয়ে। তাই অনেক বুদ্ধিমান্ গুরুকে জানতে হয় 'নিউরসিস্'-পীড়িত শিষ্যদের গোপন আকাঙ্ক্ষা আর দুর্বল মুহূর্তগুলিকে। তাতে সুবিধা আছে। পারিবারিক ব্যাপারে, সম্পত্তির বণ্টনে, উইল তৈরী অথবা মামলা চালানো প্রভৃতি কাজেও আধুনিক যুগের গুরুরা অনেক সময়ে আসরে নেমে পড়েন। আপনারা হয়তো দেখেছেন—বহু সংসারে মনোমালিন্য প্রবেশ করেছে, এমন কি সাংসারিক সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে কর্তার গদগদ গুরুভক্তিতে আর গুরুর

অহেতুক মধ্যবর্তিতায়। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনও ভেঙ্গে গেছে এক পক্ষের গুরুভক্তি-রূপ স্নায়ু-দৌর্বল্যে এবং গুরুর অকারণ হস্তক্ষেপে।

বলা বাহুল্য এসব গুরু, গুরু নয়, অন্য কিছু। দুটি পা থাকলেই যেমন মানুষ হয় না, দুখানি পাখা থাকলেই যেমন পাখী হওয়া যায় না, তেমনি গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরে শিষ্যদের কানে "হ্রীং ক্রীং" মন্ত্র দিলে আর কোমলাঙ্গী শিষ্যাদের মধুর সেবাস্পর্শ নিলেই গুরু হওয়া যায় না। বর্তমান যুগে গরুর ঘাস থেকে জ্ঞানচর্চা পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যেই ভেজাল ঢুকেছে। জাতীয় চরিত্রের অবনতিক্ষণে ছাত্র-শিক্ষক, মক্কেল-উকীল, রোগী-ডাক্তার আর শিষ্য-গুরুর পারস্পরিক সম্পর্কের রূপান্তর ও অর্থান্তর ঘটেছে। তাই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অষ্ট-শ্রী-মণ্ডিত বহু-তীর্থ-পরিভ্রমণকারী গুরুদের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই কাগজে-কলমে। কিন্তু কাছে গিয়ে অনেক সময়ে পাই কথামৃতের ক্ষীরাস্বাদ নয়, ছেঁদো কথা আর চতুরালির ঘোলা জল। আমার মনে হয়—যাঁরা সদ্‌গুরু, তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্নই থাকেন। নয়তো হাল-চাল দেখে, উৎকট এবং অন্ধ সংস্কারের মানসিক বিকারগ্রস্ত শিষ্য-শিষ্যাদের কবল থেকে পালিয়ে বাঁচেন।

সম্প্রতি এমনতর একটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখে বিচলিত হলুম। আর সেই প্রসঙ্গে এত কথার সৃষ্টি হল। গিয়েছিলুম ষ্টেশনে একজন বিশিষ্ট আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলে দিতে। আমরা উভয়েই

অন্যমনস্ক ছিলুম। তাই একটি কম্পার্টমেন্টের সামনে অকারণ জনসমাগম তেমন লক্ষ্য করিনি। পরে অনুসন্ধান করে জানলুম ঐ কম্পার্টমেন্টেই আমার আত্মীয়ের বার্থ। অনেক কষ্টে মালপত্র নিয়ে কুলীর সাহায্যে আমি একলাই গাড়ীতে প্রবেশ করলুম। আমার নিরীহ আত্মীয়টি তখনও পাদানিতে পদার্পণ করতে পারেন নি। তার কারণ, ইতিমধ্যে গাড়ির সামনে বিশ গজের মধ্যে এত নরনারী বালক-বালিকার ভিড় জমে গেছে যে ত্রিসীমানায় আসা অসম্ভব। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে একজন নগ্নপদ চন্দন-চর্চিত, মুণ্ডিতমস্তক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপারটা কি ? তিনি জবাব দিলেন না। বিছানাটা বার্থের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে প্রথম যৌবনে যে কৌশলে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের ফাইনাল খেলায় ঢুকেছিলুম, সেই কৌশল অবলম্বন করেই গাড়ির শ্বাসরোধকারী ভিড়ের ভিতর থেকে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম সকলের মুখেই একটা অধীর প্রতীক্ষা, ব্যাকুলতার ছাপ। পরে জানতে পারলুম 'সাধুবাবা' আজ চলে যাচ্ছেন। সকলেই তাঁর কৃপাশ্রিত অথবা কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু কেউই বলতে পারলেন না, তিনি কে, তাঁর নাম কি, তিনি কোন্ প্রদেশের অধিবাসী আর কোথায়ই বা তিনি চলেছেন। একজন অন্তরঙ্গ বৃদ্ধ শিষ্য কেবল বললেন, "ওঁর সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানে না। বছরে একবার আসেন, তার পর আমাদের কাঁদিয়ে চলে যান। এত ভাষা জানেন যে কোন্ দেশের লোক বলা শক্ত। বয়স জানা কঠিন, চল্লিশ বছর আগেও ওঁকে ঠিক

এই রকমই দেখেছি। কোনও পরিবর্তন হয় নি। কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন বছর পঁচিশ আগে। এখনও মৌনী।"

সাধুবাবা এলেন, নিমেষে পথ হয়ে গেল এবং সে সুযোগে আমি ও আত্মীয় দুজনেই ঢুকে পড়লুম। তারপর গাড়ি ছাড়া পর্যন্ত সে কী দৃশ্য! অর্ধোন্মাদ শিষ্য-শিষ্যার সে কি হুড়োহুড়ি, বারবার প্রণাম, পা জড়িয়ে শুয়ে থাকা আর কান্না! তিনি নিরুপায়। স্মিতমুখে হাত জোড় করে বসে আছেন। শ্রদ্ধা হল। দূরে থেকে নমস্কার জানালুম। মনে মনে বল্লুম— বুঝেছি সাধুজি! কিসের ঠেলায় মৌনী হয়েছেন আর ঠিকানা না দিয়ে পালিয়ে বেড়ান।

'অক্ষয়-স্বর্গ-কামনয়া'—শ্রাদ্ধমন্ত্রের এই অংশটি বারে বারে মনে পড়ছে। অনেকবারই শ্রাদ্ধকৃত্য করতে হয়েছে। তাই মন্ত্রগুলো একরকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। সেই সব মন্ত্রের মধ্যে স্বর্গ-কামনাটি পরিস্ফুট। এত বেশি যে মনে হয়, সত্যি বোধ হয় স্বর্গ বলে কোনও বাস্তব পদার্থ আছে। পরমসৌগত সম্রাট প্রিয়দর্শীও তাঁর প্রজাবর্গকে ধর্মাচরণে প্রবুদ্ধ করেছিলেন স্বর্গের মনোরম ছবি দেখিয়ে—হস্তী, বিমান আর জ্যোতি দর্শন করিয়ে। খৃষ্টান যাজকের দলও ধর্মপ্রচারের সময়ে স্বর্গরাজ্যের বিস্তারিত উল্লেখ করেন। কাজেই আমাদের শাস্ত্রে ও সংস্কারে যে স্বর্গ-কামনা শিকড় চালিয়ে বসে আছে, সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। পারত্রিক মঙ্গল আর নরক-ত্রাণের জন্যই যত কিছু ক্রিয়াকলাপ। অতএব এও একরকম ঘুষ। অহরহ যে মৃত্যুভয় মানুষের মনকে ঘিরে আছে, তার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমরা স্বর্গবাসের কল্পনাকে আঁকড়ে আছি। উপায় কি? বিপদটা বাস্তব ও চাক্ষুষ এসে দাঁড়ালে হয়তো অতি বড় কাপুরুষও মরিয়া হয়ে বীরের মতন আচরণ করে। কিন্তু কাল্পনিক এবং অনায়ত্ত বলেই মৃত্যু-চিন্তা এত মারাত্মক। দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমার এক আত্মীয় ছিলেন—যিনি বাতিকগ্রস্ত মানুষ। শরীরের প্রতি তাঁর অসম্ভব মমতা ছিল। মানে, রোগের ভয় আর মৃত্যুর ভয় তাঁকে এতই কাবু করে ফেলেছিল যে, কোনমতেই তিনি 'রিস্‌ক্‌' নিতেন না। পৃথিবীর অদৃশ্য বীজাণুর সঙ্গে লড়াই করা চলে না। তাই অধিকাংশ সময়েই রাস্তায় বেরুলে তিনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রাণায়াম করতেন। অর্থাৎ তীব্র ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে তিনি অনুমান করতে পারতেন, নিকটেই কোনও আবর্জনা আছে কিনা এবং সময়মত আগে থেকেই দম বন্ধ করে চলতেন।

শুধু তাই নয়। সর্ব বিষয়েই তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল, কখন কি ভাবে মৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়াবে। চীনাবাদাম খেতেন না, কার একবার পেটের অসুখ করেছিল। আমের গায়ে ফুটো, পেঁপের গায়ে দাগ—এগুলো তাঁর শক্তিশালী চশমার খুব নিকটে ধরে' তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখতেন। পোস্ত, তাল, নোনা, পেয়ারা, তরমুজ এবং ইলিশ মাছ তিনি ছুঁতেন না। ওগুলো 'কলেরা ফুড'। বৎসরে দু-বার স্নান করতেন। একবার পয়লা বৈশাখ আর একবার পয়লা আশ্বিন। স্নানের উপকারিতায় তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। বলতেন: 'কূয়োর দড়ি বেশীদিন চলে, না আল্‌নার দড়ি বেশিদিন টেঁকে?' তাঁর গায়ে কেউ হাত দিতে পারত না, যেহেতু মৃদুতম ঘর্ষণে যদি একটি মাত্র লোম উৎপাটিত হয়, তাহলে কার্বঙ্কলজনিত মৃত্যু অনিবার্য্য। অসহ্য দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চুপ করে

থাকতেন। কিন্তু ডেন্টিস্টের ত্রিসীমানায় যেতেন না, কারণ দাঁত তুলতে গিয়ে একজনের চোয়ালের হাড়ে নেক্রসিস হয়েছিল। পায়ে হুঁচোট লেগেছিল বলে তিনি 'সীরাম্' ইনজেকশ্যন নিয়েও সেইস্থানে এত টিঞ্চার আয়োডিন, তুঁতে প্রভৃতি শোধক দ্রব্য ঘষেছিলেন যে, সেখানকার ক্ষত শুকোতে মাসাধিক কাল লেগেছিল।

তিনি ছিলেন এ্যাগ্নষ্টিক এবং অবিবাহিত। স্ত্রীলোকের মজ্জাগত কপটতা ও অসাধুতা বিশ্লেষণ করে' তিনি সংসারের অশান্তি এবং জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করেন এবং সেই সূত্রেই তিনি ব্রহ্মের সন্দেহজনক অস্তিত্বে উপস্থিত হন। তীব্র ও তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কোনও সাধারণ মন্তব্যে পৌঁছানো এবং স্ত্রীলোক সম্পর্কে এমন মনোভাব পোষণ করা অত্যন্ত অযৌক্তিক, একথা কেউই তাঁকে বোঝাতে পারে নি। সবচেয়ে মজা এই, তিনি এম-এ পরীক্ষায় লজিক পেপারে প্রথম স্থান অধিকার করে-ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, অধিকাংশই দুঃস্বপ্ন। যেগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করা চলত না, সেগুলিকে তিনি প্রিমনিশ্যন অথবা পূর্বাভাস বলে অভিহিত করতেন। এই সব স্বপ্নের মধ্যে কয়েকটি তাঁর জীবনে আশ্চর্য্য রকম মিলে গিয়েছিল এবং তার মধ্যে একটি হ'ল তাঁর নিজের মৃত্যু-সম্পর্কে। তিনি একবার অর্ধজাগ্রত কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁরই কোনও এক বিশিষ্ট বন্ধুর ছায়ামূর্তি দেখেন। এ ঘটনার কিছুদিন আগেই সে বন্ধুর মৃত্যু ঘটেছিল।

তন্দ্রার ঘোরে দেখা হলেও, এতদিন বাদে বন্ধুর সঙ্গে চাক্ষুষ (?) মিলন-কালে তিনি কুশল-প্রশ্ন না করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তিনি নিজে কবে মারা যাবেন। উত্তর পেলেন, সাতচল্লিশ বছর বয়সে। পরপারে কি আছে না আছে, অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্পর্কে তিনি কোনও প্রশ্ন করেন নি। কেননা এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণা খুবই দৃঢ় ছিল। মৃত্যুভয় যথেষ্ট থাকলেও তিনি মনে করতেন, মৃত্যুর আসল কষ্ট বা বিভীষিকা সাময়িক। একবার মরতে পারলে চিন্তার কোনও কারণ নেই। যেখানেই হোক, থাকার একটা ব্যবস্থা হবেই। শূন্যই হোক, আর জলস্থলপূর্ণ একটা নির্দিষ্ট স্থানই হোক্, সেখানে দুর্গন্ধ বা আবর্জনাকুণ্ড নেই—এটা আশা করা যেতে পারে। তবে বন্ধু অদৃশ্য হবার পূর্বে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। সেটা স্ত্রীলোক সম্পর্কে। উত্তরে বন্ধু বলেন, "ও সব কিছু ভাবিস নি……ওদের আত্মা নেই। ওরা এখানে আসতে পারে না……"

এর পর থেকে তাঁর মৃত্যুভয় অনেক পরিমাণে কমে গেল। অর্থাৎ জীবনের স্বাভাবিক মমত্ববোধ কিংবা রোগভীতি অথবা কয়েকটা বাতিক ছাড়া আর বিশেষ কিছু দুশ্চিন্তার কারণ রইল না। সাতচল্লিশ বছরে পড়বার আগেই তাঁর আসন্ন প্রয়াণ সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন হয়ে এ সংসারের বাকি কর্তব্য এবং কয়েকটি পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে নিলেন। হঠাৎ ধূমপান নেশাটা খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল, এইটুকু পরিবর্তন

মাত্র লক্ষ্য করেছিলুম। নইলে মরণভয় নিয়ে আর মাথা ঘামাতেন না। অতিরিক্ত ধূমপান নিয়ে যখন অনুযোগ করেছি, তখন তিনি বলতেন, সবই তো ধোঁয়া! ঐ তো একমাত্র সত্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, "নেতিমূলক বিচারে একটা কোনও জায়গায় এসে থামতে হয়। সেটা ঈশ্বরও হতে পারেন, প্রকৃতিও হতে পারে। মনে হয়, ব্রহ্ম থাকলেও থাকতে পারেন। বিজ্ঞান আরও অগ্রসর হলে অদৃশ্য তড়িৎশক্তির সাহায্যে কোন পরীক্ষা যদি সফল হয়, তবেই বলা যাবে—কিছু আছে কি না। এ বিষয়ে মন খুব খোলা এবং নির্বিকার রাখাই উচিত। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফি পরীক্ষার সময়ে ঈশ্বরের অধ্যায়টি বাদ দিয়েছিলুম, ও থেকে বিশেষ প্রশ্ন আসে না……"

সে যাই হোক্, তিনি তৈরি হতে লাগলেন প্রফুল্লচিত্তে এবং নজর করে দেখলুম তাঁর শীর্ণ দেহে একটু একটু মেদ-সঞ্চার হয়েছে। তবে তাঁর একটা ধারণা জন্মালো কলেরায় তাঁর প্রাণবিয়োগ হবে। আমরা আমাদের কর্তব্য করবো, যথাবিহিত তাঁর চিকিৎসা করাবো, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যাবে না। ব্যাপারটা দাঁড়ালো তাই। সাতচল্লিশ বছর পূর্ণ হবার কয়েকদিন আগে নিতান্তই অসময়ে তাঁকে কলেরায় ধরল। সে সময়ে এ রোগ কোথাও হচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর পূর্ব ধারণা অনুযায়ী তাঁকে যথাসময়ে এবং নির্দিষ্ট রোগেই যেতে হ'ল। তাঁকে এতটুকু ম্লান অথবা ভীত ও কাতর দেখি নি। সময় থাকতে তিনি তৈরি

হয়েছিলেন এবং বহুদিন-সঞ্চিত মৃত্যুভয় জয় করে বেশ প্রশান্ত মনেই তিনি গত হলেন।

* * * *

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হল একজন আত্মীয়ার। তিনি ছিলেন পুত্রহীনা বিধবা। বাল্যকাল থেকে তাঁর কাছে শুনে এসেছি, জীবনে তাঁর কোনও প্রয়োজন নেই। দেবতা অথবা সংসারের কোনও কাজেই তাঁর আবশ্যকতা নেই। এমন মূল্যহীন দগ্ধ জীবন থাকার চেয়ে যাওয়াই ভালো। একবার তাঁকে কোনও এক নামকরা জ্যোতিষী তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, তাঁর পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। বছরখানেক বাদে মাঘ মাস পর্যন্ত তাঁর মেয়াদ। তবে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালে মারক গ্রহের অশুভ দৃষ্টি কেটে যেতে পারে। বিধবা স্ত্রীলোক সে কথা হেসে উড়িয়ে দেন।

কিন্তু এই কথা শোনার পর থেকে তিনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা, হাসি-খুশি মেজাজ লুপ্ত হল। বয়স্থা হলেও তাঁর সৌন্দর্য এবং শরীরের বাঁধুনি ছিল দেখবার মতন। কিন্তু জ্যোতিষীর গণনা-ফল শোনার পর থেকেই তাঁর বর্ণ ও স্বাস্থ্য অত্যন্ত মলিন হতে লাগল। তাঁর এই অহেতুক মৃত্যুভয় নিয়ে কত ঠাট্টা-তামাসা করেছি। জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী যে বিশুদ্ধ বুজরুকি, স্বস্ত্যয়ন বাবদ কিছু অর্থ আদায়ের ফন্দি যে তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, এ কথাও তাঁকে বহুবার বুঝিয়েছি। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। যিনি এতদিন

ছিলেন সাহসী এবং আপনার দেহ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন, তিনি হঠাৎ অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। দেহ আর জীবনের প্রতি তাঁর মায়া অসম্ভব বেড়ে গেল এবং অবশেষে বিনা রোগে ভয়পীড়িত এই মহিলা একদিন শয্যাগ্রহণ করলেন এবং বিশেষ কোনও উৎসর্গ না জুটতেই প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর কি রোগ হয়েছে, প্রতিবেশিনীরা প্রশ্ন করলে তিনি সত্য কথাই বলতেন—'মৃত্যু-ভয়। আর কিছু নয়, দিদি···'

দেহত্যাগের পূর্বে মানুষ প্রস্তুত হয়ে নেয়। সমাজও এই প্রস্তুতির অনুমোদন করে। অজ্ঞাত জগতে প্রবেশ করবার আগে ইহলোকের বন্ধন কাটানো প্রয়োজন। যিনি সংযত ও শুদ্ধসত্ত্ব অথবা স্থিরপ্রজ্ঞ, তিনি প্রত্যাসন্ন প্রয়াণের আভাস টের পান। সেই মত আপনার মনকে তৈরী করে নেন। কিন্তু সাধারণ লোকের অতখানি আত্মস্থ ভাব নাও থাকতে পারে। তাই আত্মীয়-স্বজন, হিতৈষী প্রতিবেশী—এক কথায় সমাজ, কতগুলি ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করেছে। বহুদিন রোগভোগে জীর্ণ মৃত্যুপথযাত্রীর মঙ্গলকামনায়, অঙ্গ ও চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত, বৈতরণী প্রভৃতির ব্যবস্থা শাস্ত্রে অনুমোদিত আছে। কালক্রমে এগুলি অন্তঃসারশূন্য অনুষ্ঠানে পরিণত হয়ে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই এসব সংস্কার বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু যেটুকু আজও টিঁকে আছে, সেটুকুও নিতান্তই অর্থহীন মনে হয়—যদিও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কাছে সেটা খুবই অর্থপূর্ণ। যাঁরা উদাসীন ও নির্বিকার, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না এবং পরলোকের জীবনাবস্থা নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁদের কাছে অবশ্য সমাজপতি অথবা ধর্মধ্বজ ব্যক্তিরা ঘেঁসতে পান না। কিন্তু ওরি মধ্যে যে সব লোকের এখনও পাঁজি-পুঁথিতে বিশ্বাস আছে, পরলোকের ভয় কিংবা মৃত্যুর পর আত্মার

ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ব্যাপারে আস্থা আছে, তারা সময় থাকতে বৈতরণী, প্রায়শ্চিত্ত বিধির ব্যবস্থা করে।

এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। আমাদেরই প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা চলত। মানুষটি সত্যিই ভালো ছিলেন। অর্থাৎ নিরীহ, নির্বিবাদ। সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি তখন একাদিক্রমে বিশ বছরেরও ওপর পেন্স্যান ভোগ করছিলেন। স্বাস্থ্য তাঁর ভালই ছিল। মানে, খারাপ হবার উপায় ছিল না। আশির কাছাকাছি বয়স হলেও মোটামুটি তাঁর কার্যক্ষমতা অটুট ছিল। নিয়মিত স্নান, আহার, ঘড়ির কাঁটা ধরে বেড়াতে যাওয়া এবং বাড়ী ফিরে আসা, চাকরের সাহায্যে তৈল-মর্দন, সামান্যতম সর্দির আভাসে ঔষধ-সেবন, দিবা-নিদ্রার বদলে চশমা লাগিয়ে (ধর্মগ্রন্থে অরুচির ফলে) ডিকেন্সের উপন্যাস-পাঠ, প্রত্যহ মধু-ক্ষার-কটু-অম্ল প্রভৃতি নবরস সেবন ইত্যাদি নানা প্রকারের স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রক্রিয়া অবলম্বন করার ফলে জরা তাঁকে আক্রমণ করতে পারে নি। জীবনে তাঁকে নিয়মের অতিরিক্ত ভোজন করতে দেখি নি। তবে ঠাণ্ডার ভয়ে তিনি একটু কাতর হয়ে পড়তেন। প্রতি বৎসর তাঁর বাড়ীতে ধূমধাম করে সরস্বতী পূজা হত। সে সময়ে শীতটা কমে এলেও তিনি মাথা-ঢাকা টুপি পরে বসে থাকতেন। বলতেন—৫-৫২ মিঃ সময়ে সূর্যাস্ত, তারপরেই হিম পড়তে সুরু করে।

সাড়ে ছ'টায় অতিথিদের পঙক্তি-ভোজন আরম্ভ হত। আটটায় সব শেষ। সাড়ে আটটা থেকে ন'টার সময়ে কোনও লোক সেই রাস্তা দিয়ে গেলে বুঝতেই পারত না যে এ বাড়ীতে কিছুক্ষণ আগে অনেক নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতের দল এসেছিলেন। সাড়ে সাতটা বেজে গেলেই আমরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়তুম এবং শত কাজ ফেলেও তাঁর বাড়ীর দিকে ছুটতুম—পাছে গিয়ে দেখি ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ না গেলেও নয়। তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতেন। সকাল-সকাল অতিথিদের খাইয়ে অর্থাৎ এক একটি ব্যাচ্ বিশ মিনিটের মধ্যে সেরে আটটায় শেষ করতে হত। তাই দই-মিষ্টি পাতে পড়ছে, ওদিকে বাঁ হাতে আমাদের পান নিতে হত। ভদ্রলোক সাড়ে আটটায় শেষ ছিলিমটুকু খেয়ে নটায় শয্যা গ্রহণ করতেন। এ হেন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না যে যমরাজ উঁকি দেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বেড়াতে গিয়ে দেখি তাঁর হাতে গীতা। একটু বিস্মিত হলুম, ভাবলুম বোধ হয় কৌতুহলের বশে ধর্মগ্রন্থ একটু আধটু উলটে দেখছেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই কি একটা পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে পেলাম একখানি পকেট গীতা এবং একটি রূপোর সিকি।

সে সব সত্যযুগের কথা—একটি সিকিতে তখন এক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক, একটি দেশলাই আর এক দোনা মিঠে পান পাওয়া যেত। তবু গীতার বিতরণ দেখে ভাবিত হলুম। পরে সন্ধান নিয়ে জানলুম যে তাঁর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, ভাঙন ধরেছে। মধ্যে

মধ্যে বেড়াতে না বেরিয়ে বাড়ীতেই সদালাপ চলেছে এবং তার চেয়ে যেটি বড় সমস্যা, একজন যাজক ব্রাহ্মণ পিছু নিয়েছে। তারপর থেকেই ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য আরও ভাঙতে লাগল এবং সেই অনুপাতে পুণ্যাহ পালন ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা ইত্যাদি বাড়তে লাগল। অবশেষে কয়েক মাস শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন। ইত্যবসরে উইল তৈরী হ'ল। প্রাপ্তির আশায় সেই ধর্মোপদেষ্টা পুরোহিতটি তখনও সঙ্গ ছাড়েন নি। শেষ মোকায় যদি আরও কিছু মেলে, এই চিন্তায় তাঁর যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। শয্যার পাশে বসেই তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ, অধ্যাত্ম-চর্চা, পরপারের কড়ি-সঞ্চয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি কখনো প্রাঞ্জল ভাষায়, কখনো নাটকীয় ভঙ্গীতে বেশ বিশদ ভাবেই বোঝাতে লাগলেন। এসব কাজের জন্য, ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও চার টাকা দৈনিক ফি ধার্য্য হল। ঘরের আত্মীয়-স্বজন ইতিমধ্যে এই পুরোহিতের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে উঠলেন।

অবশেষে শেষ মুহূর্ত একদিন ঘনিয়ে এল। সে সময়টা আমি ছিলুম। অতএব যা দেখেছি, তাই লিখছি। যখন ডাক্তার জবাব দিয়ে গেলেন যে আশা নেই, এখন কেবল শেষ সময়ের প্রতীক্ষা, তখন মুমূর্ষু বৃদ্ধ হলেও পুত্র কন্যারা বিমর্ষ হলেন কিন্তু পুরোহিত দমবার পাত্র নন। সময়টা ছিল সন্ধ্যা। তিনি আসছি বলেই চট্ করে বেরিয়ে গেলেন, বোধ হয় খেয়েদেয়ে এসে কাজে লাগবেন বলে বলসঞ্চয় করতে গেলেন। যাবার সময়ে তাঁর সহকর্মী ভাইপোটিকে নজর রাখবার জন্য বাইরের

ঘরে বসিয়ে রেখে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে বাড়ীর বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, কর্তার ইচ্ছা ছিল, প্রায়শ্চিত্ত-বৈতরণী করা হয়। বহুদিন শয্যাশায়ী হয়ে রোগভোগ করলে প্রায়শ্চিত্ত করাই যুক্তিসঙ্গত। তা ছাড়া, কৃতী পুরুষ, যশস্বী ব্যক্তির মৃত্যুকালে যদি উপার্জনশীল পুত্রেরা এই সামান্য কর্তব্যে ত্রুটি দেখান, তাহলে কলি পূর্ণ হয়েছে বলতে হবে। কেউই রাজি হলেন না। কিন্তু পুরোহিত যখন বললেন 'কর্তার এখনও একটু জ্ঞান আছে। আমি একবার তাঁর কাছে যাবো, দেখি তাঁর কি ইচ্ছা,' তখন সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দান করলেন।

আমি বাইরের উঠানে ছিলুম। দেখলুম পুরোহিত নেমে এসে ভাইপোকে ইঙ্গিত করবা মাত্রই দুজনেই শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। এবং আশ্চর্যের বিষয় অল্পক্ষণের মধ্যেই যাবতীয় উপকরণ নিয়ে হাজির হলেন। শয্যার পাশেই দাঁড়িয়ে, কখনো বা বসে, ক্রিয়া চলতে লাগল। রোগী তখন অসাড়। কিন্তু কাজের কোনও ব্যাঘাত হল না। পুরোহিতের অদম্য উৎসাহ ঘনায়মান মৃত্যুশোককে যেন নিমেষে মন্ত্রবাণের সাহায্যে দূর করে দিল। এর পর বৈতরিণীর পালা। পুরোহিত বললেন, গাভী তো নেই। অতএব গাভীর বিনিময়ে দক্ষিণা দিলেই চলবে। দক্ষিণার পরিমাণ শুনে সকলেই হতভম্ব। এমন সময় কর্তার ছোট ছেলে বলে উঠলেন, "শাস্ত্রীয় মতে যখন কাজ হচ্ছে তখন কোনও ত্রুটি হতে দেব না। যদি গাভী না মেলে, বাছুর

কিনে আনছি।” তিনি আমার দিকে তির্যক্ দৃষ্টিপাত করতেই আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে এলুম। তারপর তুজনে পরামর্শ এঁটে নিকটেই গলির মধ্যে এক গোয়ালার কাছ থেকে একটি বাছুর সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম। পুরোহিতকে খবর দেওয়া হল। তিনি আসন ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি নেমে এসে বাছুরটিকে দেখে বড় প্রীত হলেন। মনে-মনে ততক্ষণ তিনি বাছুরটিকে বিক্রি করলে কত দর পাওয়া যাবে তারই একটা হিসাব-নিকাশ করে ফেলেছেন।

এখন মহা-সমস্যার সৃষ্টি হল—বাছুরটিকে দোতলায় কর্তার পাশে কি করে নিয়ে যাওয়া যায়। এত লোকজনের মধ্যে বাছুরটি অত্যন্ত ভীত-চকিত হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করে তাকে নাড়ানো গেল না। বাছুরটি নিতান্ত কচি নয় যে পাঁজা-কোলা করে তোলা যাবে। তখন পুরোহিতেরই গামছা গলায় বেঁধে তাকে টানতে হল। সিঁড়ির কাছে এসে কিন্তু ‘পাদমেকং ন গচ্ছামি’ অবস্থা। অগত্যা পুরোহিত তার কান তুটো মর্দন করতে লাগলেন। কর্তার ছোট ছেলে গামছা ধরে টানতে লাগলেন। আর আমি পশ্চাতে দাঁড়িয়ে লেজ মোচড়াতে লাগলুম। প্রথমে ভয়ের চোটে বাছুরটি সিঁড়িটা নোংরা করে ফেলল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আধ ঘণ্টা ধস্তাধ্বস্তির ফলে তাকে ওপরে নিয়ে যাওয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের অধ্যবসায়ের ফল কি দাঁড়ায় তা দেখবার জন্য সমবেত স্ত্রী-পুরুষ মুমূর্ষু বৃদ্ধকে ছেড়ে সিঁড়ির কাছে জমায়েৎ হয়েছেন।

সে যাই হোক্। আমাদের কাজ উদ্ধার হল। অচৈতন্য বৃদ্ধের অবশ হাতখানিকে কোনও প্রকারে গরুর লেজে ঠেকান হল এবং সংক্ষেপে মন্ত্রপাঠ শেষ হল। এবং আশ্চর্য্যের বিষয়— তার একটু পরেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু নির্গত হল। যেন গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হবার প্রতীক্ষাতেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস আটকে ছিল। কিন্তু তারপরেই পুরোহিত বুঝতে পারলেন যে তিনি ঠকে গেছেন। ওটি পুরুষ-বাছুর। স্ত্রী-বৎস হলে লাভের আশা ছিল। জিনিস-পত্র-সমেত বাছুরটিকে নামিয়ে অগত্যা বাড়ী রওনা হলেন। কিন্তু হঠাৎ গামছাশুদ্ধ বাছুর চার পা তুলে দৌড়ে পাশের গলিতে তার মনিব গোয়ালার চালা ঘরে গিয়ে ঢুকল। আমাদের বৈতরণী-পালাও সাঙ্গ হল।

আমাদের যেমন বৈতরণী পার হতে হয় গরুর লেজ ধরে, গ্রীক পুরাণেও তেমনি নৌকোয় পার হতে হয় যমরাজার দুয়ারে পৌঁছুতে হলে। ওদেরও আছে Styx আর Lethe নদী, খেয়ার মাঝি Charon আর প্লুটোর রাজপুরীর ভীষণ রক্ষক Cerberus কুকুর।

পরলোক আর স্বর্গ অথবা পাতাল সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি সব প্রাচীন জাতেরই এক ধাঁচের। মিশর, ব্যাবিলন, ঈজিয়ন, গ্রীক, চীন অথবা ভারতীয় সকল প্রাচীন সভ্যতাই মৃত্যুর পর অজানা জগৎ নিয়ে চিন্তা করেছে; ভূতপ্রেত কিংবা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে একটা কাল্পনিক শৃঙ্খলা খাড়া করেছে। কেবল স্থানীয় প্রথা অনুসারে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কার এবং অনুষ্ঠান। কিন্তু মোটামুটি সব জাতেরই মধ্যে অশরীরী আত্মা ও পারত্রিক অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জল্পনা আছে আর আছে ভৌতিক জগতে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অতি প্রাচীন সংস্কার। সভ্যতার বিবর্তনে আজ আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। কিন্তু মনে-প্রাণে আজও সেই আদিম সংস্কারের অতি-স্বাভাবিক আতঙ্কের শিহরণ লেগে আছে।

দৃশ্য জগতের অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের কোনও একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে,—একটা পুরানো গাছ, নির্জন পাহাড়ী উপত্যকায়

হয়তো কোনও এক প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড অথবা লোকালয়ের মধ্যস্থলেই একটা জীর্ণ কিংবা পরিত্যক্ত বাড়ি নিয়ে এমন একটা ভৌতিক মণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে যেটা অবিশ্বাস করলেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা শক্ত। মানুষ যেমন দৈবে বিশ্বাস করে, জ্যোতিষ-গণনা কিংবা ভবিষ্যদ্‌ বাণীতে পূর্ণ আস্থা না রেখেও হাত দেখায়, তেমনি ভূত অথবা আত্মীয় বিশ্বাসী না হয়েও একেবারে এ অদৃশ্য বস্তুগুলোকে উড়িয়ে দিতে পারে না। মানুষের মজ্জায় ও রক্তের মধ্যে রয়েছে এই কায়াহীন ছায়ার রহস্যময় প্রীতি-আকর্ষণ। তাই সাহিত্যে আর জীবনে এত ভূতের গল্পের ছড়াছড়ি। যেটা অজ্ঞাত, যেটা অদৃষ্ট, সেই জিনিসটাই মনকে টানে। বিশ্বাস করি আর না করি, ভূতের গল্প পড়তে ভাল লাগে, খাঁটি বিলেতী ভূত। কেননা, এটা ঠিক যে ইংরেজ ও আমেরিক্যান লেখক ভৌতিক আবহাওয়া যেমন নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন অন্য কোনও দেশের লেখক তেমনটি পারেন নি। ওদের দেশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা সকলেই অল্পবিস্তর ভূত নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। মধ্যযুগে নোম., স্পুক, গবলিন অথবা শয়তানের দল তো ছিলই। বর্তমান জীবনের জটিল অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বিদেশী ভূতেরাও আধুনিক সাজে রূপান্তরিত হয়েছে। সেক্‌স্‌পীয়রের যুগ চলে গেছে। কিন্তু অনেক কিছু কর্ম এবং ভাব-জগতের বিপ্লব কাটিয়ে ভৌতিক আকর্ষণ আজও টিঁকে আছে। এডগার অ্যালান পো থেকে আধুনিক মার্কিন লেখক জেম্‌স্‌ থার্বর, স্টীভেনসন থেকে এম-আর-জেম্‌স্‌ পর্যন্ত যত ইংরেজ আর

আমেরিক্যান সাহিত্যিক এই অদৃশ্য জগতের নাগপাশ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ব্ল্যাকউড-এর ‘দী উইলোজ’, ডীলা মেয়রের সীটনস্ আণ্ট কিংবা জেমস্-এর ‘দী মেজোটিণ্ট’ নামক অপূর্ব রহস্য-গল্পের গা-ছমছমানির পাশে দেশী ভূতের গল্প একেবারেই জোলো মনে হয়। কায়াহীন আত্মা নিয়ে নিরবয়ব রহস্যমণ্ডল রচনা করতে জানতেন একা রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মাত্র দু চারটি গল্পই তিনি লিখে গেছেন।

‘ফ্যানটাসি’ লেখা অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ কল্পনার সাহায্যে সার্থক কাহিনী রচনা করা সত্যিই শক্ত কাজ। পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে, প্রকাশে আর ইঙ্গিতে খাঁটি আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হলে চাই উঁচুদরের শিল্পীর হাত। ফ্যানটাসির অর্থ নয় অসংলগ্ন কয়েকটা রোমাঞ্চের শিথিল গ্রন্থি। ফ্যানটাসি কিংবা ভূতের গল্পের প্রাণবস্তু হল অ্যাট্‌মস্‌ফিয়র অর্থাৎ একটি যথার্থ পরিবেশ। তাতে আতিশয্য থাকবে না তথ্যের। কিন্তু থাকবে সারবস্তু, মূল কথা—যেটি ভাষার লীলায়িত অথচ সংযত গুণে যথাসময়ে যথাযথ-ভাবে ফুটে উঠবে, পাঠকের মনকে অযথা উত্তেজিত না করে অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে সার্থক পরিণতির গভীর গহ্বর মুখে এনে ছেড়ে দেবে। এ ধরণের গল্প লিখতে গেলে চাই অসঙ্গতির জগতে শুদ্ধ কল্পনার ধারিণী শক্তি। অস্পৃশ্য এবং অদৃশ্য মণ্ডলের সঙ্গে থাকবে সূক্ষ্ম সংস্পর্শ; থাকবে বাস্তব ও জড় জগতের নিত্য এবং বোধগম্য স্পর্শ-সঙ্গতি।

ভূতের গল্পের মধ্যে জাতের তফাৎও আছে। শুধু একটা

ভয়-ভয়, গা-শিউরে-ওঠা ভাব, নিশুতি রাতের আলো-ছায়ার কারসাজি কিংবা অমাবস্যার অন্ধকারে মুমূর্ষু রোগীর কোটরগত চক্ষু, শ্মশানঘাটের নির্জনতা অথবা পোড়ো বাড়িতে কালো বেড়ালের আনাগোনা নিয়ে গল্প বলা বা লেখা যায় বটে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে গল্পের দাগ থাকে না মনে। সান্ধ্য মজলিস কিংবা বর্ষার আসর-জমানো গল্প এক ধরণের আর ভৌতিক কথাসাহিত্য অন্য ধরণের সৃষ্টি। অজানা অচেনা ও অদেখা জিনিস কিংবা মনোভাব নিয়ে কারবার করতে হলে চাই হুঁসিয়ার কলম। চাই সহজ সংযম।

আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে—এই ভূতের গল্প মানুষকে কিভাবে বরাবর মুগ্ধ, আকৃষ্ট করেছে। মানুষের মন এক বিচিত্র, স্বতন্ত্র জগৎ—যে জগৎ দৃশ্য আর অদৃশ্য পদার্থের মধ্যে এক ধুম্র সেতু বন্ধন করে রেখেছে। তার এ দুর্বলতা চিরন্তন। অশরীরী ছায়ারাজ্য, দুর্জ্ঞেয় এবং অনুপলব্ধ রহস্যের প্রতি তার এই স্বাভাবিক এবং অচ্ছেদ্য আসক্তি। আদিম যুগ থেকে চলে আসছে এই ম্যানড্রেক শিকড়ের রূপক কাহিনী। ইতিহাসের প্রাচীন পাতায়, ভূর্জপত্রে, রক্ত লেখায়, কাজল অক্ষরে আর পাথরের কুঁদোয় কতো অলিখিত গল্প, কতো পুরাতন জনশ্রুতি, বিশ্বাস ও সংস্কার ছড়িয়ে আছে। সেই অর্ধবিস্মৃত অন্ধকার পরিবেশে আমাদের উজ্জ্বল আধুনিক মনও অসহায়ভাবে পথ সন্ধান করে ফেরে। রূপকথা হল কথাসাহিত্যের প্রাচীন বিকাশ। কিন্তু তারও আগে আছে অজানার ভয়, মোহ এবং দুর্নিবার

আকর্ষণ। মাটির নীচে আর শূন্য হাওয়ায় তার শিকড় চলে গেছে। অচেতন এবং অবচেতন মনের গভীরে প্রবেশ করে আছে ভৌতিক গল্পের ঐতিহাসিক মূল।

আমি নিজে ভূতের গল্প পড়তে ও শুনতে অত্যন্ত ভালোবাসি। তাই বোধ হয় এখনও ভূত ছাড়াতে পারছি না। ভূতের গল্পের যতই ইন্‌টেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা করি না কেন, আসলে মন আমার ভয়-প্রবণ। এই ভয়-প্রবণতা আছে বলেই ভূতের গল্প আমার কাছে এত প্রিয়। যে জিনিসটা ভয়ের কারণ, সেই জিনিসটাই অদ্ভুত মোহজালে মনকে জড়ায়। শিশু যখন মায়ের কোলে শুয়ে নিরাপদ দেহে আর আশ্বস্ত মনে ভয়ের গল্প শোনে, তার সেই মনের দোলা থামে না। বড় বয়সে নিশ্চিন্ত মনে লেপ গায়ে দিয়ে শীতের রাত্রে ভূতের গল্প পড়বার সময়ে সেই পুরাতন শিশু-মনের কিছুটা উত্তেজনা আর অধীর আগ্রহ এসে আবার তার ভয়-প্রবণতা জাগিয়ে দেয়, মুগ্ধ করে তার সাময়িক সত্তাকে, বিশ্বাস করায় অশরীরী মূর্তির নিঃশব্দ অস্তিত্বে। পড়তে পড়তে চোখের পাতা জড়িয়ে যায়, অপাঙ্গ দৃষ্টির পলকে মনে হয় কে যেন অশ্রুত পদসঞ্চারে সরে গেল। গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবু ভালো লাগে। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েও ঘুম আসে না। মৃত ব্যক্তিদের কথা, কতদিনের আগেকার শোনা গল্প মনের দরজায় এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। আলোটা আবার জ্বালতে হয়, শয্যা থেকে উঠে চোখে মুখে জল দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে হয়। মানুষের মন দূরযানী, দৃষ্টিও অদৃশ্য-সন্ধানী।

পরলোক আর প্রেততত্ত্বের চর্চা তাই সকল সভ্য দেশেই অল্পবিস্তর হয়েছে এবং এখনও চলছে। মৃত্যুভয় থেকে আসে এই সব চিন্তা, জানবার আগ্রহ। বিশিষ্ট আত্মীয়-বিয়োগে মন যখন কাতর অথবা অপর পারে কি হচ্ছে এবং সে কেমন আছে, এই সব জানবার জন্য মন যখন ব্যগ্র ও অধীর হয়ে ওঠে, মানুষ তখন থিওজফিস্ট হয়। সীয়াঁস আর টেবল-টিলটিং মারফৎ পরলোকের বার্তা পাবার জন্য সে তখন উন্মুখ হয়ে ওঠে। উত্তর প্রত্যুত্তরের সাহায্যে যদি কিছু মিলে যায় অথবা কোনও সত্য ঘটনার বিবৃতি প্রকাশিত হয়ে পড়ে—যা অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে, তা হলে হাজার শিক্ষিত হলেও মন পরলোক এবং আত্মার নিঃসংশয় সংবাদে আস্থাবান্ হয়ে পড়ে। কত শিক্ষিত ব্যক্তি থিওজফি-চর্চায় প্রতারকের পাল্লায় পড়ে অর্থ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করছেন, সে খবর অনেকেই জানেন। ও জিনিসের এমনি মোহ যে ঠকেও আবার ঠকতে হয়।

মৃত্যু থেকে রোগের কথা আসাই স্বাভাবিক। রোগের ভয় অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা প্রবৃত্তি, যার সঙ্গে মৃত্যুভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মনের ভিতরে এই রোগভীতি এমন ভাবে কাজ করে চলে যে ওটাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা নতুন অর্থ দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুভয়গ্রস্ত, তাকে আমরা দুর্বল অসহায় ভেবে কৃপার চক্ষে দেখি, মনে মনে শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু যে মানুষ সমস্তক্ষণ রোগচিন্তায় তন্ময়, তাকে বাতিকগ্রস্ত বলে ভাবলেও তেমন অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে দেখি না। যার রোগভয় আছে, তার খানিকটা সাধারণ বৈজ্ঞানিক বোধ আছে এবং রোগের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করবার ক্ষমতা আছে। সর্বদা রোগ-চর্চা করে করে তার কিছুটা আধা-ডাক্তারি হাব-ভাব এসে যায়। এবং সে ব্যক্তি যখন স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে সতর্ক থাকে এবং গায়ে পড়ে পরকেও সাবধান হতে উপদেশ দেয়, তখন শ্রোতা একটু বিচলিত না হয়ে পারে না। তা ছাড়া আত্মরক্ষা অতি আদিম প্রচেষ্টা। কাজেই রোগচিন্তায় মগ্ন মানুষকে নিয়ে আমরা যথেষ্ট ঠাট্টা-তামাসা করি বটে। কিন্তু তার কার্যকলাপগুলো সযত্নে ও কৌতূহলী চিত্তে অনুধাবন করে থাকি। মনে-মনে ভাবি, হবেও বা। এই মানুষটা অনেক ভেবেছে, পড়েছে ও দেখেছে।

তারপর ক্রমশ তার আচরণ আর রোগের প্রতিষেধক প্রক্রিয়াগুলি আমাদের তেমন আর বিস্মিত করে না। বরঞ্চ একটু একটু করে আমাদের জীবন ও চিন্তাকে সংক্রামিত করে। অতএব মৃত্যুভয় এর উৎপত্তি হলেও, রোগভয় জিনিসটার অর্থ বদলেছে এবং আসল চেহারাটাও বর্ণচোরা। স্বাস্থ্যরক্ষা, আত্মরক্ষা এবং পৌর কর্তব্য-দায়িত্বের অছিলায় রোগভয় সূক্ষ্মভাবে, বৈজ্ঞানিক পোষাক পরে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একটা স্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত না দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে না। আপনারা অকারণে সন্ত্রস্ত হবেন না। যুদ্ধোত্তর যুগে এমনিই তো মরে রয়েছি। আধপেটা খেয়ে, ভেজাল বস্তু গলাধঃকরণ করে, এক কামরায় ছ'জন শুয়ে বর্তমানে নাগরিক জীবন তো মূষিক-সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর সেই ঝিনঝিনিয়া থেকে সুরু করে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড এবং অবশেষে ছেলেধরা প্রভৃতি সত্য এবং মিথ্যা হুজুগে প্রাণ তো জেরবার হয়ে গেল। এ অবস্থায়, বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ আর দাঙ্গার পর থেকে আমরা যেভাবে বাস করছি এবং বঙ্গ-বিচ্ছেদের ফলে যে হারে জনসংখ্যার চাপ পড়েছে এ শহরের স্বাস্থ্যের ওপর, তাতে পরমাত্মা যদি এই কদর্য ও জীর্ণ পুরাতন খাঁচা ছেড়ে চলে যেতে চায়, তা হলে বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি, আধিভৌতিক দেহান্তে আমি যুক্ত ভারত রাষ্ট্র অথবা পাকিস্থান কোথাও থাকতে চাই না। সেখানে আছে ব্যাধি, আছে অর্থ নৈতিক জীবন-সমস্যার উৎকট সমাধান, আছে

পোলিটিক্যাল স্বর্গ-নরকের কল্লান্তব্যাপী বিরোধ। এ বিষয়ে আমার যদি কোনও স্বাধীনতা থাকে, তা হলে আমার প্রাণ-পক্ষী যেন অ্যালুশিয়ন দ্বীপমালায় অথবা দক্ষিণ মেরুর নিঃসঙ্গ তুষার-প্রান্তরে নব-আবিষ্কৃত নির্জন হ্রদের তীরে বিচরণ করে।

কিন্তু সে কথা থাক্। রোগ-সম্পর্কে বেশি কৌতূহল না থাকাই ভালো। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাধারণ রোগ আমাদের খুবই পরিচিত এবং এর মোটামুটি লক্ষণগুলো আমরা সবাই জানি। কিন্তু ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া কিংবা কোনও বড় রকমের অসুখ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানার্জন করবার স্পৃহা থাকলে মুশকিলে পড়তে হয় বৈ কি। ধরুন, আপনার জ্বর হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণাও শুরু হয়েছে। হঠাৎ মধ্য রাত্রে যদি সেই বেদনা ক্রমশ মুখের দিকে নেমে এসে আপনার চোয়াল আক্রমণ করে অর্থাৎ ব্যথায় হাঁ করতে না পারেন, তখন যদি আপনার জানা থাকে যে মেনিনজাইটিসের কয়েকটি লক্ষণের সঙ্গে আপনার উপসর্গগুলোর আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য আছে, তখন মনের অবস্থা কেমন হয়? লিভারের দোষে যদি কারুর ঘুসঘুসে জ্বর ও কাসি হয়, তাহলে অসুস্থ ব্যক্তি যদি ক্রমাগতই ফুসফুসের মারাত্মক ব্যাধি-চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে স্নায়ুর পীড়ায় শয্যাগ্রহণ করতে হবে।

এই কথাটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে বেশির ভাগ মানুষ রোগের নাম-ধাম না জেনে ভালোই থাকে। আর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ রোগী হলে নিজে ভেবে-ভেবে, ডাক্তারকে জেরা করে

অথবা পরোপকারী আত্মীয়-বন্ধুর পরামর্শে নিজের স্বাস্থ্য আরও নষ্ট করেন এবং আরও পাঁচজনকে উত্যক্ত করে তোলেন। একজন ভদ্রলোককে দেখেছি যাঁর রক্তচাপ অত্যধিক ছিল। কিন্তু তিনি মোটে রোগের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। অত্যাচারও করতেন না। স্নানাহার নিয়মিত করে ডাক্তারের উপদেশ মত চলতেন এবং তাতে তাঁর পরমায়ু দীর্ঘই হয়েছিল। অপর একজন ভদ্রলোক ছিলেন গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ঐ রোগ-সংক্রান্ত সমস্ত মেডিক্যাল লিটরেচার পড়ে ফেলে সপ্তাহে দুবার করে ডাক্তার বাড়ী ছুটতেন এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করাতেন। ফলে তিন মাসের মধ্যে এই রোগের যেটা স্বাভাবিক লক্ষণ এবং সব চেয়ে ক্ষতিকর উপসর্গ, অর্থাৎ মানসিক অশান্তির ফলে শয্যাশায়ী হলেন এবং মারা গেলেন।

দুটো চারটে উদাহরণ থেকে একটা সাধারণ মন্তব্যে পৌছানো যুক্তিসঙ্গত নয়, মানি। কিন্তু দেখে শুনে মনে হয় রোগ সম্পর্কে বেশী কৌতুহল অথবা পাণ্ডিত্য না থাকাই ভালো। রোগ বরাবরই আছে এবং থাকবেও। কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তাদের রূপ ও লক্ষণ ভালোভাবে জানা গেছে, তাদের নতুন নামকরণ হয়েছে এবং প্রতিষেধক চিকিৎসার ব্যবস্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এ সব চিন্তা বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের মাথাতেই থাকুক। আপনার আমার মাথা তাই নিয়ে যদি অযথা উত্তেজিত হতে থাকে, তা হলে পরমায়ু আপনি কমে আসবে। স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে, বিশেষ করে কয়েকটা সাধারণ ও সংক্রামক ব্যাধি

সম্পর্কে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান এবং পৌর দায়িত্ববোধ থাকা নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। যারা যত বেশি রোগচিন্তা করে, তারা তত অসুস্থ হয়ে পড়ে, এ কথাটা মিথ্যা নয়। আর যারা কম চিন্তাকাতর, তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ততই ভালো। আমার নিজস্ব ধারণা যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষক অধ্যাপক আইনজীবীর দলই রোগ সম্পর্কে অতি মাত্রায় সচেতন। যদি সকলের আন্তরিক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে নিউরটিক বা হাইপোকণ্ড্রিয়াকের সংখ্যা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী। রোগ, রোগের লক্ষণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে এঁদের চিন্তা এবং কল্পনা বহুদূরপ্রসারী। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞাপন থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের নবতম মন্তব্য এদের জানা আছে। ফলে এঁদের চিকিৎসা করা মুশকিল।

আর একটি কথা। পরোপকারী পরামর্শদাতা তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। এক ধরণের লোক আছেন যাঁদের ভয় দেখিয়েই আনন্দ। আপনি হয়তো স্নান করেননি, সারাদিন কাজকর্মে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছেন। রাস্তায় দেখা হল এই ধরণের আপনার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি আপনাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন, "কি হয়েছে? শরীরটা যে ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুমি মোটেই যত্ন নিচ্ছ না স্বাস্থ্যের·········স্বাস্থ্যকে অত অবহেলা করলে একদিন ঠকতে হবে আমার ভগ্নীপতির মতন······অত

পয়সার চিন্তায় ব্যস্ত থাকলে শরীর কি টেঁকে, বাবা? আর এই সময়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে সারা শহর কি ঘুরে বেড়ানো উচিত! গ্যাম্‌-বুট না হয় নাই পরলে। কিন্তু মোজা-পাৎলুন থাকলে অনেকটা নিরাপদ। আজকাল শুধু বিউবনিক নয়, নিউমনিক এবং সেপ্টিসিমিক! ক্লান্ত শরীরে আক্রমণটাও আকস্মিক। না, না ভয় পেয়ো না। তবে অতটা বেপরোয়া ঘুরে বেড়িয়ে দেহকে জখম কোরো না। কি জানো—যেতে হবে সকলকেই ······কিন্তু অসময়ে বেঘোরে যাওয়াটা কি ভালো······?”

জগতে রোগভয় আর মৃত্যুভয় যেমন আছে, তার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাও তেমনি আছে। অর্থাৎ একদিকে ইনোক্যুলেশন আর বীজাণুনাশক লোশ্যনের ব্যবহার, অপরদিকে হতাশ্বাস এবং ভয়-প্রবণ ব্যক্তিকে হিতৈষী আত্মীয়-প্রতিবেশীর অভয়-প্রলেপ। ওষুধে আর প্রতিষেধক সাবধানতায় যে ফল পাওয়া যায়, তার সমর্থন পাওয়া যায় আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণায় এবং আবিষ্কারে। আর শুভার্থী স্বজন-বান্ধবের অযাচিত হিতোপদেশ কতখানি কার্য্যকরী হয়, তার হিসাব-নিকাশ করতে গেলে হয়তো দেখা যাবে – শুভের চেয়ে অশুভই ঘটে বেশী।

কিন্তু তবু আমরা পরের কাজে অথবা কথায় কথা না বলে থাকতে পারি না। ওটা অধিকাংশ মানুষেরই মজ্জাগত স্বভাব। আমাদের অবচেতন মনে নিঃস্বার্থ পরোপকারের স্পৃহা সুপ্ত হয়ে আছে। সময় ও সুযোগ পেলেই সেই পরোপকারের প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি, এগিয়ে যাই কাজে সাহায্য করতে, নিদেন পক্ষে মূল্যব্যন্ উপদেশ দিতে। যিনি দুশ্চিন্তায় পীড়িত, ভয়কাতর অথবা বিপদ্‌গ্রস্ত, তিনি কি আর মুখ ফুটে সাহায্য প্রার্থনা করবেন? তাই আমাদের মাথা ব্যথা স্বাভাবিক। প্রশ্ন করে খুঁচিয়ে বার করি গলদটা কোথায়।

তারপর তার সবিস্তার আলোচনায় নিজস্ব মতামত প্রকাশ করি। হয়তো বাস্তবিক সাহায্য করি, নয় তো পরামর্শ দিই। তাতে কাজ হোক্ বা না হোক্—প্রতিবেশিত্ব অথবা আত্মীয়তার দাবি তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মনে করুন, আপনার মেয়ের বিয়ে—যে মেয়েটি কালো এবং স্বাস্থ্যহীন বলে এতদিন ধরে বিয়ে হচ্ছিল না। হয়তো বা বিয়ের কথায় আশ-পাশের বাড়ী থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাংচি দেওয়া হয়েছিল এবং কোনও সম্বন্ধ পাকবার আগেই ভেঙ্গে যাচ্ছিল। শুধু মেয়ে অপছন্দ বলে নয়—অন্য কোনও কারণে, যেটা পাত্রপক্ষ পরিষ্কার জানিয়ে দেন না। শুধু একটি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন — ঠিকুজির মিল হল না। ঐ এক কথাতেই কাজ উদ্ধার হয়ে যায়। এ সম্বন্ধ প্রথমতঃ ঝুলিয়ে রেখে ও ভেঙ্গে দিয়ে অতঃপর শাঁসালো এবং বেশি পাওনার আশাযুক্ত অন্য কোনও পক্ষ অবলম্বন করা চলে। মনে মনে হয়তো আপনার ঘনায়মান সন্দেহ যে, পট্‌লা ভটচাজই এ কাজ করেছে এবং বেনামী উড়ো চিঠি দিয়ে পাত্র-পক্ষকে ভাগিয়েছে। তবু মেয়ের বিয়ে যখন স্থির হল, তখন তাকে নিমন্ত্রণ করতে হয় এবং পটলার পরোপকারব্রত এমনি শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ যে বিয়ের রাত্রে বুক দিয়ে পড়ে কাজ আপনার উদ্ধার করে দেয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শীর ভিতর এমন অনেক লোক পাবেন, যাঁরা আপনার আমন্ত্রণের অপেক্ষা করেন না। অনর্গল বাক্য আর মনভোলানো টিপ্পনীতে আপনার হৃদয়-পথের উন্মুক্ত দরজার ভিতর দিয়ে মিষ্টি অথবা মাছের ভাঁড়ারের দরজায়

গিয়ে উপস্থিত হন এবং চাবিটি পর্য্যন্ত হস্তগত করেন। এই সব মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হল এই যে, আড়ালে তাঁরা যাই ভাবুন না কেন আপনার সম্বন্ধে, সম্মুখে তাঁরাই আপনার প্রকৃত হিতৈষী।

কিন্তু ধূর্ত পল্লীসমাজী লোকেদের কথা বাদ দিলেও আর এক ধরণের মানুষ আপনারা দেখতে পাবেন মধ্যে মধ্যে, যাঁরা স্বার্থের হানি করেও অপরের মঙ্গল কামনা করেন—এমন কি, গাঁটের পয়সা খরচ করে অন্য লোকের সত্য অথবা কাল্পনিক দুঃখমোচনে অগ্রসর হন। এঁরা ঠকেন হরদম। কিন্তু প্রতারিত হয়েও আবার পরহিত সাধনে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। এঁরাই হলেন বিশুদ্ধ 'আলট্রুয়িষ্ট।' মানুষকে চট করে খারাপ ভাবতে কিম্বা অবিশ্বাস করতে এঁরা পারেন না। তারপর পরের ভাল করতে গিয়ে যখন সত্যিই বিপদে পড়েন কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তখন সেই অন্যায় দুর্দৈব এবং মানুষের অকৃতজ্ঞতা নিয়ে অনুশোচনা করেন মাত্র। সত্যিকারের শিক্ষা ও চৈতন্যোদয় এঁদের হয় না।

এমনি এক ভদ্রলোককে জানি—যিনি আজও অদম্য উৎসাহে পরোপকার করে চলেছেন। কাছে পয়সা না থাকলে ধার করে তৃতীয় পক্ষের ঘরে প্রার্থিত অর্থ পৌঁছে দেন। যত অসম্ভব পরিকল্পনা, যত উগ্র অতিরঞ্জিত মিথ্যা, ততই তিনি মুগ্ধ। যত সূক্ষ্ম এবং মারাত্মক চাটুকারিতা, ততই তিনি বিগলিত। অথচ শিক্ষিত এবং সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। হিতৈষী যদি সাবধান করে দেন তাঁকে, তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন। একবার জাহাজ

ভাড়া করে তিনি রেঙ্গুনে ঠকতে গিয়েছিলেন এক পুরানো বন্ধুর কাছে। বলেছিলুম, 'জমি বিক্রীর ব্যবসা একটি প্রকাণ্ড ভাঁওতা। মাঝখান থেকে শুধু শুধু অনেক পয়সা বরবাদ হয়ে যাবে।' তিনি তো কথা শুনলেনই না। যে-টাকা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো নষ্ট করে এলেন। অপর এক ব্যক্তিকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে আরও কিছু টাকা দিইয়ে দিলেন এবং পরিশেষে তৃতীয় এক দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়ের কাছে টাকা ধার করে কলকাতায় ফিরে এলেন। মনে মনে বুঝেছিলেন সব ব্যাপারটা। তারপর যখন হাতে-নাতে এবং আদালতে প্রমাণ হয়ে গেল পুরান বন্ধুটি এক ঝাণু ব্যবসাদার, বহু লোককেই ফাঁসিয়েছে, তখন তিনি শুধু মন্তব্য করলেন, 'আমারও কিছু গেছে। তবে মানুষটা খারাপ নয়। বিদেশে ব্যবসা পেতেছে, টাকার অভাবেই তার স্বভাব নষ্ট হয়েছে। অবশ্য, অবস্থা ভাল হলেই আমাকে সব ফেরত দেবে বলেছে।'

এই ভদ্রলোকের স্বভাবের মজা হল এই যে, কোন খারাপ জিনিষ কিম্বা কোন মন্দ মানুষকে সমর্থন করা। এটা অবিশ্যি মনস্তত্ত্বের এলাকায় পড়ে। কিন্তু কয়েকটা ব্যাপারে তিনি এখনও অপরিণত রয়ে গেছেন। বাস্তবকে দেখেন ও জানেন, কিছু যে বোঝেন না, তাও নয়। তবু সেই বাস্তবকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে নিজস্ব মতামত এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি নারাজ। আপনারা হয়তো বলবেন, এ ধরণের মানুষ হল নির্বোধ আদর্শবাদী। এঁরা শুধু প্রতারিতই হন না, প্রতারিত

হওয়ার মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। সাহিত্যে এই টাইপের চরিত্র অনেক পাওয়া যাবে। কথাটা হয়তো ঠিক। তবু এদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আসে। জীবনেই বলুন, আর সাহিত্যের মারফতই বলুন, যখনই আমরা একটি সরল বিশ্বাসী আদর্শনিষ্ঠ মানুষের সাক্ষাৎ পাই, তখনই তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারিনে। কোথায় যেন একটা আন্তরিক মমত্ববোধ সঞ্চিত হতে থাকে। তার বঞ্চনায় আর লাঞ্ছনায় একটু ব্যথিত হই। বাস্তব তথ্যের কাছে আদর্শের পরাজয়ে ভাবি মনুষ্যত্বেরই অবমাননা।

এটা হল এক ধরণের পরার্থপরতা। এই সব মানুষ খুব কমই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। পরোপকার এদের স্বধর্ম, মনের মুখোস নয়। আর এক ধরণের মানুষ আছে—যারা ধূর্ত প্রবঞ্চক নয়, আবার আদর্শ ব্যতিকগ্রস্তও নয়। তারা এ দুয়ের মাঝামাঝি—মার্ট্যর।

'মার্ট্যরডম্' কথাটির যথার্থ বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু মানব-চরিত্রের এই প্রবৃত্তি অথবা প্রকাশটুকু সার্বজনীন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই ভাবটি আছে, সচেতন অথবা সুপ্ত অবস্থায়। আত্মোৎসর্গ অথবা আপনার মানসিক ও শারীরিক ক্লেশদুঃখ বরণ করে অপরের প্রীতিসাধন করার মধ্যে যে বিশেষ ধরণের আনন্দ, গৌরব এবং আত্মপ্রসাদ আছে, সেটা সকলেই জানেন। মনস্তাত্ত্বিকরা বলবেন—ওটা অবদমিত আত্ম-পীড়ন-প্রবৃত্তির নিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সে যাই হোক্, এই মানসের বিকাশ অনেক চরিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই। যে মানুষ সমাজে আপনার প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা পেল না, পরিবারে যার মর্যাদা কম, সংসার যাকে আমল দেয় না, তার মধ্যে আত্মদানের স্বাভাবিক ঝুঁকতিটা বেশি। যাকে নিয়ে আমরা বিদ্রূপ করি, যাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিই না, বরঞ্চ অনাদর করি, সে যে কাল-ক্রমে মার্ট্যর হয়ে উঠবে—এটা বিচিত্র নয়। সে যখন দেখে পৃথিবী বড় শক্ত জায়গা, বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা—যে দৃঢ়তা তার স্বভাবে নেই, তখন কোনঠাসা হয়ে সে একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করে। সেটা হল আত্মদুঃখের, আত্মপীড়নের। মনটা তখন সেই বিশিষ্ট

কোণ থেকে জগৎকে বিচার ও গ্রহণ করতে শেখে, আপনার কার্য্যকলাপ সেই অনুসারে পরিচালিত করে থাকে।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের ইতিহাস-বিশ্রুত যে সব মহামানব আত্মোৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের মনোভাব কি ছিল, তার বিচার-ক্ষেত্র এটা নয়। কোন্ নিরুদ্ধ মনের গতিবশে তাঁরা এই পথ অবলম্বন করেছিলেন, তার আলোচনা করবেন মনস্তত্ত্ববিদ্। তবে মানবপ্রীতি অসাধারণ না হলে আন্তরিক মানবপ্রেমিক এবং মার্ট্যার হওয়া যায় না। আর একটি কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন সক্রেটিস্, যীশু কিংবা মহাত্মাজী, মার্ট্যার হয়েছেন মৃত্যুর পরে। তাঁদের চরিত্রে যে দৃঢ়তা, অটল সত্যনিষ্ঠা এবং প্রচণ্ড জিদ, তারই ফলে আদর্শ-চ্যুতি তাঁদের স্বপ্নেরও অগম্য। সেই আদর্শনিষ্ঠার জন্যেই তাঁরা মৃত্যু বরণ করেছেন। কেউ কেউ বা জীবিত থেকেই মানব-প্রেমিক আখ্যা পেয়েছেন, পৃথিবীর সঙ্গে বিরোধ ঘটেনি বলেই তাঁদের মৃত্যুদণ্ড জোটেনি। কিন্তু সারা জীবন ধরে অজস্রভাবে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন পরহিত-সাধনায়। এঁরা 'ক্যাননাইজ্ড' হয়েছেন জীবদ্দশায়।

কিন্তু ধর্ম ও সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনায় যাঁদের দেহদান করতে হয়েছে, তাঁদের কথা আমার আলোচ্য নয়। যে সব সাধারণ মানুষ নিয়ে আমরা বাস করি, ঘরকন্না করি, আত্মীয়-সম্পর্কে জড়িত থাকি, তাদের কথাই বলছি। এদের মধ্যে অনেকেরই চরিত্রে এই আত্মদানের সুর পরিস্ফুট অথবা অর্দ্ধ-পরিস্ফুট অবস্থায় রয়েছে। নিজেকে পীড়িত করে অপরের সুখ

বিধান করার মধ্যে দুটি দিক আছে—একটি সাঁচ্চা আর একটি ঝুটা। কখনো কখনো কোনও চরিত্রে এ দুয়ের সংমিশ্রণ ঘটে থাকে।

আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে কতকগুলি প্রবৃত্তির বিকাশ অথবা বিবর্ত্তন একান্তভাবেই পরিবেশ-নির্ভর। যে মানুষ যে পরিবেশে বাস করে, যে গণ্ডীর মধ্যে তার দৃষ্টি আবদ্ধ, সংসারের কাছে যে ব্যবহার সে পেয়ে থাকে, সে অনেকটা সেই মতই গড়ে ওঠে। কাজেই, কারুর বেলায় আলট্রুয়িজম খাঁটি জিনিষ, কারুর ক্ষেত্রে 'পোজ'-বিশেষ। কারুর চরিত্রে বিশুদ্ধ মার্ট্যিরডমের সম্ভাবনা, কারুর বা কৃত্রিম ভঙ্গিমা। তা ছাড়া, একই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সত্তার প্রকাশ হতে পারে, পুরুষোচিত এবং স্ত্রীজনোচিত প্রবৃত্তির মিশ্রণ অথবা স্ফুরণ হতে পারে।

কোনও কোনও পুরুষ আছেন, যাঁরা নিজের বলতে কিছুই চান না, রাখেন না, দাবী করেন না, অপরকে দিয়েই তাঁদের তৃপ্তি ও শান্তি। নিজে জীর্ণ ও মলিন বেশে থাকেন, নিজের ঘর অপরিষ্কার। নিজস্ব অর্থ নেই বললেই চলে—হয়তো ভবিষ্যতের সংস্থান করতেও নারাজ। যে পোষাকটা পরিত্যক্ত এবং অব্যবহার্য্য সেইটেই তিনি তুলে নেন। যে আহার্যটা মন্দ এবং অখাদ্য, সেইটে তিনি তৃপ্তিসহকারে ভোজন করেন। যে ঘরটা সবচেয়ে অসংস্কৃত এবং অস্বাস্থ্যকর, সেই ঘরে বাস করেই তাঁর আনন্দ। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের যে উপকরণগুলো নইলে মানুষের জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে উঠে, সেগুলোর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই।

ফরসা এবং ভালো জামা-কাপড় কেউ দিলে হয় তিনি দিয়ে দেন, নয়তো তুলে রাখেন। আর এইসব কাজ করে তিনি মনে মনে তৃপ্ত ও গর্বিত। চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতার জন্যে তিনি তাঁর ন্যায্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকেন। হোটেল বা দোকানের বিল্ অনেক সময়ে তাঁরই ঘাড়ে চাপানো হয়ে থাকে। 'পারবো না, দেবো না, এ কী অন্যায়!' বলেন অথচ প্রতিবারই সে পাওনা শোধ করেন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, একটু আধটু খোসা-মোদ করে পরস্মৈপদী মানুষ তাঁকে শোষণ করেন। তিনি জানেন ও বোঝেন। কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ বা অস্বীকার করবার মতন তাঁর মনের জোর নেই। আবার জগতের নিমক্হারামির সম্বন্ধে অনুযোগ অভিযোগ করে থাকেন। এই সব মানুষের ক্ষতির অঙ্কটাই আমরা দেখতে ও শুনতে পাই, কেন না লোকসান দিয়ে তিনি দুঃখ করেন, লোকের কাছে সহানুভূতি প্রত্যাশা করেন। এমন মানুষও আছেন যাঁর বিয়ের ইচ্ছা ষোল আনা, সংসারধর্মেও স্বাভাবিক আসক্তি ও নৈপুণ্য আছে। অথচ সংসারী হতে পারলেন না পরাশ্রয়ী আত্মীয় প্রতিপালনের চাপে। মুখে বলেন —সংসার বড় খারাপ জিনিষ। ও পথ মাড়ানো উচিত নয়। অথচ কেউ যদি তাঁকে সংসারী ও স্থিতিশীল করে দেয়, তিনি যে অখুশী হবেন, তা মনে হয় না। আসলে ইনি দুর্বল এবং নিজে থেকে জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্বৈত-আশ্রম প্রতিষ্ঠায় অপারগ।

মহিলাদের মধ্যেও এমন 'টাইপ' পাওয়া যাবে। সত্যি কথা

বলতে গেলে, মহিলাদের মধ্যে এমন ধরণের মার্ট্যরের সংখ্যাই বেশি। কারণটা অবশ্য স্বাভাবিক। সংসারের যে পরিবেশে তাঁরা বাস করেন, যে নিপীড়ন চলে থাকে তাঁদের মনের ও দেহের ওপর, তাতে আত্মদানের প্রবৃত্তিটা শাণিত হয়ে ওঠে। তবে বেশি মাত্রায় অর্থাৎ বাড়াবাড়ি হলে, তাঁদের নিয়ে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সব মহিলাদের মন খারাপ হল ক্রনিক ব্যাধি। বিবর্ণ মুখ আর মলিন বেশে সারাদিন পরিশ্রম করে অপরের তৃপ্তি-বিধান করা আর আপনাকে সর্বসুখে বঞ্চিত করে রাখাই যেন তাঁদের স্বধর্ম। নিতান্তই প্রাণধারণের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকুই তাঁরা আহার করেন। ভালো-মন্দ জিনিষ স্বামী-পুত্রের পাতে তুলে তো দেনই, এমন কি জা-ননদের জন্যে সরিয়ে রাখেন। হয়তো তিনিই সংসারের কর্ত্রী, ভাঁড়ারের চাবি তাঁরই হাতে। কিন্তু তাঁর আসন-বসন, আহার-নিদ্রা পরিচারিকার মতন। গোপন ঈর্ষ্যায় অথবা স্বার্থপরতায় এঁদের মেজাজ স্বভাবতই তিক্ত হয়ে থাকে। একটুতেই ফেটে পড়েন, নয়ত ছুতো-নাতায় অপর পক্ষকে আপনার আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তগুলিকে উজ্জ্বল ভাষায় শুনিয়ে দেন। "আমার কিছুই চাই না ...." এইটেই হল তাঁদের মুখের বুলি। অথচ ভোগের স্পৃহা যে এঁরা জয় করেছেন, তা নয়। দগ্ধ ললাট নিয়ে দুঃখও করেন।

এই ধরণের পরার্থপরতা, বিজ্ঞাপিত আত্মদানের দৃষ্টান্ত অনেকেই দেখেছেন। এটা ঠিক্ মনোবিকার না হলেও এক বিশেষ রকমের মানসিক অবদমন। এ নিয়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার

দেওয়া চলে, বিধাতা কিংবা সংসারের অবিচার নিয়ে অভিযোগ করা চলে কিংবা সাহিত্যের খোরাক হওয়া যায়। কিন্তু স্বেচ্ছায় যাঁরা দুঃখদহে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁদের অবুঝ আত্ম-প্রীতির সঙ্গে নিত্য সংস্পর্শে থাকা সত্যই এক কঠিন পরীক্ষা।

বেশীর ভাগ সময়ে আমরা পরের জন্যে যেটুকু স্বার্থ ছেড়ে দিই, সেটার যথাযথ অথবা অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন জাহির করতে আমরা কসুর করি না। কখনো করি ইঙ্গিতে, বেশি বাক্যব্যয় না করে। কখনো করি অপরকে ধরে, কথা শুনিয়ে জ্বালা নিবারণ করি। এ বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ঘটে যখন মানুষ মনে করে তার কৃতকর্মের অনুরূপ বা যোগ্য প্রতিদান মিলছে না। আপনারা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, অনেক বাড়িতে প্রৌঢ়া কিংবা বর্ষীয়সী মহিলারা বেশী কথা বলেন এবং আপনাদের গুণপনা জাহির করেন। অতিকথন দোষের ফলে আত্মকথন এসে যেতে বাধ্য। তখন হয়ত ভ্যানর ভ্যানর কথা শুনতে ভালো লাগে না, বিরক্ত হয়ে উঠি। কথায় কথায় যদি কেউ শাসায়, 'আগে চোখ বুজি, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল,' তখন এ কথা আপনার মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আগে চোখ বুজেই দেখো কি হয়। তারপর দেখা যাবে ধান থেকে চাল বের করা যায় কি না। পৃথিবীতে সব কিছুই আবশ্যক, অত্যা-বশ্যক নয়।

কিন্তু গৃহিণীদের এই ধরণের মনোভাব একেবারে অন্যায্য বা অসঙ্গত নয়। তাঁরা যে পরিশ্রম করেন, অসঙ্কোচে আপনাদের

টুথব্রাশ নিয়ে হাতে তুলে দেন। তারপর আহারাদি পরিবেশন সেরে ওপরে ছোটেন পোষাক, জুতো, পার্স বার করে দিতে। যদি ট্রামের টিকিট দিতে ভুল হয়ে যায় গোলমালের মধ্যে, তা হলে অপরাধ তাঁরই। যদি পার্সে খুচরো পয়সা না থাকে, তা হলেও দোষ গৃহিণীর। যেহেতু আগে থাকতে ভেবে দরকার মত রেজকি তিনি ভাঙ্গিয়ে রাখেন নি কেন! যদি ট্যাঙ্কে জল কম থাকে, তাহলে পাম্প না চালানোর জন্যে দায়িত্ব স্ত্রীর। আর কল যদি খারাপ হয়ে যায়, মিস্ত্রি ডেকে মেরামত করানোর ভারও সেই গৃহিণীর। চা তিনি নিজে কখনও ঢেলে নেননি। কাজেই কর্মব্যস্ত স্ত্রী যদি একটু বিলম্বে চা দেন, তা হলে যথেষ্ট পরিমাণ গরম চা না পাওয়ার ফলে উপার্জনশীল অফিস-ফেরৎ স্বামীর মেজাজ তপ্ত হয়ে উঠে। ভাত খেতে বসে টেবিলে হাত ধোবার জল আর খাবার জল যদি উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়, তাহলে তাঁর খাওয়া হয় না। তিনি উঠে যান। বামুন কিম্বা চাকর যদি কোনও কারণে চলে যায়, দোষ স্ত্রীর। কেননা, যথাসময়ে তাঁর অভ্যাস-মত জিনিষগুলি হাতে হাতে জুগিয়ে দেওয়ার ভার তাঁর গৃহিণীর। অধিকন্তু বাজার আর রন্ধনের দায়িত্বও তাঁর। এঁর কাল্পনিক কর্মপটুতা অশেষ। অথচ এক-পা নড়তে গেলে তাঁকে পঞ্চাশ-বার ভাবতে হয়। যদি দরকারী কোনও কাজ থাকে যার জন্যে বাইরে বেরুনো প্রয়োজন, তখন তিনি বাইরে বেরুতে চান না এবং পারেন না। কিন্তু স্ত্রী যে কেন তাঁকে তাড়াতাড়ি সাহায্য করে বাইরে বার করে দেননি, তার জন্যে অপরাধ স্ত্রীরই।

স্ত্রী সামনে আড়ালে গজর-গজর করেন, আক্ষেপ করেন। কিন্তু আমি যখনই এই সব দেখি ও শুনি, তখনই ভাবি--—য্যায়সা কে ত্যায়সা। সমস্ত কিছু করে দিয়ে তিনি স্বামীকে এমন নাড়ুগোপাল করে তুলেছেন যে এখন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে আর কি হবে?

এক একজন মানুষ থাকে যারা চিরটা কাল পরের কাজেই ব্যস্ত থাকে, নিজের কাজ করে ওঠবার সময় পায় না। শুভার্থী আত্মীয়ের দল অনুযোগ করেন, কাজ-হারানো লোক। পরের বেগার খেটেই জীবন শেষ হল, নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার ফুরসৎ মিলল না। কার এগজামিন, কারুর মেয়ের বিয়ে, কারুর ছেলের অসুখ, কার শ্যালীকে শ্বশুরবাড়ী থেকে এনে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে, চার মাইল হেঁটে কারুর জন্যে বা জাগ্রত দেবতার মানতী পূজার ফুল এনে দিতে হবে, চিত্রকূটের হাঁপানীর ওষুধ জোগাড় করে আনা দরকার, পূজোর বাজার করবার লোক নেই ইত্যাদি নানা কাজ ও অকাজের ভার এই জাতীয় মানুষের উপর অনেক সময় চাপানো হয়। চক্ষুলজ্জাই বলুন আর স্বাভাবিক ভদ্রতা বা উদারতাই বলুন, সে ভদ্রলোক মুখের ওপর 'না' বলতে পারে না। ব্যক্তিগত সুখসুবিধার কথা না ভেবে, অনেক সময় রীতিমত দুর্ভোগ সহ্য করে এবং দরকার হলে গাঁটের পয়সা খরচ করে তাকে পরের বেগার দিতে হয়। এইতেই তার জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কখনো আনন্দ ও প্রশংসা, কখনো বা দুঃখ এবং নিন্দা জোটে অদৃষ্টে। কিন্তু পরের কাজ না করেও উপায় নেই। সংসার ও সমাজ যাকে

চিনে নিয়েছে, চিনির বলদ বলে নামাঙ্কিত করেছে, তার আর রেহাই নেই।

নিকট পরিবেশে অনেকেই এই ধরণের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন ও তার কার্যকলাপ অনুধাবন করেছেন। যাঁরা হিতাকাঙ্খী, তাঁরা ব্যথিত হন কর্মভোগের দৃষ্টান্ত দেখে। হয়তো একটু যত্ন সহানুভূতি দেখান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যারা সবচেয়ে এই জাতীয় মানুষকে খাটিয়ে নেয়, তারাই আসলে জ্ঞানপাপী। হয়তো সারা দুপুর রোদ্দুরে টো টো করে ঘুরে এল মানুষটা, একটু জিরোতে না জিরোতেই তাকে আবার ফরমায়েস করা হল, অমুক জায়গায় গিয়ে অমুক জিনিসটা এনে দিতে পারবে? হয়তো ভদ্রভাবে কথা বলাই হয় না, অনেকটা আদেশের সুরেই অনুরোধ জানানো হয়। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা এই, মেয়েরাই এই জাতীয় পুরুষকে খাটিয়ে নেন বেশি। একে তো তাঁরা নিজেরাই পরনির্ভর। ট্রামে-বাসে ঘুরে নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিতে পারেন না। তার ওপর সংসারের পিছুটান আছে, আছে সহরের বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা। এক বাড়ির গৃহিণী এমনি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়ে নিতেন। কিছু বললে তিনি বলতেন, 'ওর আর কাজ কি? অকর্মা লোক, পরের কাজ করেই ওর সময় কাটে।' তাঁর স্বামী একদিন বললেন, 'তুমি যে ওকে চেতলার বাজার থেকে মশারির থান কিনে আনতে বললে, যাতায়াতের ট্রাম-ভাড়া ও জলখাবারের পয়সা দিয়েছ

আলাদা করে ?' গৃহিণী অম্লান বদনে বললেন, "টাকা তো দিয়েছি, ঐতেই কুলিয়ে যাবে।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুলোয় না। দৃষ্টিকৃপণ মানুষ, হিসেব করে এমন পয়সা দেন যাতে এক আধ্‌লা উদ্বৃত্ত হওয়া কঠিন। জল-খাবার তো দূরের কথা। ট্রামের পয়সা হয় তো নিজেকেই দিতে হয় গাঁট থেকে। বাজার খরচ বাবদ দেওয়া হল হয়তো পাঁচ টাকা। কিন্তু যে জিনিষগুলি খরিদ করতে বলা হল, তাদের তালিকা এত দীর্ঘ যে, দশ টাকায় কুলোয় কি না সন্দেহ। তার উপর জিনিষগুলো মনঃপূত এবং যথেষ্ট পরিমাণে সস্তা ও প্রচুর না হলে গৃহকর্ত্রীর মন ওঠে না। তিনি বলেন কিংবা ভাবেন, লোকটা একেবারে ওয়ার্থলেস্। কিন্তু এই শহরের ধূলো আর ভিড়, রোদ্দুর আর বৃষ্টিতে কষ্ট পেয়ে মানুষটা যে এত ঘোরাঘুরি করে মনোরঞ্জনের জন্য এতটা যত্ন ও পরিশ্রম করল, তার বদলে সে পেল কি ? হিসেব দেবার সময়ে হয়তো ভ্রূকুটি, নয়তো স্পষ্ট অসন্তোষ।

বাঙালী ঘরের গৃহিণীদের নিন্দা করতে বসিনি। তবু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের অধিকাংশই, বিশেষ করে মাঝারি ঘরের অর্ধশিক্ষিতস্ত্রএবং বাজারের হালচাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ গৃহিণীরা একটু অবুঝ এবং স্বার্থপর হয়ে থাকেন। পাড়ার বোসেদের গিন্নি হয়তো বললেন, বেলগেছের বাজারে সব্‌জি বড় সস্তা। কিংবা পাশের বাড়ির বৌটির স্বামী অফিস-ফেরৎ বৈঠকখানা থেকে অল্পদামে মাছটা তরি-তরকারিটা কিনে

নিয়ে আসেন, এ কথা তাঁর কানে এল। ব্যস্, রক্ষে নেই। হয় স্বামী, নয় দেওর, নয় ছেলেকে কথা শুনতে হবে—সবাই নিষ্কর্মা। তিনি সংসারের জন্য সারাটা-দিন বিশ্রাম করেন না, উঞ্ছবৃত্তি করে মরেন। কিন্তু বাড়ির বাবুরা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান, কুটোটি নেড়ে উপকার করতে পারেন না। আবার জম্বি! এটা নেই, ওটা হল না বলে বিরক্তি প্রকাশ করেন। অগত্যা অন্য লোক ধরতে হয় সস্তায় বাজার করার জন্যে।

সে ব্যক্তি যদি আবার আশ্রিত হয়, অথবা আর্দালী, সরকারী পিয়ন, মুহুরী বা সরকার জাতীয় মানুষ হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সে যখন স্বামীর তাঁবেদার, তাঁর অনুগ্রহে চাকরী করে খায়, তখন বাড়ির বাড়তি কাজ বিনা অনুযোগে তারই ঘাড়ে চাপানো চলে। উপরন্তু এখানে ওখানে নানা জায়গায় ফরমায়েসি জিনিস খুঁজে বেড়ানোর জন্যে তাকে অনায়াসে অফিস-ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া যায়। যাঁদের স্বামী সরকারী চাকুরে, বিশেষ করে উঁচু মাইনের, তাঁদের গৃহিণীরা একটু অবুঝই হয়ে থাকেন। নিত্য সেলাম আর মেমসাহেব শুনে শুনে তাঁদের ধারণা জন্মে যায় যে, তাদের সন্তুষ্টি-সাধনের জন্যেই কম-মাইনের চাকুরেশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যাদের এইভাবে খাটিয়ে নেওয়া হয়, তাদের ব্যক্তিত্ব নেই বললেই হয়। সংসারে আর সমাজে তারা নির্যাতিত, অতএব কিছুতেই বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ তারা করতে জানে না। নীরবে উচ্চতন কর্মচারী আর তাঁদের গৃহিণীর মনস্তুষ্টি-বিধানে সমস্ত অবসর আর নিজস্ব কাজ-কর্ম ছেড়ে সমস্ত

চেষ্টাটুকু ঐদিকে নিয়োগ করে থাকে। দুনিয়া শক্তের ঠাঁই। অশক্ত লোক পিছিয়ে থাকে। মাথা নীচু করে ঘানি টানে। হয়তো একটা মিষ্টি মুখের কথা, তাইতেই কৃতার্থ হয়ে যায়। অনেক সময়ে তাও মেলে না—যেমন মেলে না বৃদ্ধ সরকারের ভাগ্যে রুটির সঙ্গে একটু মাখন কিংবা চায়ের সঙ্গে চিনি। পরোপকারব্রতী মানুষরা তাই প্রতিদানের আশা না রেখেই বাজার করে বেড়ান, অপরের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ থেকে বিয়ের হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ পোহান, ভাগ্নীর বান্ধবীর শপিং করে দেন কিংবা বৌদির মাস্‌তুতো বোনের জন্য পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নমালা জোগাড় করে বেড়ান—এইতেই তাঁদের জীবনের সার্থকতা ও তৃপ্তি।

তৃতীয় পালা

দেড় হাজার মাইল দূরে এসে এই যে নীরব, পরিচ্ছন্ন সরকারী বাগানের একটি মনোরম স্থানে বসে আছি এবং আপনার মনের নিশ্চিন্ত আলস্যে, কিছুই-না-করার শীতল-কোমল আরামে সঞ্জীবিত হচ্ছি, এর প্রয়োজন ছিল। দিনের পর দিন একই কাজ, একই মুখ, একই আবেষ্টনী—তা সে যতই অর্থকরী এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত নিদ্রাকাতর মস্তিষ্কে ঘড়ির নির্ভুল ও নিয়মিত শব্দের মতই বিরক্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক এবং মারাত্মক হয়ে ওঠে। জাগ্রত মন, উন্মুখ হৃদয়, উন্মীলিত দৃষ্টি, আশা, বিস্ময় এবং আদর্শ নিয়ে মানুষ জীবনের যাত্রা সুরু করে। আপনিও করেছিলেন, আমিও করেছিলুম। কিন্তু দশ-বিশ বছর বাদে আজ আপনার-আমার অবস্থা এমন শোচনীয় দাঁড়িয়েছে কেন? মন এত নির্জীব, দেহ অবসন্ন আর হৃদয় এত নীরস হয়ে উঠল কেন? এই অতি-সহজ ও সাধারণ মনোবিপর্যয়ের কারণ-সন্ধানে বলা যায়—প্রথমতঃ মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার যুদ্ধ, তৃতীয়তঃ অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং সর্বশেষে যান্ত্রিক জীবনের গতানুগতিকতায়, জীবিকা-সন্ধানের গ্লানিময় বৈচিত্র্যহীনতায়, মনের যাবতীয় সরসতা, সুকুমার বোধশক্তির বিলোপ ঘটেছে।

বৈচিত্র্য-সন্ধানী বিচিত্র এই মানুষের মন। সেই মনের তাগিদে মানুষ জীবিকার অদল-বদল করে, স্থান-পরিবর্তন করে, নিজের দেহ ও প্রাণকে শুধ্‌রে নেয়, আবার কখনও মদ খায়, চরিত্র নষ্ট করে। একটি মনের অবচেতনে কত আকাঙ্ক্ষা নিরুদ্ধ হয়ে থাকে, কত অপূর্ণ বাসনা সুপ্ত হয়ে আছে। কাজের আর রুটিনের বিলম্বিত বিষপ্রয়োগে আমাদের চৈতন্য আচ্ছন্ন থাকে। কোনও এক দৈব মুহূর্তে বৈরাগ্য, বিদ্রোহের ঐশ্বরিক আভাস ঘনিয়ে ওঠে। তখন হঠাৎ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে, বাঁধা সড়কের ক্লান্তিকর সুনিয়মিত পদক্ষেপ সরিয়ে নিয়ে বিপদ্ অনিশ্চয়তাকে বরণ করে। স্বাভাবিক জীবনের পরিচিত ছন্দ যায় কেটে। নূতন চরণে নূতন পদবিন্যাস, দুঃসাহসিক পরীক্ষায় নূতন সুর সংযোজনা তখন ঢের বেশি কাম্য ঠেকে। মানুষ ঘরোয়া আরাম, হাতে-গড়া নানা সুবিধা-অসুবিধার উত্তাপ ও কলরব বর্জন করে অভ্যস্ত জীবনের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা নতুন দৃষ্টির সন্ধান করে। খুঁজে বেড়ায় হারাণো দিনের একটি পলাতক রেশ। খুঁজে পায় হাওয়ায় ভেসে আসা একটা টুকরো কথার উন্মেষ—যে কথাটি নতুন পরিবেশে তার তুচ্ছতা হারিয়ে মহামূল্য সত্যরূপে আবির্ভাব হয়। তখন বুঝতে পারি—রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁরই সমগোত্র তীর্থপথিক কেন স্থানান্তরে চিরচঞ্চল মন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং কিসের সন্ধানে।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না করে এইবার বলি—দূরে সরে এসে

বড় আরামে আছি। ব্যক্তিগত অসুবিধা, অভ্যস্ত জীবনের মসৃণতা, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, নিয়মিত স্নানাহারের আরামটুকু হয়তো এখানে মিলছে না। কিন্তু সেই মারাত্মক একঘেঁয়ে সুর আর শুনতে পাচ্ছি না। পাচ্ছি এক নতুন অশ্রুত সুরের আভাস—যার দুর্ভেদ্য মায়াজাল স্তব্ধ হয়ে আছে এই বিচিত্র বনও বট-বাবুলের স্নিগ্ধ ছায়ায় আর আগুন-ধরানো পলাশ আর গুলমোরের অজস্র এবং অকৃপণ বর্ণ-বিস্তারে। আলোয় কালোয়, সোনায় আর সোহাগায় যার বহুরূপী জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত, কম্পিত এবং সঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে প্রতিটি অমৃতক্ষণে। সেই নব-লব্ধ চেতনার আদিম গভীরতায় দূরের ঐ পশ্চিম ঘাটের বহু প্রাচীন পাথুরে চূড়োগুলি পর্যন্ত যেন প্রাণবন্ত প্রাগৈতিহাসিক জীব বলে মনে হচ্ছে। কত কী যে দেখল ওরা। কত পুরাতন অতীতের কৌতূহলী দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঐ সহ্যাদ্রি পর্বত, যার কথা পুরাণ-ইতিহাসে পড়েছি কিন্তু যার জীবন্ত সংস্পর্শে, নীরব অস্তিত্বের সংস্রবে আসতে পাইনি এতদিন! সাতবাহন, শক ক্ষত্রপ, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট প্রভৃতি কত বিপুল রাজবংশের বিশাল ঐশ্বর্য-স্মৃতি বহন করে, তাদের ঐতিহ্যের নামাঙ্কিত শিলালিপি, প্রস্তরমূর্তি গুহাগর্ভে ধারণ করে আজও দাঁড়িয়ে আছে অটল স্থৈর্যে।

যদি এখানে না আসতুম, এসব কিছুই চোখে পড়ত না—না ভারতীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য, না ভৌগোলিক প্রকৃতির বিস্ময়কর পরিচয়, না আঞ্চলিক বিভাগের রীতি-নীতি, না মানুষের বিভিন্ন

জীবন-প্রণালী। বিদেশের কথা আপনি মনে পড়ে যাচ্ছে। সেখানকার শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-সুবিধা তুলনায় লোভনীয় মনে হয় যখন ভাবি একটি স্যুটকেস আর তোয়ালে টুথব্রাশ নিয়ে শিক্ষার্থীর দল য়ুরোপের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। যথেচ্ছ গতিবিধি, অবসর আর উপভোগের পথে কোনো প্রতিবন্ধক দাঁড়ায় না। প্রতিতুলনায় আমাদের দেশে এখনও যে সব অতি-সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় জীবনকে জড়িয়ে আছে, সে গুলো বড় হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশের ছাত্র-শিক্ষক-সাহিত্যিকের দল এমন নিঃসম্বল, সাহায্য-বর্জিত, সহানু-ভূতিহীন জীবন যাপন করে যে দুঃখ আসাই স্বাভাবিক। চোখেই যদি না দেখল, শিখবে কি করে? অবসর যদি নাই মিল্‌ল জীবনে, রূপসৃষ্টি বা রসচর্চা কি নিরর্থক হ'য়ে ওঠে না? যার আয় সামান্য, সেও বিদেশে সপ্তাহান্তে শহর থেকে পালিয়ে বাঁচে। কেপ্রি আর রিভিয়েরা না যেতে পাক্, ব্রাইটন আছে। আছে ওয়েলসের পাহাড়-উপত্যকা। সেখানে গিয়ে দু' দণ্ড মনকে উজ্জীবিত করে নেয়, দেহকে জিরিয়ে নেয়, মাথা আর কলমকে বিশ্রামে আর উপভোগে সতেজ সরস করে তোলে। আমাদের যদি সেই সুবিধাটুকু থাকৃত! বলে কোনও লাভ নেই। শুনতে হবে অধ্যয়ন আর কৃচ্ছ্রসাধন হল বিদ্যার্থীর তপস্যা—অর্থাৎ ঘরের কোণে পরীক্ষার পড়া একটানা মুখস্থ। শিক্ষক-অধ্যাপকের স্বধর্ম হল নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কাম কর্তব্য-সাধন আর কবি-সাহিত্যিকের নৈতিক দায়িত্ব না কি অসীম। অবাস্তব,

অপ্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সৌন্দর্য নিয়ে তাঁরা ডুবে থাকুন। তার বেশি চাহিদা কিসের ?

কিন্তু মধ্যে মধ্যে চোখ না বদ্‌লালে যে চোখে নতুন রং ধরে না, এ কথা বলি কাকে ? কোথা থেকে আসবে জীবনদায়ী উত্তাপ যদি শিরায় নতুন রক্তের জোয়ার না আসে ? কোথা থেকে জন্মাবে জীবনবাহী রক্তস্রোত, যদি অজীর্ণ ও অপুষ্টিকর খাদ্যে যকৃৎ-বিকৃতি ঘটে ?

তবু চেষ্টা করা উচিত। স্বার্থপরতাই বলুন আর নিছক পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই বলুন, ধার করেই হোক্ আর যে কোনও উপায়েই হোক্, মনটাকে চাঙ্গা করবার জন্য, দৃষ্টি-ভঙ্গী অর্জন করবার জন্য আর ভিন্ দেশের মানুষ আর দৃশ্য-সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েও একদা রাত্রির অন্ধকারে পা বাড়িয়ে দিতে হয়·········

দেহের যেমন অস্বাস্থ্য হয়, মনেরও তেমনি অজীর্ণ রোগ হয় মধ্যে মধ্যে। তখন স্থান পবিবর্তনের প্রয়োজন ঘটে। নতুন জায়গায়, নতুন আবহাওয়ায় এবং পুষ্টিকর খাদ্যে দেহকে যেমন আবার চাঙ্গা করে নিতে হয়, তেমনি সময় ও সুযোগমত মনটাকে মাঝে মাঝে মেরামৎ করে নেওয়ার দরকার হয়। নতুন পরিবেশে, নতুন মানুষ আর দৃশ্যের সংস্পর্শে মনও নতুন খোরাক পায়, চোখও খুলে যায়। যে নীল আর সবুজে মন-প্রাণ স্নিগ্ধ হয়, যে সব ছোট ছোট নতুন ভাবনায় মানুষের মন তার অতি প্রয়োজনীয় পরিধি খুঁজে পায়, বিস্তৃতি লাভ করে, পুরানো জায়গার অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় ঘড়ির কাঁটার নির্ভুল নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত ক্রমিক দিনের শৃঙ্খলায় তার এতটুকু ছায়াপাত হয় না। যে সব দৃশ্য অতি সুলভ নাগরিকতায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, যে মেঘ ও রৌদ্রের অত্যাশ্চর্য্য কৌতুক পৌর দৃষ্টিতে নিতান্তই অবান্তর ঠেকে, হাজার ক্রোশ দূরে প্রবাসে এসে একটুখানি জল, সামান্য একটু রঙের খেলা কিংবা স্নিগ্ধ প্রভাতে দূরে পাহাড়ের গায়ে প্রতিটি শ্যামল রোমাঞ্চ এমন একটা নতুন চমক জাগিয়ে দেয়, নতুন দৃষ্টি উন্মীলিত করে দেয় যে মনে হয়, এই বুঝি প্রথম দেখলুম। এই নতুন করে দেখাই হল শিল্পীর কাছে প্রথম ও

শেষ চরম সত্য। সে সত্যের চকিত উপলব্ধিতেই মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি খুলে যায়। জন্মায় কবিতা, শিল্প-সাহিত্য। এই দৃষ্টির কথাই ডী লা মেয়র থেকে ডেভিস্, বিদেশের অথবা স্বদেশের সকল কবি ও লেখকই বলে এসেছেন। এই দৃষ্টি অর্জন করতে হলে মনের নির্মোক ত্যাগ করতে হয় এবং সেটা সম্ভব হয় দূরে সরে এলে।

পাঁকেও পদ্মফুল ফোটে। বৈচিত্র্যহীনতায় সাহিত্যের জন্ম হয় না—এমন কথা বলি না। নিকট দৃষ্টি আর অভিজ্ঞতাও চরম বাস্তব সৃষ্টি করতে পারে এও সত্য। কিন্তু অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে, পূর্ণ অথচ সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে বাস্তব তথ্যকেও বাছাই করে নিতে হয়। সেই বিশ্লেষক এবং অখণ্ড, সংবেদনশীল মানস-দৃষ্টির জন্যেও একটু প্রচ্ছন্ন ভাবনা, একটু অবসর-অন্তরালের প্রয়োজন।

যে কোনও ভালো জিনিসের মূল্য দিতে আমরা সবাই প্রস্তুত। যে জিনিস সহজে পাওয়া যায় না, তার দাম দিতেই হবে। যে জিনিস কাছে মেলে না, তার সন্ধানে দূরে যেতে হয়। তার জন্যে যে অর্থ আর পরিশ্রমের প্রয়োজন, বৈচিত্র্য-পিপাসু মন সেটা সাগ্রহে ও সানন্দে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু লভ্যের অনুপাতে মূল্য যখন বেশি অথবা সাধ্যাতিরিক্ত, তখন প্রশ্ন জাগে মনে। অনুসন্ধানী বিচার-পন্থায় যেমন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, সন্দেহ আর প্রশ্ন-সমাকুল বিশ্লেষণে তেমনি জাগে সমাজ-জিজ্ঞাসা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তখন প্রাণ ধারণের গ্লানি অসহ্য হয়ে ওঠে। সমাজ-গঠন

আর স্বার্থপ্রণোদিত সমাজ-ব্যবস্থা তখন বিরুদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করে। মনে হয়, কেন এই অপরিচ্ছন্ন জীবনের অহেতুক বিড়ম্বনা? অতি ন্যায্য সুবিধা বা ব্যবস্থার ফলে মানুষের যেটুকু আরাম তার একান্তই প্রাপ্য, সেটুকুও কেন মেলে না? শতাব্দী-ব্যাপী সমাজ-সংস্কারের চেষ্টায়, স্বাধীনতা-লাভের দু বছর পরেও আমরা অনেকেই যে তিমিরে, সেই তিমিরে। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, আন্দোলন আর গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে। সমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রেণী-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা কৃত্রিম কাজের সাড়াও পড়ে গিয়েছে লক্ষ্য করি বটে। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত আর তারও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের জীবন-প্রণালীতে যে কিছুমাত্র অদল-বদল হয়েছে কিংবা তাদের ভাব অথবা কর্মজগতে কোনও আশ্বাসের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, এমন মনে হয় না।

ভারতের মতন বিশাল মহাদেশে নানাধরণের জীবন ও জীবিকার প্রচলন। এত অন্ধ বিশ্বাস, অশিক্ষা আর কু-সংস্কারের অচলায়তনে সহসা এক কালাপাহাড়ী কীর্তি স্তম্ভ স্থাপন করা সম্ভব নয়, তা জানি। কিন্তু অন্ধ সংস্কার আর অশিক্ষার মধ্যে তাদের ফেলে রাখার দায়িত্ব কাদের? আর এই অজ্ঞতা দূর করার অবশ্য-কর্তব্য দায়িত্বই বা কাদের? কাদের দোষে হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা আর হরিজন সমস্যা? কাগজে কলমে এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে, বিভিন্ন প্রদেশে উপযুক্ত কর্মীদের উৎসাহে কিছুটা কাজও হয়েছে। কিন্তু কবিগুরুর শাণিত ভাষায় রচিত প্রবন্ধা-

বলী আর গান্ধীজীর আপ্রাণ চেষ্টা যে সার্থক হয়েছে, এ কথা আজও বলা গেল না।

যখন দেখি সরকারী প্রকাণ্ড বাগিচায় বড় বড় গাড়ী সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ভব্য ও সুসংস্কৃত বেশে ছেলেমেয়েরা মনের খুসিতে ছুটে বেড়াচ্ছে আর অদূরে ছেঁড়া তেরপল, তালিমারা টিন আর ফুটো দর্মার ছাউনিতে একাধিক প্রাণী ছাগল-সমেত যাবতীয় গার্হস্থ্য কর্তব্য সম্পন্ন করছে, যখন দেখি উদ্যানে কৃত্রিম উপায়ে সযত্ন-বর্ধিত ফুল ও ফলের চাষ আর গাড়ী থেকে জর্জেট-তনুকার দল টাকায় দুটি অ্যালফন্‌সো হাসিমুখে কিন্‌ছেন আর রাস্তার ওপারে ছোট্ট খানার পচা জলে অনেকগুলি নারী বেসরম অবস্থায় কোনও মতে তাদের স্নান আর কাপড়-কাচা সেরে নিচ্ছে, তখন মনে প্রশ্ন জাগা আশা করি অবৈধ নয়।

কিন্তু তখনই ভাবি—এ প্রশ্ন জাগা তো নতুন নয়। দেশে বিদেশে যুগে যুগে মানুষ প্রশ্ন করেছে, ব্যথিত হয়েছে। কোথাও বা কাজ হয়েছে, পুরানো কাঠমো ভেঙ্গে নতুন ভিত্তির স্থাপনা হয়েছে। বস্তি পরিষ্কার হয়ে পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর শ্রমিক-নিবাসের পত্তন হয়েছে। কোথাও বা অজস্র বিবৃতি, ম্যানিফেস্‌টো আর নির্বাচনী কৌশলে ভোট আদায়ের ফন্দীতে বৃথা বাক্যব্যয় হয়েছে। এক এক সময়ে মনে হয় বৃথা এই দেশপ্রেমের ধরতাই বুলি আর নিরর্থক এই সমালোচনা। কর্মপ্রচেষ্টাকে জাতীয়তাবাদের ধুয়োয় প্রাদেশিকতার ধোঁয়ায় আর কতদিন আচ্ছন্ন রাখা চলবে, জানি না।

এই তো সেদিন সকালে নিমগাছের ছায়ায় বসে বসে ভাবছি, দেখি অনেকগুলি তরুণ-তরুণী দল বেঁধে চলেছে। সঙ্গে একটি মাত্র ভৃত্য। জিনিষপত্র ছেলেমেয়েরাই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দলের মধ্যে আছেন দু'জন প্রৌঢ় অধ্যাপক। যেচে আলাপ করলুম। কথা-প্রসঙ্গে যে সব কথা শুনলুম, তাতে মনে যেমন আনন্দ হল, তেমনি দুঃখবোধও হল। বোম্বাই সরকার ছুটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, যাতে অধ্যাপকের সঙ্গে তারা বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষণীয় ও দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখতে ও শিখতে পারে, তার জন্য নানা-রকম সুবন্দোবস্ত ও সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করেছেন।

আমরা বাঙালী। বাঙলাদেশের শিক্ষা দীক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রগতি নিয়ে বড়াই করি। কিন্তু আসলে আমাদের মনই তো সঙ্কীর্ণ, প্রাদেশিক ও ঈর্ষ্যাকাতর। আমরা ছাত্রদের জাগ্রত সত্তাকে ও দাবীকে সুবিধামত দাবিয়ে রাখি, আবার সুবিধামত কাজে লাগাই। শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ঠুনকো সম্মান দেখিয়ে তাদের অতি সঙ্গত চাহিদাকে অস্বীকার করি। তাদের আয়-ব্যয়ের কোনও হিসাব না জেনে, কোনও আয়-বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করে তাদের অপমান করি এই বলে যে, জাতীয় প্রয়োজনে তাদের নিকট থেকেই সব চেয়ে নিঃস্বার্থ ব্রতাচরণ প্রত্যাশা করি। খালি পেটে তারা নতুন নতুন গঠনমূলক পরিকল্পনা সৃষ্টি করুক। কিন্তু ভদ্রলোকের সুস্থ জীবন, জ্ঞান-চর্চার উপযুক্ত অর্থ ও অবসর, দায়িত্ব আর মানসিক পরিশ্রমের

উপযুক্ত মুনাফা তারা যেন দাবী না করে। অপর প্রদেশের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব যখন চক্ষুশূল হয়, তখন তাদের কর্মসূচীর অগ্রগতিটুকু যেন আমরা নজর করে দেখি।

মনে যত প্রশ্নই জাগুক, শেষ পর্যন্ত প্রশ্নগুলোকে দাবিয়ে রাখতে হয়। দুনিয়ায় এত প্রশ্ন আছে যে সকল সমস্যার সমাধান করা দূরে থাকুক, তাদের হিসাব-নিকাশ করাই দুরূহ—যেমন কঠিন আকাশের তারা গোনা। অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যত নতুন নতুন তারা দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে, তত অজস্র নক্ষত্র এবং অপরিচিত নীহারপুঞ্জ আত্মগোপন করে থাকে। তাই সাধারণ মানুষের চোখ যন্ত্রের ছিদ্রপথ আর আতস কাঁচ ছেড়ে রাতের তারা-ভরা আকাশ দেখে অবাক্ হয়ে যায়। অনন্ত জিজ্ঞাসার মোহ কাটিয়ে সম্মুখীন সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পড়ে।

মহারাষ্ট্র দেশের একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে। এদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা আধুনিক জীবনের ধাক্কায় যে বিশেষ পরিমাণে বদলেছে, তা মনে হয় না। কালের আবর্তনে যেটুকু পরিবর্তন স্বাভাবিক, সেটুকু অবশ্য হয়েছে। কিন্তু দেশের অন্তর ঠিকই আছে। শহর ছেড়ে একটু দূরে গেলেই সেটা বোঝা যায়। বাঙলা দেশের শহরতলীর আশেপাশে কিম্বা মফঃস্বলেও জীবন ও জীবিকার যে 'সোফিষ্টিকেশ্যন' অথবা জটিল রূপায়ণ, এখানকার শহরের নিকটেও ততটা নেই। কেন নেই, তার একাধিক কারণ আছে।

সবচেয়ে বড় কারণ হল দাক্ষিণাত্যের ভূগোল, যে ভূগোল তার সমগ্র সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এত বড় বিস্তৃত ভূভাগে অবশ্য নানা জাতির সংমিশ্রণ হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত নানা ভাষাভাষীর সমাবেশ রয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা বড় ঐক্যসূত্র আছে, যেটা প্রথম দৃষ্টিতে নজরে পড়ে না। সেটা হল সমাজ-গঠন। এখনও পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রাধান্য। এই পঞ্চায়েৎ-প্রথা আর গ্রাম-কেন্দ্রিক সভ্যতার গোড়ার কথা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন। আর্য-সভ্যতা যদি কিছু শিখে থাকে দক্ষিণা-পথের সমাজ-সংস্কৃতি

থেকে, তাহলে সেটা এই গ্রাম-কেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসন। এরি বিভিন্ন প্রকাশ আমরা দেখি প্রাচীন ভারতের শাসনপদ্ধতিতে। এর জীবনীশক্তি অটুট বলতে হবে। কেননা, মৌর্য সাম্রাজ্য থেকে সুরু করে অন্ধ্র, চালুক্য, চোল প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বড় বড় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির অধীন থেকেও এই গ্রাম-প্রধান স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্য নষ্ট হয়নি।

ভারত হল কৃষিপ্রধান দেশ। মহারাষ্ট্র দেশ তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তফাৎ আছে। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড অন্তর্বেদী প্রদেশে যে ধরণের কৃষিকর্ম, বাঙলা ও বিহারে সে ধরণের নয়। দাক্ষিণাত্যের লাভা-গঠিত অঞ্চলে তো নয়ই। উত্তরাপথের নদীমাতৃক অঞ্চলে বিনা আঁচড়েই সোনা ফলে। আমরা বাঙলা দেশের লোক যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে সবুজ দেখি। সবুজের প্রাচুর্য আর সব্জির সাফল্য আমাদের ভরিয়ে রেখেছে বলেই হয়তো আমরা শস্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটু উদাসীন। বাঙলা দেশের চাষীর দল যে সবাই কিছু অবস্থাপন্ন নয়, এটা ঠিক। তারাও পিষ্ট, উঞ্ছভোগী। সভ্যতার নয়ন-প্রান্তিক পথে পড়ে আছে।

কিন্তু তারা যদি দেখত অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষ করে এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে অথবা রাজপুতনার মরুঅঞ্চলে কৃষকদের কত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, দেবতার প্রসাদ-বৃষ্টির ওপর কতখানি নির্ভর করতে হয়, তা হলে হয়তো তারা আপনাদের

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বলে মেনে নিত। এসব দেশে এতটুকু জলের জন্যে কাঙাল-পনা দেখলে সত্যিই মমতা জাগে মানুষগুলির ওপর। দূরের পাহাড়ী নদী থেকে কেটে আনা একরত্তি খালের জলেই এদের সংসার আর ক্ষেতের কাজ সেরে নিতে হয়। দাক্ষিণাত্যের মালাবার, কোঙ্কন, আর পূর্ব উপকূল যতটা বৃষ্টি পায়, দক্ষিণাপথের মধ্যভাগ আর পশ্চিম ঘাটের 'রেন-শেড' ততটা পায় না—প্রাকৃতিক ব্যবধান ও আওতার জন্যে।

তাই মহারাষ্ট্রের কর্মঠ নরনারীকে দেখলে মনে আনন্দ হয়। প্রকৃতি এদের ভিন্ন ছাঁচে ঢেলে গড়ে-পিটে শক্ত ও শ্রমসহিষ্ণু করে তুলেছে। রুক্ষ মাটির দেশ আর পাথুরে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এরা ফসল ফলায়। এদের জীবিকা ও জীবনপ্রণালী মোটামুটি সরল। যেটুকু বিলাসিতা, সেটুকু নারীর অঙ্গসজ্জায়। সাধারণ ঘরের রমণীরাও রঙীন কাপড় আর চোলি পরে বেড়ায়, আর মাথায় গোঁজে ফুল। ফুলের কদর করতে জানে বটে এ অঞ্চলের মেয়েরা। গজ্‌রা অর্থাৎ বিনুনি-করা ফুলের মালার শোভা দেখবার জিনিষ। যত্ন করে খোঁপায় পরানো হয়। বাৎস্যায়নের আমল থেকে আজ পর্যন্ত সাধারণ মাহারাষ্ট্রি রমণী সেই একই প্রকৃতির। আর পুরুষরাও বোধহয় তাই। এ দেশের মানুষ বাঙালীর মতন কৃত্রিম আতিথ্যের আড়ম্বর দেখিয়ে জিনিষ অপচয় করে না।

স্বতন্ত্র সমাজ-গঠনধারার জন্যই বোধহয় মহারাষ্ট্র দেশের রাষ্ট্র-চেতনা খুব তীব্র। এ বিষয়ে বাঙালীর সঙ্গে মারহাট্টির

অনেক মিল। দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ, অকুণ্ঠ দেশাত্মবোধ এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। তবে সেই সঙ্গে একটা প্রাদেশিক অভিমানও আছে। বোম্বাই প্রদেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুটি পৃথক্ দল, মারহাট্টি এবং গুজরাটী। মহারাষ্ট্র যদি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়, তাহলে মধ্যপ্রদেশের অনেকখানি এর সঙ্গে জুড়তে হবে। আজকাল দেখি, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের যুগ এবং দাবী—কর্ণাট, কেরল, মহারাষ্ট্র, সকল প্রদেশই যুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রকে স্বীকার করে আপনার অখণ্ড এবং পৃথক্ অস্তিত্ব কামনা করে। মহারাষ্ট্র তো আপনার বিশ্ববিদ্যালয় পুণাতে স্থাপিত করেছে। বোম্বাই ছাড়লে পুণাকেই রাষ্ট্রপীঠ করতে হবে। সেটা হবেও। কেননা, এ অঞ্চলের শুধু প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যই নেই, আছে অনেক যুগসঞ্চিত ঐতিহ্য।

সম্রাট প্রিয়দর্শীর যুগ থেকে মহারাঠ্ঠিকজাতির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। অপরান্ত প্রদেশের এবং পশ্চিম সীমান্তবাসী এই উপজাতির উল্লেখ আছে তাঁর শিলালিপিতে। সেই সময় থেকে শিবজীর আমল পর্যন্ত মহারাষ্ট্র অঞ্চল আপনার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র অক্ষুন্ন রেখেছে। এখানকার যাবতীয় গুহা আর লেখমালা আজও সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের উজ্জ্বল সাক্ষী। কারলী গুহা, নানাঘাট আর বিজাপুর, লোহাগড়, সাতারা প্রভৃতি জায়গার মারহাট্টী দুর্গ কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে আছে। কাজেই মহারাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য-কামনা একেবারে অসঙ্গত বা ইতিহাসবিরোধী নয়। আমাদের নব-পরিকল্পিত রাষ্ট্র-

সংস্থানে এই সব পৃথক্ প্রদেশের কার্যকারিতা এবং অস্তিত্ব কিভাবে সফল হবে জানিনা।

দূরে পশ্চিম ঘাটের ঢেউ-খলানো রেখা এ অঞ্চলকে শুধু মেখলায়িত করেনি, দিয়েছে একটা বিশিষ্ট রূপ ও চরিত্র। ঐতিহাসিক যুগেরও বহু আগে এই সহ্যাদ্রি-পর্বতের জন্ম। রুক্ষ ও মৃত্তিকালেশহীন এই পর্বত মাত্র তিন হাজার ফুট উঁচুতে মেঘ আর কুয়াশার প্রলেপে সজ্জিত হয়ে আছে। নতুন বর্ষাধারায় এর ন্যাড়া ও পাথুরে চেহারা সাত দিনের মধ্যেই আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে। গায়ে এখন সবুজের আস্তরণ। পল্বল এখন হ্রদে পরিণত। নিরাভরণ কালো পাথরগুলো ছোট ছোট জল-প্রপাতে ভিজে চকচক করছে। দূর থেকে ঐ রূপালি স্রোত মেঘলা দিনেও জরিদার কিনারার মতন ঝলসে উঠছে। প্রাগৈতিহাসিক পাহাড়ের বুকে স্বল্লায়ু জলের আঁচলখানি আপনার নতুন-করে-পাওয়া প্রাণবার্তা প্রাণপণে ঘোষণা করে চলেছে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের এই যে স্বাতন্ত্র্য, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, তার সঙ্গে বোম্বাইয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। থানা ষ্টেশন ছাড়িয়ে বিদ্যুৎবাহিত রেলগাড়ী যখন সিয়ন, মাতুঙ্গা অতিক্রম করে দাদারে এসে পৌঁছয়, তখন ইতিহাস আর ভূগোলের কথা বিস্মৃত হয়ে আধুনিক শহরের বিশ্বজনীনতায় বিস্মিত হতে হয়।

অবিশ্যি এটা স্বাভাবিক। দেশ তৈরী হয়েছে জল আর মাটির গুণে। শহর তৈরী হয়েছে মানুষের হাত আর চূণ-বালি-পাথরের

সমন্বয়ে। বাংলা দেশের যা চরিত্র আর বৈশিষ্ট্য, কলকাতার চেহারার সঙ্গে তার মিল খুব কমই। শিয়ালদ' অথবা হাওড়ায় যখন ট্রেণ ঢোকে, তখন আশপাশের চিমনি-কারখানা আর খোলার চালের বস্তির সঙ্গে শস্য--শ্যামল স্নিগ্ধ পল্লীশ্রীর কোনও সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। নানা দেশী মানুষের ভিড়ে, নানা ভাষার উচ্চারণে মনে হয় না এটা বংলার রাজধানী অথবা বাংলার মস্তিষ্ক কিংবা হৃদয়। বোম্বাইও অনেকটা তাই। শুধু তফাৎ এই যে, শহরটা আরো বিলিতি-মার্কিনি ছাঁচে ঢালাই। শহরের যান-বাহন, বাস-আহারের ব্যবস্থা আরো আধুনিক এবং কিছুটা উন্নত। জীবনটা আরো গতিশীল।

দৈনন্দিন জীবনে কর্মব্যস্ততা থাকলেও ভদ্রতার ছাপটা আরও সুস্পষ্ট। তাড়া আছে কিন্তু হুড়ো নেই। দোকান-পশার আছে কিন্তু মেছোবাজারী হুম্‌কি নেই। মানুষ আছে প্রচুর, আবর্জনা সে তুলনায় নগণ্য। অথচ সেই মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সুরাটির ভিড় আমাদের বড়বাজারেও আছে। কিন্তু এই শহরে তাদের জীবনযাত্রার সুনির্দিষ্ট প্রণালীর সঙ্গে বোম্বাইয়ে তাদেরই জাত-ভাইয়ের জীবনযাত্রার অনেকখানি তফাৎ আপন হতেই চোখে পড়ে। এখানে শ্রীহীন ব্যবসায়ী জীবনকে আরো নোংরা করে তোলবার অসীম সম্ভাবনা এবং সেই কদর্য পরিবেশে বাস করার ক্ষমতা ও সহিষ্ণুতাও অসাধারণ। ওখানে সেটা সম্ভব নয়। কেন না পৌরসভা বলে যে বিশিষ্ট পদার্থ সকল সভ্য শহরেই থাকে, সেটা বোম্বাইয়ে বিশেষভাবেই কাজ করে এবং

সম্পূর্ণ সচেতনভাবে। আইন কানুনগুলোও কড়া। কালো-বাজার সর্বত্রই আছে। কিন্তু বে-পরোয়া আর চড়া হলেই সেটা পৌরজীবনে ভাঙন ধরায়। বোম্বাইয়ে যে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ-সম্প্রদায়ের সমাবেশ, তাতে অনায়াসেই দায়িত্বহীন, শিথিল অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারত। পারেনি বোধ হয় তার সক্রিয় পৌর-চেতনার গুণে আর সাধারণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আত্মমর্যাদা-জ্ঞানে।

আর একটি বড় কারণও আছে। সেটা এই যে, এ সহরে যারা বাস করে, তাদের নিজস্ব বাড়ী নেই বললেই হয়। এ্যাপলো বন্দর থেকে স্বুরু করে দাদার, প্যারেল পর্যন্ত বিভিন্ন পল্লীতে বিভিন্ন ধরণের মানুষ তাদের আয় ও উপার্জন অনুসারে ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করে। 'তাজের' আভিজাত্যমণ্ডিত স্যুইট্ হোক আর মাতুঙ্গার গেরস্ত পাড়াই হোক্, সর্বত্রই দু-চারখানি কামরা নিয়ে মানুষ পৃথক সংসার রচনা করেছে। সকলেই চেষ্টা করে একটু পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে। বাড়ী নোংরা করা সম্ভব হয় না, ধোঁয়ায় চোখ রগড়াতে হয় না। প্রকাণ্ড প্রাসাদের পাশেই অপরিসর ঘিঞ্জি বস্তি কিংবা আস্তাবলের বিসদৃশ দৃশ্যে দৃষ্টি পীড়িত হয় না। শহরের বাসিন্দা অঞ্চলে দোকান দেওয়া হয় না। রাত্রে মাৎলামি হৈ-হল্লা, রেডিওর তারস্বরে মানুষের প্রাপ্য বিশ্রামস্বুখে ব্যাঘাত ঘটে না।

তার কারণ পৌরসভার আইনগুলোকে মানা হয়। এক কথায় বোম্বাইয়ের অধিবাসী পৌর আইনকে যতই অপছন্দ করুক

অথবা কাগজে সমালোচনা করুক, আইন মেনে চলে। বাস্-এর একতলায় ধূমপান নিষিদ্ধ। তাই প্রয়োজন হলে দোতলায় উঠে ধূমপান চলে। 'কিউ' প্রচলনের জন্য সাধারণ যান-বাহনে ওঠার চেষ্টার অভব্য এবং প্রাণান্তকর তাড়াহুড়ো দেখতে পাওয়া যায় না। সকলেই ধীর-স্থির হয়ে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। অপরকে 'চান্স' না দিয়ে কিউ ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়া শুধু অসভ্যতা নয়, অভাবনীয় এবং বে-আইনী। কলকাতায় বাদুড়-ঝোলা অফিস-যাত্রীর পাশে এ অঞ্চলের মানুষকে মনে হয় যেন বড় বেশী ধীর ও নিষ্প্রাণ।

কিন্তু যে কথা বলছিলুম। শতকরা নব্বুই জন মানুষ ফ্ল্যাটে বাস করে। কাজেই বোম্বাইয়ে এক ইঞ্চি জায়গাও নষ্ট হয় হয় না। একেই দৈর্ঘ্য-সম্বল সমুদ্র-বেষ্টিত অপরিসর দ্বীপ। সমুদ্র বুজিয়ে পাথর চাপিয়ে শহরকে আর 'হোরাইজন্ট্যালি' বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই বোম্বাইয়ের গঠন 'ভার্টিক্যাল'। বাসিন্দার দৃষ্টিও ভার্টিক্যাল। নিজে যে সুখ-সুবিধা ভোগ করে, যে অসুবিধা মেনে নেয়, অপরকে তাই করতে দেয়। তারা গুড্ নেবার্স, বিবেচক প্রতিবেশী। কেউ কারুর ধার ধারে না, গায়ে-পড়ে অসভ্যতাও করে না। স্বয়ংপূর্ণ, স্বতন্ত্র ফ্ল্যাটের মানুষ-গুলি আপন পরিবারের কিংবা একক জীবনের ভালো-মন্দ নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকে। নিজস্ব বাড়ীর অধিকার-বোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রতিবেশীর ওপর হুমকি চালায় না। অনিশ্চিত বাস-স্থানের, পরিবর্তনশীল গতিপ্রধান জীবনের, স্বল্পস্থায়ী নিশ্চিত

ও নিশ্চিন্ত অস্তিত্বকে তারা অবলম্বন করে আছে। পরস্পরের স্বাধীনতায়, আরামে ও তথাকথিত অন্তরঙ্গ সামাজিক মেলা-মেশার অবশ্যম্ভাবী জটিলতায় আপনাকে জড়িত করতে চায় না। তারা ওপরও দেখে, আবার নীচুটাও দেখে।

আর একটি কারণ—বোম্বাইয়ে পার্‌শি প্রভৃতি পরদেশী সম্প্রদায় শহরটিকে আপনার করে নিয়েছে। পাঠাগার, চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান, উদ্যান, অনাথ-আশ্রম, এমন কি বেড়াবার জায়গাগুলিতেও জনহিতকর কল্যাণস্পর্শ রয়েছে। যারা বোম্বাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছে, তারা এই শহরকে আরও সভ্য সংস্কৃত করে তুলেছে এবং সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার সাধারণ মানদণ্ডকে আরও একটু উঁচুতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছে। জীবনের অর্থ নৈতিক সঙ্কট-সমস্যা কলকাতার মতই তীব্র। ক্রোড়পতিও আছেন আবার মধ্যবিত্ত সংসারীও আছে। কিন্তু উগ্র আত্ম-বিজ্ঞপ্তিটা তেমন চোখে পড়ে না। চাকরের সমস্যাও আছে। কিন্তু উড়িয়া বামুন আর চাকরকে নিয়ে আমরা যেমন নাজেহাল হই, তেমন নয়। সংক্ষেপে বলা চলে—সব দিক্ দিয়ে বোম্বাইয়ের শহুরে জীবন কলকাতার নাগরিক জীরনের চেয়ে আরও নীরব এবং সংহত।

কিন্তু মেরিন ড্রাইভ আর মালাবার হিল্ দেখে যদি কেউ বোম্বায়ের পরিচ্ছন্নতায় পঞ্চমুখ হন, তা হলে সমালোচকের মন খুঁৎখুঁৎ করে। শিয়ালদ', বৌবাজার, রাজাবাজারের অকথ্য কুশ্রীতা আর চীৎকারের অবিশ্যি জুড়ি মেলা ভার। তবু

বোম্বাইয়ে কল্‌বা দেবী রোড অঞ্চলও আছে। আছে স্বদেশী বাজার ও গিরগাঁওয়ের সঙ্কীর্ণ গলি, অপরিসর বাসস্থান এবং কদর্যতা। টপ্ করে চোখে পড়ে না, এই যা। মহালক্ষ্মী অঞ্চলের সুষমায় আর ওয়র্লি অঞ্চলের চোখ-ঝলসানো আলোকিত পরিচ্ছন্নতায় শহরের ফাঁকির দিক্‌টা নজরে পড়ে না সহসা। কিন্তু 'জেসটিং পাইলেট'-এর গ্রন্থকার বোম্বাই-প্রসঙ্গে যে উক্তিগুলো করেছিলেন, সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক নয়। তবু বোম্বাইয়ের একটা নিজস্ব ছাঁচ ও চরিত্র আছে। যদিও ভাষার দিক্ থেকে সে অভাবটা কানে লাগে। সকলের মুখেই অল্প-বিস্তর ইংরেজি বুলি। কিন্তু একজন মহারাষ্ট্রীয় যখন 'ইণ্টারভ্যল' না বলে বলবে 'বিরতি', 'রেস্তরাঁ' শব্দ ব্যবহার না করে বলবে 'বিশ্রান্তি', তখন সংস্কৃতের মধুবর্ষণ হয়।

আপাতদৃষ্টিতে বোম্বাইয়ের যে সচল এবং গতিশীল জীবনটা নজরে পড়ে, সেটা কিন্তু ভাসা-ভাসা। নিতান্তই বাহ্য। সমাজের দৈনন্দিন জীবন স্পর্শ করে নেই। মোড়ে মোড়ে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বিশ্রান্তি-গৃহ এবং কর্নার ষ্টোর্স। সেখানে সব কিছুই পাওয়া যায়—খাদ্য থেকে ডাক টিকিট ও টেলিফোন। শহরে অসংখ্য হোটেল আর ক্লাব। আর অধিকাংশ মানুষ যেখানে ফ্ল্যাট বা 'রুম্‌স্' নিয়ে থাকে, সেখানকার গৃহকেন্দ্রিক জীবন কতটুকু, তা সহজেই অনুমান করা যায়। সিনেমা, খেলার স্টেডিয়ম এবং রেস্তরাঁ—এ সবগুলির অভ্যন্তরে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি। খুব ছিম্ ছাম ও পরিষ্কার। মানুষরাও

মোটামুটি ভদ্র সংযতভাবে চলাফেরা করে। দোকান-পসারে, স্বদেশী অথবা ক্রফোর্ড মার্কেটে জিনিসপত্র কেনাবেচা হচ্ছে, মানুষের ও যানবাহনের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বয়ে যাচ্ছে। 'সেল্‌স-ম্যানশিপ' অর্থাৎ বিক্রয়-শিল্পের চূড়ান্ত নমুনাও আপনি দেখতে পাবেন। কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন। আমার মনে হয়, এক হিসেবে বোম্বাই হল 'ডেড সিটি', মৃত শহর।

কলকাতায় আপনি বৌবাজারের চৌমাথা পার হবার আগে থেকেই শিয়ালদ' স্টেশনের আর বৈঠকখানার হাট-বাজারের সমুত্থিত গুঞ্জন এবং মিশ্র কলকাকলী শুনতে পাবেন। ট্রামে-বাসে গল্প-গুজব, দরকার হলে আস্তিন বাগিয়ে ঘুঁষোঘুঁষি, রাস্তার মধ্যিখানে ফলওয়ালার সঙ্গে ক্রেতার কলহ এবং পথ-চারীকে ধরে সালিশী মানা, চিৎপুর অঞ্চলে বিশ্বনাথের শৃঙ্গী বাহনের অবাধ বিচরণ, একটা কিছু হুজুগ হলেই পাঁচশো লোক কাজ ফেলে বিনা কারণে জড় হওয়া এবং পরস্পরের গলা ছাপিয়ে অযাচিত পরামর্শ দান, ফুটপাথে ছবিঘরের টিকিট কাটা অথবা খেলার মাঠে ক্যিউ দিয়ে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সাংসারিক, নিদেন পক্ষে, পাড়ার সমাচার আদান-প্রদান—ইত্যাদি অতি-পরিচিত দৃশ্যগুলির মধ্যে একটা জীবন্ত শহরের ছাপ আছে। এ শহরের যে সব গল্‌তি, সেগুলো বলে দেবার দরকার করে না। এর কুশ্রী স্থাপত্য, জীবনের অসমান মানদণ্ড, এর অপরিচ্ছন্নতা, এর হৈ-হল্লা চীৎকার যে কোনও বিদেশীর চোখে দৃষ্টিকটু লাগে। কিন্তু একটা 'লাইফ' আছে। ভদ্রতা ও নীরবতা নেই এখানে

বোম্বাইয়ের মতন। যেচে কোনও প্রশ্ন করলে ভব্যতার নিদর্শন হয় তো মিলবে না। বিদেশীকে যথোচিত খাতির করে হয়তো এখানে গ্রহণ করাও হয় না। কিন্তু অযাচিত কলরবে আর জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে একটা প্রাণস্পন্দন ধরা পড়ে।

বোম্বাইয়ের ঔপনিবেশিক স্থাপত্য যখন চোখে পড়ে, সঙ্কীর্ণ স্থানে তেলরঙা বার্নিশ গায়ে পাঁচতলা বাড়িগুলো টালির মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে আর দুশো গজ অন্তর এক একটি মোড়ে নির্ভুল কায়দায় একই ছাঁদের ফ্যাকড়া রাস্তা আশে পাশে বেরিয়ে গেছে আর দেখি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যেও অপরিচত জনতা আপন মনে, বেশি বাক্যব্যয় না করে পদব্রজে চলেছে, তখন মনে হয় এর চেয়ে বিশালতর, জটিলতর কলকাতার একটি ছোট্ট পাড়ার গলির মোড়েও অস্তিত্বের আরো প্রকট পরিচয় মেলে। বোম্বাইয়ে ধোঁয়া নেই, আবর্জনাও নেই বললেই হয়। শীত-কালের সন্ধ্যায় গেরস্ত বাড়ির উনুনে আগুন ধরানোর একটু পরে যদি আপনাকে বাঞ্ছারাম অক্রুর গলির মধ্যে ঢুকিয়ে হলধর বর্ধন আর হিদারাম বাঁড়ুজ্যের গলি ঘুরিয়ে, দুর্গা পিতুরি গলি বেয়ে চোরাবাজারের কাছে এনে ছেড়ে দিই, বাবা মুস্তাফার সাধ্য নেই আপনাকে ঐ পথেই মলঙ্গার মুখে পৌঁছে দেন।

সে তুলনায় বোম্বাই শহর সরল এবং সুসভ্য নগরী। কিন্তু সজীব নয়। একটু বললে আশা করি নিন্দুক হতে হবে না। মুম্বা দেবী, কল্‌বা দেবী আছেন বটে। কিন্তু তাঁরা মরে আছেন। বাবুলনাথ আর মহালক্ষ্মীর মন্দিরে যে জনতা, তাও শৃঙ্খলা আর

গণনার মধ্যেই। আমাদের মা-কালী আর মদনমোহনের পিছল প্রাঙ্গণ আর পচা পাতা ও ফুলের প্রসাদীর তুলনা কোথাও নেই। কিছুটা আছে কাশী গয়া বৈদ্যনাথ অঞ্চলে। বোম্বাইয়ের মন্দির কিংবা পুণায় পার্বতী মন্দির দেখে মনে হয়, সাগর পারের সভ্য হাওয়ায় ও-অঞ্চলের মানুষ আমাদের মতন বিশ্বাস করে না—the dirtier the holier।

তবে একটা বিষয়ে বোম্বাই আর মহারাষ্ট্র প্রদেশ গণতান্ত্রিক মতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সবজিওয়ালী থেকে শুরু করে যে কোন মহিলাকে সম্বোধন করা হয় 'বাঈ'। মহিলা বলে স্বতন্ত্র কোন সম্মান দেখানোর প্রথা নেই। কেননা পুরুষ ও স্ত্রী যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সমপদস্থ এবং সহকর্মী, সেখানে স্ত্রীলোককে সমান হিসেবে দেখাই সঙ্গত। ট্রামে-বাসে গাড়ীতে, বসবার বেঞ্চিতে পুরুষ বসে থাকে। স্ত্রীলোক পাশেই বসে যদি ইচ্ছা হয়, নয়তো দাঁড়িয়ে থাকে। বিশেষ কোন সুবিধামূলক ব্যবস্থার প্রত্যাশা নেই, প্রয়োজনও বোধ হয় নেই। সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সমান ও অসঙ্কোচ সংস্পর্শের ফলে মনের মধ্যে অযথা অভিমান, সন্দেহ বা নিরুদ্ধ কোনও মনোভাব গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা অল্প—যেমনটি দেখি বাঙলা দেশে। বাঙলা দেশের মেয়ে মহারাষ্ট্র রমণীর চেয়ে হয়তো উচ্চ শিক্ষিতা হতে পারেন যদি স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ নেওয়া হয়। কিন্তু সংসার ও সমাজ শিক্ষায় তাঁরা পিছিয়ে আছেন, এ কথা বোধ হয় বলা চলে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মোটের

মাথায় মারহাট্টি স্ত্রীর পিছনে পয়সা খরচ কম পড়ে। অধিকাংশ রমণীই কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং গৃহকর্মে এতই নিপুণা যে, সাইকেল চড়ে বাজার করা থেকে সুরু করে ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজে তাঁরা পরমুখাপেক্ষিণী নন। তবে একটা খরচ বেশি হয়, সেটা স্বীকার করতেই হবে। মারহাট্টি মেয়েদের কাপড়-বাবদ কয়েক গজ বেশি লাগে। কিন্তু দু চার হাত শাড়ীর কাপড় কম লাগে বলে বাঙালী মেয়েরা যেন গর্ব না করেন। এক গজ ব্লাউস্ পীস অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের শানায় না। কিন্তু ঐতেই মারহাট্টি মেয়েরা দুটি জামা বানিয়ে নেয়। তা ছাড়া আজকাল শতকরা পঞ্চাশ জন মহারাষ্ট্র-রমণী কাছাও দেন না, মালকোঁচা বেঁধে কাপড়ও পরেন না। অতএব মোটামুটি হিসেবে, মহারাষ্ট্র দেশের স্বামীরা সার্থক অর্থেই পত্নীবান্ ও লক্ষ্মীবান্।

ঠাট্টার কথা নয়। মানুষের পরিচয় ফ্যাশনে নয়, কাজে। ফ্যাশনের আয়ু তো দিন-মাস-বছর দিয়ে হিসেব করা যায়। কাজটার পরমায়ু যাবজ্জীবন। আজকাল দেখছি, ব্যবহারিক যোগ্যতা এবং উপকারিতা বুঝে ফ্যাশন সৃষ্টি হচ্ছে। সেটা সুখের কথা। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী হ'ল বড় বড় শহর, যেখানে হরেক রকম চরিত্র, জীবিকা এবং আয়ের সমাবেশ। বিশ্বজনীন পত্তনে নানা জাতির এবং নানা জীবন-নীতি-রীতির সমন্বয়। তাই এই সব শহর থেকে দেশের মাটির খাঁটি পরিচয় পুরোপুরি না মিললেও ফ্যাশনের মাপকাঠির ওঠা-নামাটুকু বোঝা যায়।

বড় বড় শহরে যখন যে ফ্যাশন চালু হয়, মফঃস্বলেও ক্রমশ সেটা ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে আজকাল। পল্লী-অঞ্চলের সঙ্গে নাগরিক জীবনের অন্য যোগাযোগ না থাকুক, ফ্যাশনের সংযোগ আছে। রেল স্টীমার এবং ক্যানভাসার 'urbanisation' এর সহায়তা করেছে। মহানগরীর আশে-পাশে পঞ্চাশ ষাট মাইল পর্যন্ত জায়গা যেমন একটি hinter-land মহানগরীর খাদ্যশস্য, সব্জি, ফলমূল ও দুধ জোগান দেয়, তেমনি তার পরিবর্তে নাগরিক সভ্যতার বিচিত্র রূপায়ণ যানবাহনের ঘটকতায় মফঃস্বলী জীবনের মান-নিরূপণ করে। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পূর্বে বারাসাত, ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর অঞ্চলগুলি কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে, সেটা তুলনা করে দেখলেই আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হবে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় মফঃস্বলে যে সব সামরিক ঘাঁটি ও ছোট ছোট নগর পত্তন হয়েছিল, আর বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মহানগরীর আশে-পাশে যেভাবে নাগরিক জীবন বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তাতে এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক।

এর ওপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনিক যাত্রী, স্কুল-কলেজের পড়ুয়ার দল শহরের খবর ও হালচাল সদ্য সদ্য ঘরে পৌঁছে দেয়।

আর আছে সিনেমা-ঘর। ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান অন্য কিছু শিক্ষা দিতে পারুক আর না পারুক, আচার-ব্যবহার, হাব-ভাব, কাপড়-চোপড় এবং কথাবার্তায় একটা নতুন প্রভাব বিস্তার করেছে। ছবির জগতের যে জীবনাদর্শ, সেটা যতই অবাস্তব এবং কাল্পনিক হোক্, সাধারণ জীবনের হাল-চাল কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছে—একথা চোখ খুলে অস্বীকার করা যায় না। সিনেমার দৌলতে ফ্যাশনের দ্রুত সঞ্চালন এবং দ্রুত পরিবর্তনটাও লক্ষ্য করবার বস্তু।

অবশ্য, গতি আর পরিবর্তন হ'ল ফ্যাশনের স্বধর্ম। তা না থাকলে ফ্যাশনই হয় না। প্রতি যুগেই জীবন-প্রণালী, জীবনাদর্শ স্বতন্ত্র হয়ে যায়। কখনও কখনও এই বৈচিত্র্য উৎকট নূতনত্বের রূপ নেয়। কিছুদিন সেটা চলে, আবার বদলে যায়। দেশপ্রেম থেকে সাহিত্য-প্রীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে আসবাব-পত্র, অলঙ্কার-প্রসাধন থেকে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ও সংসারিক রীতি-নীতি সব কিছুই ফ্যাশনের অধীন। যুগে যুগে প্রেম করার পদ্ধতিও বদলেছে, কেবল বদলায় নি জন্ম আর মৃত্যু। সেটাও কোনদিন হয়ত বৈজ্ঞানিক ফ্যাশনের করায়ত্ত হয়ে যাবে।

এক কালে দেশপ্রেমের অর্থ ছিল স্বার্থত্যাগ, জীবন-উৎসর্গ। এখন সেটা অচল। বক্তৃতায় এবং ভোট-সংগ্রহে এখন কর্মীর নৈপুণ্য। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত যে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন চলেছিল, সেটাও কেমন করে বিলুপ্ত হয়ে

গেল তা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। এক এক সময়ে মনে হয়, ইংরেজ আর মার্কিনদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে, তাদের আমদানী পণ্যদ্রব্য ও প্রসাধন ব্যবহার করে, অজস্র সিগরেট্ ফুঁকে আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। অবশ্য মাশুল আগে অনেক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২ সালের যুবক-সমাজকে বিড়ি খেয়ে রাত ভোর কাশ্‌তে হয় নি, এটা কম সৌভাগ্য নয়।

ফ্যাশন প্রবর্তনের পিছনে অনেক অদৃশ্য কারণ থাকে। কখনো সেটা বাহার, কখনো উপকারিতা। চোখে যেটা ধরে, সেইটেই টপ্ করে চালু হয়ে যায়। ক্রেতা-বিক্রেতা, চাহিদা-জোগান প্রভৃতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক-সূত্র যতই জটিল হোক্, বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ কিছু কম চটকদার নয়। তা যদি না হত, তাহলে য়ুরোপে মডেল-ম্যানেক্যিন-মোডিস্ট্এর প্রতিষ্ঠান প্রচলন সব বন্ধ হয়ে যেত। লণ্ডন আর প্যারিস ফ্যাশনের পীঠ-স্থান হ ত না। আমাদের দেশে এগুলির রেওয়াজ নেই। শো-কেস্ ছাড়া যদি অন্য কোনও রকম জীবন্ত বিজ্ঞাপনের বন্দোবস্ত থাকত, তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াত বলা যায় না। সে যাই হোক্, ফ্যাশনের পিছনে একটা ফিলজফি আছে। যখন কোনও ব্যক্তি অথবা সমাজ একটা বিশিষ্ট রীতি-নীতি অনুসরণ করে, তার সঙ্গে একটা দৃষ্টিভঙ্গী এবং কিছুটা ব্যবহারিক সার্থকতা থাকে। মধ্যে মধ্যে আবার কিছু না করাও একটা ফ্যাশন। অথবা লোকে যা করে, বলে ও পরে, ঠিক তার উল্টো বেশ-বাস-আচার গ্রহণ

করাও একরকম ফ্যাশন। এই ফ্যাশন-ফিলজফির চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যাবে 'শেষের কবিতায়'।

ফ্যাশন-সৃষ্টি আর ফ্যাশন-অনুবর্তিতার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হ'ল ছেলেদের পোষাক আর মেয়েদের অঙ্গসজ্জা। গত তিরিশ বছরে পোষাক আর গহনার তাপ-যন্ত্র কতবার যে ওঠা-নামা করল, তার ঠিকানা নেই। দিনকয়েক একটা ঢেউ আসে, জন-সাধারণ হাবুডুবু খায়। তারপর কিছুদিন স্থিতিশীল অবস্থা, আবার একটা নতুন ঢঙের প্রবর্তন সুরু হয়। কখনো সেটা প্রগতি, কখনো প্রতিক্রিয়া। এটা হতেই হবে। নিত্য-নূতন ভঙ্গিমার উদ্ভাবনে স্বয়ং বিধাতাও পরাস্ত হয়ে যান। তাই পুরানো ফ্যাশনকে অদল-বদল করে, নতুন ছাঁচে ঢেলে আবার একটা ফ্যাশনের সৃষ্টি হয়। তিরিশ বছর আগে সার্ট-এর কলার যা ছিল, আবার তাই ফিরে আসছে। কোট-কামিজের ঝুল ও কাট্ নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এমন এক জায়গায় এসেছে যে ভবিষ্যতে কি যে দাঁড়াবে, কিছুই বলা যায় না। কখনো পাঞ্জাবী-ফতুয়ার মতন, কখনো বা সেমিজের আকার। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মধ্যপন্থী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সমস্ত ফ্যাশনের সঙ্গে একটা ব্যবহারিক সার্থকতা জড়িত আছে। কোটের নীচে সার্টের কলার যখন উল্টে দেওয়া হয়, সেটা কোটকে বাঁচাবার জন্যে। যখন হাফ-সার্ট বুশ-সার্ট হাওয়াইয়ান সার্ট-এর প্রচলন হয়, উদ্দেশ্য কাপড় ও টাই-কলার কমিয়ে খরচ বাঁচানো।

মেয়েদের পোষাকেও তাই। তাঁদের ব্লাউজের গলা আর

হাত ক' ইঞ্চি করে বছরে বাড়ে-কমে, তার সঠিক হিসেব রাখে মেটেবুরুজের দর্জি। আমরা শুধু দেখি। বর্তমানে হাতের বহর বাড়ছে! ওদিকে শাড়ীর বহর কমছে। এক দিকে বেশি কাপড়, তেরছা জোড়-সেলাই আর দর্জির মজুরী বাড়ছে। অপরদিকে পাড় কমানোর ঝেঁাকে খরচটা কিছু বাঁচছে। ব্যজেট হয়তো ঠিকই আছে। গহনার মধ্যে সাবেকি চাল এসেছিল দিনকয়েক। ঢেঁড়শ-তুল উঠে গিয়ে যখন সুন্দর কানপাশা এল, আর মফ্‌চেনের বদলে ছোট অথচ সুদৃশ্য নেকলেসের প্রচলন হ'ল, তখন অনেকদিন পরে রুচিবোধের পরিচয় মিলেছিল। এখন অন্য ফ্যাশন। খুব কম গহনা এবং হালকা ও সরু। সোনার দর যে রকম চড়া, তাতে চুড়ি পরার হাঙ্গামা উঠে গিয়ে দু'গাছি কঙ্কণ, রুলি অথবা বালা জাতীয় গহনা পরা হয়। এতে সোনা ক্ষয়ে যাবার আশঙ্কা কম। মোটামুটি বাহার এবং চাকচিক্য আর ব্যয়-সঙ্কোচ এবং উপকারিতার মধ্যে ব্যালেন্সটা বজায় আছে। কিন্তু বর্তনানে ছেলেদের পোষাকের মধ্যে এই ভার-সাম্যটা খুঁজে পাচ্ছি না। লম্বা পাত্‌লুনের ওপর দিয়ে ঝোলানো কিম্ভুতকিমাকার কামিজ আর পায়ে কাবলি চপ্পল জগা-খিচুড়ি বলেই মনে হয়।

কিছুটা অবশ্য ফ্যাশনের স্রোতে গা ঢেলে দিতে হয়। নহিলে ভদ্রতা-রক্ষা হয় না। যেটা সবাই মানছে ও করছে, সেটা মেনে নেওয়া এবং সেই মত চলা এক হিসেবে শান্তি ও নিরাপদ্ জীবনের অনুকূল। বিপরীত ধর্ম আচরণে খানিকটা উগ্র পৌরুষ দেখান যায়, হয় তো সস্তায় বাহবা মেলে। কিন্তু বেশি দিন এভাবে চালানো যায় না। ফ্যাশনের উল্‌টো পথে চলতে শুরু করলে লোকে কিছুদিন অবাক্ হয়ে দেখে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উদ্ভট, চালিয়াৎ কিংবা অসামাজিক বলে নিন্দা করে।

এইটেই হ'ল সাধারণ মনোভাব। এর মধ্যে সত্য আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু প্রত্যেক কথারই দুটো দিক থাকে। ফ্যাশন আর সামাজিকতার স্বপক্ষে যত যুক্তি দেওয়া যায়, তাদের বিপক্ষেও তেমনি অনেক কিছুই বলা যায়। চল্‌তি হাওয়া গায়ে লাগিয়ে কিছুদিন ভদ্র সাজা যায়। কাব্যে, সাহিত্যে অথবা শিল্পে যখন যেটা ধুয়ো ওঠে, সেই ধুয়ো ধরা এক হিসেবে জন-প্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু কতদিন? বিদেশের নজির উদ্ধৃত করবার দরকার নেই। কাছে পিঠে স্বদেশেই বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। এমন অনেক কবি অথবা সাহিত্যিক বাঙলা দেশে একদা চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলেছিলেন। কিন্তু ট্রামে-বাসে, সাহিত্য-

মজলিশে কিংবা পাড়ার বারোয়ারী বৈঠকখানায় একদিন যাদের রচনা নিয়ে অন্দোলন চল্‌ত, তাঁদের নাম আজ অনেকেই ভুলতে বসেছেন। কাব্য-সাহিত্য-শিল্পের সম্ভ্রম ও সমাদর অনেকখানি কমে গিয়েছে। বর্তমানে লেখার বাজার দমে গিয়েছে। সাহিত্যিকরা ঢিমে তেতালায় চলেছেন। পাঠকরা নিরুৎসাহ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশবাসীর মন বিভ্রান্ত। কাজেই বর্তমান যুগ সাহিত্য-চর্চায় তেমন উত্তেজনা বোধ করে না। স্বাভাবিক আগ্রহ নানা কারণে কমে গিয়েছে।

এ সমস্ত যুক্তি সত্য বলে মেনে নিলেও একটা মোদ্দা কথা বাদ পড়ে যায়। সেটা হচ্ছে এই, যে সাময়িক উত্তেজনায় অথবা সাময়িক ফ্যাশন কিংবা মতবাদের প্ররোচনায় কতিপয় সাহিত্যিক সুবিধা এবং সুযোগ-মাফিক তাঁদের লেখনী চালিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরা যবনিকার অন্তরালে সরে গিয়েছেন। জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি আর বিচার-ক্ষমতা যতই দুর্বল আর মূঢ় হোক্, এটাও ঠিক যে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের দানের মৌলিকত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং সরসতা স্বীকৃত হয়নি। ফ্যাশনের জোয়ার অন্তর্হিত হলে দেখা গেছে তাঁদেরও তিরোভাব ঘটেছে। কালের বিচারে, সাহিত্য-শিল্পের সূত্রনিরূপণে তাঁদের রচনা এমন কি পরবর্তী যুগেও গ্রাহ্য হয়নি। এর কারণ আর কিছুই নয়—ফ্যাশনের পরমায়ু দীর্ঘস্থায়ী নয়। ফ্যাশন-মাফিক দৃষ্টিও তাই স্বল্পায়ু।

সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি বড় বড় কথা যাক্। দৈনন্দিন

সাংসারিক অথবা সামাজিক জীবনেও কি আমরা এইটেই লক্ষ্য করি না? ঘরের আসবাব, বেশভূষা—সকল ব্যাপারেই সাময়িক রীতি ও বিন্যাসটাই আমাদের মেনে নিতে হয়। কিন্তু কেন? কি এমন সাংঘাতিক ভদ্রতা-বোধ, যার চাপে চেয়ারে টান্ হয়ে বসে থাকতে হবে? টেবিলে পা ঝুলিয়ে আড়ষ্ট হয়ে খেতে হবে অথবা প্রাচ্য শিল্পের নমুনামত পর্দার ছিট কিনতে হবে? কিংবা ছেলেকে শিশু-কবিতা আবৃত্তি করাতে হবে এবং মেয়ে হ'লে তার অপটু গান কিংবা ভারতীয় নৃত্যে অতিথিদের আপ্যায়িত করতে হবে? সভায় সমিতিতে কেনই বা প্রধান অতিথির গলায় মাল্য-দান করে' তাঁকে উজ্‌বুকের মতন স্বতন্ত্র আসনে চিহ্নিত করে বসিয়ে রাখতে হবে? কেনই বা প্রথমে উদ্বোধন সঙ্গীত আর তারপরে সভাপতির বক্তৃতা সুরু হবে? এই রকম কত উদাহরণ দেওয়া যায়।

তা ছাড়া, আরেকটা জিনিসের অত্যাচারও আমাদের প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয় এবং যতদিন আমাদের সমাজ থাকবে, ততদিন ভোগ করতে হবে। সেটা ফ্যাশনের মতই ঘাড়ে চেপে আছে—সামাজিকতার চাপ। ইংরেজীতে যাকে বলে 'সোস্যাল কল্'। কেউ আপনার বাড়ি এলে, আপনাকেও যেতে হবে তাঁর বাড়ি। তিনি যদি সস্ত্রীক আসেন, আপনাকেও তাই যেতে হবে। তিনি যেভাবে আপনাদের আদর-আপ্যায়ন করে-ছিলেন, আপনাকেও সেই মত সমাদর জানাতে হবে এবং দরকার হ'লে আরও বেশি মাত্রায়। সামাজিকতা একটা স্বাভাবিক

ভদ্রতা। এটা জানি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আদান-প্রদানের বালাই থেকে অনেক মনোমালিন্সের সূত্রপাত হয়। আপনি যতবার আপনার আলাপী এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গেছেন, ততবার যদি তিনি না আসেন কিংবা আপনার প্রচুর অবসরজাত পালিশ যদি তাঁর ব্যবহারে না থাকে, তা'হলে আপনার খারাপ লাগবেই, যেহেতু আপনার সামাজিক প্রত্যাশা তাঁর চেয়ে বেশি।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, অনেক সময়ে অনেক তুচ্ছ কারণে ভুল-বোঝা আর মনান্তর সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, শহরের এমন অঞ্চলে বাস করা উচিত যেখানে অত্মীয়স্বজন কম আছেন অথবা নেই। বন্ধু-ব্যক্তিরা আপনার সামাজিক ত্রুটি মাপ করে নিতে পারেন। তাঁদের কল্পনা ও সহানুভূতি আছে। আপনার সুবিধা-অসুবিধা, ব্যক্তিগত স্বভাব ও রুচিটুকু তাঁরা বুঝে নিয়ে অনেক সময়ে আপনার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ বোধ না করেও উল্‌টে আপনার কাছে আবার আসতে পারেন। কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্বের দল হয় নির্মম সমালোচক, নয় তো শ্লেষনিপুণ। তাঁরা ছেঁদো রসিকতা সুরু করেন, আপনাকে স্ত্রৈণ অথবা রসস্থ বলে অকারণ অপবাদ দেন। কিছু না থাকলে বর্তমানে আপনার আয়-বৃদ্ধি ও আর্থিক সচ্ছলতা নিয়ে খোঁটা দেন, ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা শোনান।

আমার নিজের অবস্থা এমনি হয়ে উঠেছে যে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, বিশেষ করে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে, যেতে রীতিমত

আতঙ্ক হয়। জানি, বাড়িতে গ্রেট্ ডেন কুকুর নেই। গেলে পরে চা ও প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হবে। কিন্তু এত কথা শুনতে হবে—বাজে ও কাজের—যে পা ওঠাতে ভরসা হয় না। এমনও হয় যে, ইচ্ছা করেই যাওয়া হয় না। নিছক্ আলসেমি করে শুয়ে-বসে থাকি, পড়ি, লিখি, সিগারেট খাই কিংবা শুধুই ভাবি। যদি অনেক দিন পরে হঠাৎ ইচ্ছা হয় একটু ঘুরে আসি, তখন মনে হয়—গেলেই তো সেই অজুহাত দেখাতে হবে! বেশির ভাগ সময়ে চুপ্ করেই থাকি। নীরবে অনুযোগগুলি মেনে নিয়ে শুনে যাই। জবাব দিই না। সত্যিই তো কোনো অছিলা-ওজর নেই! কাজের চাপ বেশি হলেও তার উল্লেখ করতে মন সরে না। তাহলে আত্মীয়-আত্মীয়ার দল হাঁ-হাঁ করে তেড়ে আসবেন; 'কাজ কি আর কেউ করে না? শত কাজ থাকলেও আত্মীয়দের খোঁজ নেওয়া কি একটা সাধারণ সামাজিক কর্তব্য নয়?'

আমি মনে-মনে ভাবি—আমার অনিচ্ছাকৃত অথবা আলস্য-জনিত কর্তব্যহীনতা সত্ত্বেও তো আমার আত্মীয়-স্বজন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে, বহাল-তবিয়তে বাস করছেন! তা'ছাড়া দেখাশুনো করার দায়িত্বটা কি একা আমারই? আমিই বা কেমন করে টিঁকে আছি অথবা আদৌ আছি কিনা—এ খবরটা কি তাঁরা এতোদিন চেয়েছেন বা নিয়েছেন? দেখ্ছি, ভবধাম ত্যাগ করে যাবার আগে আমার সামাজিক দায়িত্ব আর শিষ্টাচার পালন করে যথারীতি খবর জানিয়ে আসতে হবে: "আচ্ছা, এবার তা হলে উঠি।

লগ্ন উত্তীর্ণপ্রায়। আর বোধ হয় দেখা-শুনো করা সম্ভব হবে না। কিছু অপরাধ নেবেন না।" তারপর ফিরে এসে না হয় খাটে ওঠা যাবে।

বাস্তবিক, কথাটা আপনারা ভেবে দেখুন। প্রচলিত ফ্যাশন আর পুরানো সামাজিকতা, ভদ্রতা-রক্ষার প্রাণান্তকর বিড়ম্বনায় সাধারণ মানুষ কি বিষম হাঁপিয়ে ওঠে না? মনে হয় না যে, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বনে-জঙ্গলে একান্তে বাস করা ভালো? নিদেন পক্ষে, অজ্ঞাত-বাস? পরম-কর্তব্য-পরায়ণ এবং সামাজিক গৃহস্থ হয়েও কি আপনি সকলের, অন্ততঃ আত্মীয়-কুটুম্বদের, তুষ্টিসাধন করতে পারবেন, অন্ততঃ মুখ বন্ধ করতে পারবেন?

পারবেন না। বরঞ্চ তাঁদের তিক্ত-মধুর অনর্গল বাক্য-স্রোতে আপনিই হাঁ করে থাকবেন। সামাজিক কর্তব্যনিষ্ঠার সাময়িক খ্যাতির লোভে যদি এর পরেও আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যাবার ইচ্ছে থাকে, তাহ'লে আপনি নিতান্তই 'গ্রেট ম্যান'।

বর্তমানে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন নানাভাবে শুধু ক্লিষ্ট নয়, পিষ্ট। বাইরে সামাজিকতা, লৌকিকতার চাপ এবং ভদ্রতারক্ষা, শিষ্টাচার পালনের অর্থসাধ্য দায়িত্ব। আর ঘরে সুনির্দিষ্ট জীবনের আনুষঙ্গিক খরচ, সংসারের নানা রকমের টাল-বাহানা। ভদ্রজনোচিত বেশ-ভূষা, আহার-বিহার, শিক্ষা-দীক্ষা, পাচক-পরিচারক পালনের ব্যয়-সমস্যা। অথচ আয় সংক্ষিপ্ত এবং বাঁধা-ধরা। ব্যয়ের মাত্রা আয়ের অনুশাসন না মেনে ক্রমশই উচ্ছৃঙ্খল হতে থাকে। এ অবস্থায় মধ্যবিত্ত জীবনের যাবতীয় বিড়ম্বনা যদি একাধিকবার উল্লেখ করে থাকি, তা হলে বুর্জোয়' আখ্যায় চিহ্নিত হতে হবে, জানি। কিন্তু না করেই বা উপায় কি? যে দুর্বিষহ জীবন আর জীবিকার গোঁজামিলন-সমস্যায় আমাদের সমস্ত শক্তি আর উদ্যম নিযুক্ত হচ্ছে, তা থেকে একমাত্র মুক্তি লেখায় এবং কথা বলায়। তাও সময়ে সময়ে অচল হয়ে পড়ে। মনে যদি স্ফূর্তি না থাকে আর পেটে অন্ন, শিল্প-সাহিত্য চর্চা তখন শিকেয় ওঠে। আর বড় বড় কথা, বিশেষ করে জাতীয় উন্নয়ন প্রভৃতি গঠনমূলক বড় বড় গালভরা উপদেশ লাঞ্ছনাবাক্য হয়ে দাঁড়ায়। একজন বন্ধু সেদিন প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা দেখছেন, আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও ট্রামে-বাসে-বৈঠকখানায় আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের

নিয়ে যেমন আন্দোলন-আলোচনা চলত, এখন আর তেমন হয় না। আর সাহিত্যেও তেমন মৌলিক সুর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবই যেন বাসি। হয় অক্ষম অনুকরণ, নয় অনুবাদ। বেশির ভাগই 'ডেরিভেটিভ্'। তার ওপর চুরি, পরের লেখা ও ভাব একেবারে নিজের বলে চালান্ দেওয়া। কেন বলুন তো?"

এর উত্তর অবশ্য একাধিক রয়েছে। প্রশ্ন-কর্তার মূঢ়তা অথবা অন্ধতাও তাদের অন্যতম। কারণ সবচেয়ে যেটা সহজ এবং প্রকাশ্য সত্য, সেটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না অথবা চাইছেন না। ট্রামে-বাসে যে ধরণের আলাপ আলোচনা হয়, তার মধ্যে কাব্য-সাহিত্যের চর্চা বোধ হয় না করাই ভালো। সুতরাং তা যদি থেমে গিয়ে থাকে, তাতে কবি-সাহিত্যিকবর্গের উৎকণ্ঠিত হবার কারণ নেই। বরঞ্চ উল্লসিত হবার কারণ আছে। যেহেতু, উত্তেজনার মাথায় মারধোরের হাত থেকে তাঁরা একরকম বেঁচে গিয়েছেন। হাটে বাজারে যে ধরণের কথাবার্তা চলে, সাহিত্য বলতে সিনেমার গল্প এবং শিল্প-কলা বলতে ছায়াচিত্র-কলার যে আবেগময় আলোচনা হয়ে থাকে বেশ তারস্বরেই, তার সঙ্গে লেখক-শিল্পীর দল যদি একটু কম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন, তা হলে এক হিসেবে সেটা মঙ্গলেরই কথা।

কিন্তু অন্যত্র,—অর্থাৎ বৈঠকখানায় কিংবা সাহিত্য-মজলিশে কাব্য-সাহিত্য-প্রসঙ্গে যে উদাসীনতা বা শিথিলতা লক্ষ্য করি, সেটা নিয়ে জল্পনার অবকাশ আছে। অনেক কবি ও কথাশিল্পী এখন অনেকটা যেন আত্মগোপন করে আছেন।

কেউ বা কালে-ভদ্রে লেখেন, কারুর বা লেখার ধার কমে গেছে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কারণ একটা আছে অবিশ্যি। যাঁরা একদা সৌখীন সাহিত্যিক বলে নাম কিনেছিলেন কিংবা যাঁদের দু'একখানা বই নিয়ে একদিন ঘরে বাইরে বাদানুবাদ চলেছিল, তাঁদের কথা যে আজকাল তেমন শোনা যায় না, এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যে সব লেখকের মননশক্তির তীক্ষ্নতা ছিল কম, যাঁদের রচনায় সস্তা মাদকতা ছিল কিংবা একটা বিশেষ বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে যাঁদের লেখায় একটা চোখ-ঝলসানো দীপ্তি ছিল,—এক কথায় যাঁরা সাহিত্যের নিতান্তই বহিরঙ্গটা নিয়ে মেতেছিলেন, তাঁরা আপনিই পুনরাবৃত্তির জালে জড়িয়ে গিয়েছেন। কেননা, তাঁদের এমন কিছু বিশিষ্ট দান ছিল না যেটা পাঠক মনের কোণে কৃতজ্ঞচিত্তে সঞ্চয় করে রাখবে। যে মৌলিকতায়, চিন্তার কিংবা দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে, খাঁটি সাহিত্যের সর্বকালীন আবেদন সম্ভব হয়, সেটা নিশ্চয়ই তাঁদের রচনায় ছিল না। দু চারটে লেখা উতরে গিয়েছিল এই পর্য্যন্ত।

কিন্তু এ ছাড়া অন্য কারণও কি নেই, সামাজিক ও অর্থনৈতিক? দেশের যে বিশেষ অবস্থায় শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি, চর্চা ও সমাদর সম্ভব হয়ে থাকে তা নেই, এটা সহজ ও প্রত্যক্ষ সত্য। ভালো লেখকরা যে লিখতে উৎসাহ পাচ্ছেন না, কলম গুটিয়ে বসে আছেন সে কথা অস্বীকার করা চলে না। পূর্বে লেখার যে চাহিদা ছিল, বর্তমানে তার অভাব। বইয়ের বাজার অসম্ভব রকম খারাপ হয়ে গিয়েছে। দেশ-বিভাগ, লোকের মানসিক

অবস্থা, এবং বর্তমান সময়ের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ও অর্থ নৈতিক সঙ্কট এমন একটি শ্লাম্প সৃষ্টি করেছে যেখানে কাব্য-শিল্প-সাহিত্য এসে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। ভালো লেখক যে নেই কিংবা সকলেরই শক্তি ফুরিয়ে গেছে, এটা মেনে নিতে আমরা রাজি নই। সাময়িক পত্রিকার পাতায় কোনো-কোনো রচনা এবং দু'চারখানা ভালো বই আজও প্রকাশিত হচ্ছে। তবে কম। কবি-সাহিত্যিক যে সমাজ-সম্পর্কে অচেতন নন, সে কথাও বলা চলে না। বরঞ্চ সমাজই তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কম সচেতন, এমন কি উদাসীন হয়ে পড়ছে। যেখানে অন্নচিন্তা প্রধান এবং তারই আনুষঙ্গিক সমস্যায় জীবন কণ্টকিত, সেখানে সাহিত্যিকরা অকারণ ভাব-বিলাস কিংবা নিরর্থক আশাবাদ প্রচার করতে হয়তো কুণ্ঠিত। কারণ তাঁদের নিজেদের সমস্যাও আধ্যাত্মিকের চেয়ে জৈবই বেশি। ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির সম্মুখীন হয়ে তাঁরা কি করবেন, কোন্ পথ অবলম্বন করবেন, কি বিষয় নিয়ে লিখবেন সেটাও তাঁদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কাজেই সাহিত্য-সৃষ্টি আর সাহিত্যচর্চার যে পড়তি দশা, তার পিছনে একাধিক কারণ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে।

যুগ-সন্ধিক্ষণে এমনি হয়ে থাকে। বিগত যুগের পলিটিক্স, ইকনমিক্স আর জীবনের আদর্শ এবং বিচারের মানদণ্ড যখন ঘা খেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে, সাহিত্যও তখন রূপান্তরের প্রতীক্ষায় কিছুটা নীরব থাকে। কেউ কেউ বা অতিমাত্রায় মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু অধিকাংশ লেখকই এমন একটি লগ্নের অপেক্ষায় থাকেন যখন

তাঁদের শক্তি ও উদ্যম অব্যাহত প্রকাশে আপনাকে ছড়িয়ে দিতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে লেখকের যেমন দায়িত্ব আছে, লেখকদের সম্পর্কেও রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্বও তেমনি অবশ্য পালনীয়। এটা মনে রাখা দরকার যে, শতকরা নিরানব্বই জন কবি-সাহিত্যিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। কাজেই মধ্যবিত্তের সমস্যায় এবং চাপে তাঁরাও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপীড়িত।

অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি যখন নিজের ভারসাম্য খুঁজে পাবে, শ্রেণীগত এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যখন আর এত তীব্র থাকবে না, শিক্ষা এবং সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ আর মূল্য তখন নির্ধারিত হবে নূতন কালের নূতন বিচারে। তাদের অর্থকরী দিকটা তখন এমন উগ্র ও প্রকট হয়ে উঠবে না। জনসাধারণেরই চাহিদায়, রাষ্ট্রের নতুন ব্যবস্থায় ও সমাজের নিজস্ব একান্ত প্রয়োজনে, তাদের কদর আপনা থেকেই বাড়বে। বহু দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব কাটিয়ে একটি দেশ বেঁচে থাকে। ভাব ও কর্ম-জগতের বহু দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে মানুষ নতুন দর্শন ও সাহিত্যের সৃষ্টি করে। প্রগতির ধারা মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ হয়ে মজে যায়। আবার যুগান্তরের নতুন জোয়ার-জল মরা নদীর স্তিমিত জীবনে প্রাণসঞ্চার করে। সকল দেশের সভ্যতার ইতিহাসেই এ ব্যাপার ঘটেছে। আমাদের দেশেও তাই হয়েছে এবং হচ্ছে। এতে বিস্মিত ও চিন্তাকুল হয়ে ওঠবার কারণ নেই। দেশ স্বাধীন হলেও, নানা অধীনতার নানা শৃঙ্খল চেতনাকে আজও আচ্ছন্ন এবং বিভ্রান্ত করে রেখেছে, এইটাই হল অপ্রিয় সত্য।

এবার সাহিত্যিক চুরির কথা বলি।

ছাপাখানার দৌলতে ছাপা কথাটাই আজকাল বড় হয়ে উঠেছে। তাই ছাপা অক্ষরে যখন রায় বেরোয় "এটা ডাহা চুরি," তখন আমরা সেটা বিনা প্রশ্নেই মেনে নিই। মনে করি সমালোচকের পাণ্ডিত্য প্রচুর. সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ নেই। তিনি যখন নানা উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে সাহিত্যিকের মৌলিক প্রতিভার একান্ত অভাব এবং অন্যান্য লেখকের ভাব, ভাষা অথবা বক্তব্য বিনা স্বীকৃতিতে আত্মসাৎ করেছেন, তখন আসল লেখাটি না পড়ে এবং সত্যাসত্য না বিচার করেই আমরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি এবং তর্কের আসরে সে সিদ্ধান্তটা সজোরেই জাহির করি। বইয়ের সুলভ প্রসারে একদিকে আমরা যেমন লাভবান্ হচ্ছি, অপর দিকে তেমনি আবার ক্ষতিগ্রস্তও হচ্ছি। একদিকে দেশবিদেশের মনীষীদের চিন্তা ধারার সঙ্গে আমাদের যেমন আত্মিক যোগাযোগ ঘটছে, অপরদিকে ব্যর্থ অনুকরণে আর অপপ্রয়োগে সেই চিন্তাধারাকে আমরা বিকৃত ও খণ্ডিত করছি। অপরে যা বলে যাচ্ছেন, তা আমরা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নিচ্ছি এবং বেশির ভাগ পরের মুখে ঝাল খেয়ে অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। এটা চিন্তাশক্তির স্বাধীনতার পরিচয় দেয় না।

এই যে ভাবের ঘরে চুরি—এটা অবিশ্যি আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। খুব কম সাহিত্যিকই আছেন যাঁর মনের ওপর অথবা লেখার ওপর পূর্ব্বগামী অথবা সমকালীন কোনো সাহিত্যিকের প্রভাব পড়েনি একেবারে। এই সাহিত্যিক প্রভাবকে যদি কেউ চুরি বলে অভিহিত করেন, তা হলে অল্প-বিস্তর সমস্ত লেখকই চৌর্য্যবৃত্তি করেছেন, এ কথা বলতে হয়। জগতের সেরা কবি শেক্‌সপীয়রকেও এই অপবাদে অভিযুক্ত করা হয়েছে। বহু খ্যাতনামা সমালোচক অনেকখানি সময় ও শক্তি ব্যয় করেছেন এইসব কূট তথ্যগুলিকে খুঁজে বার করতে। কোন্ কোন্ নাটকের আখ্যানবস্তু কোন্ কোন্ মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া, তার তালিকাও তাঁরা অশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় নিয়ে তৈরী করেছেন। এমন কি কোন্ কোন্ জায়গায় শেক্‌সপীয়রের ভাষা পর্য্যন্ত মৌলিক নয়, কোন্ কোন্ বিশেষ বাক্যবিন্যাস তিনি মূল গ্রন্থ থেকে আত্মসাৎ করেছেন, তারও নির্ভুল নির্ঘণ্ট তাঁরা প্রস্তুত করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র মাত্রেই জানেন, এই লম্বা ফিরিস্তি কতো বিরক্তিকর এবং কাব্য রসের আস্বাদে বিঘ্ন ঘটায়। এইসব জার্ম্মন্ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন আজকের পাঠক ভুলতে চায়। টীকা-ভাষ্যের কণ্টকিত বেড়াজাল কাটিয়ে তারা উপভোগ করতে চায় শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য। ঐ সব সমালোচকের নাম সাধারণ পাঠকের কাছে অজানা। কাজেই সাহিত্যিক চৌর্য্য-অপরাধে অভিযুক্ত অমর কবির নিঃসংশয় প্রতিভাকে তারা অস্বীকার করতে শেখে না। শেক্‌স্‌পীয়রই প্রকৃতপক্ষে নাটকগুলি লিখেছিলেন, না

আর কেউ ঐ নামে লিখেছিলেন সে কথা নিয়েও তারা মাথা ঘামায় না। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে কে কতখানি ভাব ও ভাষা অন্য জায়গা থেকে আহরণ করল, সে প্রশ্নটা অবান্তর না হলেও এক-মাত্র মুখ্য প্রশ্ন নয়।

বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যিক চুরি জিনিসটা নিয়ে বেশ একটু বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে। শিল্প, কাব্য ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই চুলচেরা বিচার আর আঙ্গুল গুনে হিসেব মিলিয়ে কে কার কাছে কতোখানি নিল, তারি বিস্তারিত ইস্তাহার বেকার মস্তিষ্কের কাছে খুব রুচিকর হলেও সাধারণ রসজ্ঞ পাঠকের কাছে অপ্রীতিকর। সাহিত্যিক চুরি জিনিসটা ভালো অথবা অপরের ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে আপনার প্রতিষ্ঠা জাহির করা নীতিসঙ্গত, এ কথা বলছি না। কিন্তু তাই বলে রচনায় ভাব ও ভাষার এত-টুকু সাদৃশ্য থাকলেই সেটা সাহিত্যিক চুরি হয়ে গেল, এমন কথা বলা ন্যায়-সঙ্গত নয়। একই সময়ে অথবা একই সামাজিক কাঠা-মোর মধ্যে বাস করে যদি একজন সাহিত্যিক আরেকজনকে প্রভাবিত করেন, সেটা কিছু বিচিত্র নয়।

এটা প্রায়ই দেখা যায় যে বিদেশী লেখকের রচনা থেকে অনেক সময়ে কোনো বিশিষ্ট বক্তব্য অথবা ভাবধারা গ্রহণ করা হয়েছে। এটা কিছু মারাত্মক নয়। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কবিতায় যদি শেলি-কীট্‌স্‌-টেনিসন ব্রাউনিং-এর আভাস-গত সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তার মানে কখনোই নয় যে তিনি জ্ঞাত-সারে উক্ত কবিদের ভাব আত্মসাৎ করেছেন। কারণ ঐ সকল

কবিদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভা কোন অংশেই কম নয় আর ভাব-জগতেও তাঁর নিজস্ব দান বোধ করি ঐ সকল কবির সমবেত মননশক্তির চেয়ে কম নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র "দুর্গেশনন্দিনী" লেখার পূর্ব্বে স্কটের "আইভ্যান হো" পড়েছিলেন কিনা, সেটাও এই রকম অলস অনুমানের কোঠায় পড়ে। যদি পড়েই থাকেন, সে খবরে আমাদের সাহিত্যিক কৌতূহল কিছুটা তৃপ্ত হতে পারে বটে। কিন্তু সাহিত্যের মানদণ্ডে সে প্রশ্নের গুরুত্ব তেমন কিছু নয়। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' লেখার আগে বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের লাইব্রেরি থেকে 'আইভান হো' নিয়ে পড়েছিলেন এবং ঠিক তার কতোদিন পরে তাঁর উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়, এ সংবাদগুলো সাহিত্যের ইতিহাসে ইনটেরেসটিং ডক্যুমেণ্ট, এই পর্য্যন্ত। কারণ আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, দুর্গেশনন্দিনী সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে সার্থক কি না। গল্পের বিষয়বস্তু, আখ্যানভঙ্গী, ভাষা, আঙ্গিক, এগুলিতে তাঁর নিজস্ব কৃতিত্ব কতখানি সেইটেই বড় কথা। গল্পাংশ কতখানি ধার-করা আর কতখানি নিজস্ব কল্পনা-প্রসূত, সেই প্রশ্নের ওপরই কি নির্ভর করছে বঙ্কিমের সৃজনী শক্তি, তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা?

সাহিত্যিক ঋণ-সম্পর্কে একটা মোটা কথা যদি আমরা মনে রাখি, তা হলে অনর্থক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় না। বিনা স্বীকৃতিতে ভাব ও ভাষা আত্মসাৎ করা এক জিনিষ আর অল-ক্ষিতে অথবা জ্ঞাতসারে অপরের একটি ভাবপুষ্ট ধারাকে অবলম্বন

বা অনুসরণ করা আরেক জিনিস। যিনি প্রথম কাজটি করেন, তাঁকে চৌর্য্য-অপরাধে অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু যিনি শেষোক্ত কাজটি করেন, তাঁর শিল্প-কৌশল অস্বীকার করা যায় না। বিদেশী মনীষীদের রচনার সঙ্গে যে সাহিত্যিকের প্রকৃত পরিচয় আছে, তাঁর রচনায় তাঁদের প্রভাব অথবা ছায়াপাত হলেই সেটা ইচ্ছাকৃত আত্মসাৎ করা হয়েছে, বলা চলে না। বরঞ্চ পাঠকের ও সমালোচকের দেখা উচিত যেটুকু সাদৃশ্য, তার চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া গেল কি না। লেখকের নিজস্ব মননশীলতার কোনো পরিচয় কিছু আছে কিনা এবং আপাতদৃশ্য সাহিত্যিক প্রভাবের অতিরিক্ত কিছু তিনি দিতে পেরেছেন কি না। তা যদি তিনি দিতে পেরে থাকেন, তা হলে তাঁর হাতে 'প্লেজিয়ারিজ্‌ম্‌' আর্টের পর্য্যায়ে উঠেছে।

একটা ধারণা আছে যার বশবর্ত্তী হয়ে আমরা অনেক সময়ে সাহিত্যিক মতামত দিয়ে থাকি। স্বদেশের কোনো কবি বা লেখকের সঙ্গে বিদেশী লেখক বা কবি-বিশেষের তুলনা অথবা প্রতি-তুলনা করতে আমরা ভালোবাসি। তাই বঙ্কিমের সঙ্গে স্কট্, মাইকেলের সঙ্গে মিল্‌টন নামগুলো জড়িয়ে আমাদের মনে বসে গেছে। কিন্তু মাইকেল মিল্টন থেকে কতখানি নিলেন আর নিজেই বা কতখানি দিলেন, বঙ্কিম স্কটের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হলেন আর কতটাই বা বিশুদ্ধ সাহিত্যশক্তি ও নিজস্ব কল্পনার পরিচয় দিলেন,—সে প্রশ্নগুলি অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায়।

সাধারণ চুরির মত সাহিত্যিক চুরির মধ্যেও "মোটিভ্" অর্থাৎ উদ্দেশ্যটাই হ'ল আসল কথা। ফৌজদারী মামলায় আসামীর মতলবই প্রধান বিচার্য্য অর্থাৎ প্রতারণার অভিপ্রায়টাই হ'ল অবৈধ কাজের ভিত্তি। তেমনি যদি কোনো সাহিত্যিক অপর কোনো সাহিত্যিকের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আমরা চুরির অপবাদ আনতে পারি না। কিংবা ধরুন, একজন লেখক বাংলাদেশে বসে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে আপনার ভাষায় একটি আখ্যান রচনা করলেন আর সেই আখ্যান-বস্তুর সঙ্গে বিদেশী কোনো লেখকের রচনার আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া গেল। তা হলে কি আমরা এই কথা ভাব্বো যে একজন অপরজনকে স্বেচ্ছায় অনুকরণ করেছেন? শরৎচন্দ্রের 'দত্তার' সঙ্গে টমাস্ হার্ডির 'ট্যু অন্ এ টাওয়ার' উপন্যাস খানির জায়গায় জায়গায় মিল রয়েছে। তার মানে কি এই যে শরৎচন্দ্র হার্ডির উপন্যাসখানি বাংলায় রূপান্তরিত করে নিয়েছেন? দু'জন মনীষী লেখক একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে একই চিন্তা-পদ্ধতি বা শিল্প-কৌশল অনুসরণ করতে পারেন—এই সরল সত্যটা কি একেবারে অবিশ্বাসযোগ্য? ভিক্টর হিউগোর ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, সিংহরা পরস্পর অনুকরণ করে না। সাদৃশ্যটা সমধর্ম্মী বলেই স্বাভাবিক।

তবে—যেখানে উদ্দেশ্য হ'ল স্পষ্ট আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিনা স্বীকারে অপরের ভাব ও ভাষা এমন কি সমগ্র বক্তব্যটাই আত্মসাৎ করা,—সেখানে সাহিত্যিক চুরিটা নিতান্তই চুরি। স্বপক্ষে বলার

কিছুই নেই। যাকে বলা যায়, হাতে-নাতে ধরা পড়া, সে জায়-গায় কোনো ওকালতিই চলে না। এবং সে কাজ যে অতি ঘৃণ্য, এ কথা শুধু পাঠক নয়, সমালোচক ও সমধর্ম্মী সাহিত্যিক মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। কারণ সেখানে উদ্দেশ্য পুরোপুরি অসাধু, আত্মস্ফালনের কোনো কৈফিয়ৎ খাটে না। "বিদেশী গল্পের ছায়া-অবলম্বনে রচিত"—এ স্বীকৃতি যেখানে নেই, সেখানে সমালোচককে বাধ্য হয়েই নির্ম্মম হতে হয়। আজকাল বিদেশী রচনাকে মার্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত করে অনেক সাহিত্যিক বাংলায় রূপান্তরিত করেন। যদি প্রকাশ্যে সে কথা স্বীকার করা হয়, তা হলে দোষ নেই। কারণ বিদেশী আঙ্গিকে লেখা রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা নিন্দনীয় কাজ নয়। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ স্বীকার থাকে না। থাকলে লেখকের সততার পরিচয় পাওয়া যায়। না থাকলে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ-প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সাহিত্যিক পুরানো অথবা অখ্যাত কোনো স্বদেশী অথবা বিদেশী সাময়িক পত্রিকা থেকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের খোরাক, এমন কি তার ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করেছেন এবং নিজের নামে সেগুলি চালাতে কিছু-মাত্র লজ্জিত হন নি। হয় তো ভেবেছিলেন যে এ নিয়ে কেউ কোনো দিন মাথা ঘামাবে না। কিন্তু দেখা গেল, কোনো এক শ্যেন দৃষ্টিতে সে চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পড়েছে। বলা বাহুল্য, এরকম সাহিত্যিক কেলেঙ্কারি চিরকালই নিন্দনীয়। সাময়িক পত্রিকা-

গুলোর পাতা ওল্‌টানো যাঁদের অভ্যাস আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমাদের দেশে তথাকথিত বহু সাহিত্যিকই এ কাজ করেছেন এবং এখনও করে থাকেন। এ আচরণ কতটা গর্হিত তা বোধহয় তাঁরা ভেবেও দেখেন না। কিছু দিন ডামা-ডোলের মধ্যে সস্তায় বাহবা পেলেও শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়তে হয় এবং নিজের নামটা ছাপা অক্ষরে দেখবার মোহ খুব রূঢ় ভাবেই আঘাত পায়। এখনও এমন লেখক আছেন আমি জানি, যাঁদের কোনো-কোনো রচনা আজও ধরা পড়েনি। জেরোম-কে-জেরোম্, জেকব্‌স্ অথবা অলড্যাস্ হাকসলির কোনো কোনো প্লট ভাষাশুদ্ধ আত্মসাৎ হয়ে গেছে, যা আজও নির্ব্বিবাদে মৌলিক রচনা বলেই বাংলা সাহিত্যে গ্রাহ্য হয়েছে। হয় তো কালের দরবারে একদিন এসব ঝুটো রচনার যথার্থ মূল্য আবার নির্দ্ধারিত হবে। তখন নিরপেক্ষ বিচারে তাদের হেয়তাই প্রতিপন্ন হবে।

'সাহিত্যিক চুরি'—এই কথাটির মধ্যে ছুটি বাক্যের সংযোজনা রয়েছে, সেটা নজর করতে হবে। প্রথমটি হচ্চে 'সাহিত্যিক' অর্থাৎ আমাদের বিচার্য্য হচ্ছে, সাহিত্য-জগতে এটা ঠিক চুরি কিনা। এটি শুধু অজ্ঞাত প্রভাব, সাহিত্যিক সমীকরণ না কি অসৎ উদ্দেশ্যে হুবহু অনুকরণ কিংবা অপহরণ। আর দ্বিতীয় কথাটি হচ্চে—চুরি। অর্থাৎ চুরিটা পুকুর-চুরি কি না! আশা করি আপনারা সবাই বুঝেছেন এ ছুটি কথার তাৎপর্য্য। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়—সাহিত্যসংক্রান্ত সব চুরি ঠিক সাহিত্যিক চুরি নয়। কারণ সে কাজটি সত্যিই দুরূহ। সত্যিকারের সাহি-

ত্যিক চুরিতে নিপুণ হাতসাফাই-এর দরকার। সাময়িক সাহিত্য পত্রিকায় আমরা হামেশাই যে চুরির সংবাদ পাই, সেটা সাহিত্যিক চুরি নয়। নিতান্তই খেলো অক্ষম নকলিয়ানা, আনাড়ীর কাজ। তার পিছনে কোনো সাহিত্যিক শক্তিরই পরিচয় মেলে না।

কিন্তু ভাবের ঘরে সিঁদকাটি দেওয়া, সন্তর্পণে অপরের চিন্তার সঙ্গে আপনার চিন্তার অবাধ, সূক্ষ্ম ও সুচারু সংমিশ্রণ করে নেওয়া—সেইটেই আসল সাহিত্যিক চুরি। এ কাজে চাই আশ্চর্য্য দক্ষতা, পাকা কলম, হুঁসিয়ার মনের পরিচয়। জগতের বহু নাম-করা প্রথম শ্রেণীর লেখক এ কাজ করেছেন এমন কৌশলের সঙ্গে, এমন শিল্পসম্মত উপায়ে, যে তাকে চুরি বলতে কেমন যেন মন কেমন ক'রে। নিপুণ রিপু-কর্ম্মের মত চিকণ সেই কাজ। এই হিসেবে প্লেজিয়ারিজ্‌মও বিশিষ্ট আর্ট এবং আর্টের যা দাবি, তা সে অনায়াসেই করতে পারে।

যে চোখ দিয়ে আমরা সংসার ও সমাজ দেখি, সে চোখ দিয়ে কি আমরা মেয়েদের দেখি বা বুঝি? এক মহিলার এই প্রশ্নে কিছুটা বিচলিত বোধ করছি।

পুরুষের চোখ দিয়েই তাঁদের দেখি ও বুঝি, মানে বোঝবার চেষ্টা করি—এটা সত্য। কিন্তু দেখা কাজটি কি অতই সোজা, অন্ততঃ ঠিক মত দেখা? যদি বা দৃষ্টিটা সহজ ও সরল হয়, তার মধ্যে অনেক পূর্বার্জিত ধারণা এবং বিশেষ ও ব্যক্তিগত মানসিকতার আভাস এসে যায়। যেতে বাধ্য। কেন না দৃষ্টিটা চোখের এবং সে চোখ ঠিক পদ্মপলাশজাতীয় না হলেও তার মালিকের একটি মন আছে—যে মন মোহাবিষ্ট, স্বপ্নালু আবার তীক্ষ্ম এবং বাস্তব হতেও পারে। মেয়েদের মেয়েলি দৃষ্টি দিয়ে দেখা যখন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী আর দৃষ্টিকোণ থেকেই তাদের দেখতে হয়।

আমাদের দৃষ্টির লক্ষ্য বস্তু নারী সত্যিই কিছু পরিমাণে হেঁয়ালি। জগতের কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক নারীর রূপবন্দনায় মুখর হয়েছেন। শাস্ত্রকারেরা স্বরূপ-বর্ণনে গলদঘর্ম হয়ে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টির অগোচরে অদৃষ্টের সঙ্গে তাকে এক পর্যায়ে ফেলে দিয়ে দায়িত্ব এড়িয়েছেন। কিন্তু অলঙ্কার আর দার্শনিকতার

কথা ছেড়ে দিই। নারীর অন্তরঙ্গ আর সামাজিক রূপ, তার ভিন্নমুখী মন ও প্রতিভা, তার সহজ অথচ কিছুটা দুর্বোধ্য চরিত্রে অর্ধেক সঙ্গতি আর অর্ধেক অসঙ্গতি, অর্ধেক মানবীত্ব আর অর্ধেক কল্পনার সমাবেশ—এই সব কথা মনে পড়লেই বিষয়টার গুরুত্ব যেন আরো বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই ভাবছি—অল্প কথায় কি বলা যায়!

পুরুষের চোখ যে কিছু পরিমাণে বাঁকা এবং দৃষ্টিটাও একটু তেরছা, সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু বাঁকা চোখে দেখলেও সে দেখায় সব সময়ে ঝাঁঝ অথবা অবিচার থাকে না—এটাও বলা দরকার। যেটুকু বিদ্রূপ অথবা বক্র দৃষ্টি, সেটুকু আমাদেরই সমাজশিক্ষার দোষে। নারীর দিকে অকুণ্ঠ ও অসঙ্কোচ চাউনি ফেলতে আমরা জানি না কিংবা পারি না। তাই তির্যক্ দৃষ্টিতে এক চট্‌কা যতটুকু দেখে নেওয়া যায়, সেইটুকুই পুরুষদের সম্বল। নারীর অপাঙ্গ দৃষ্টি ও কটাক্ষ-পাতে সারা দুনিয়া ধরা পড়তে পারে, কিন্তু পুরুষের চোখ তীক্ষ্ণ হলেও তেমন নিপুণ-কোমল নয়। তাই তার দৃষ্টিতে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, ভুল ত্রুটি হয়, অন্যমনস্কতার ফলে গলদ ঘটে এবং গঞ্জনা শুনতে হয়—'চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ!'

নারীকে পুরুষ দেখে ঘরে ও বাইরে। বাইরের যে রূপ, নারীর সমাজ-জীবনে সেটি ফুটে ওঠে। আর ঘরের মধ্যে পুরুষ নারীকে যে চোখে দেখে, তাও অজানা নয়। ঘরের আর বাইরের মিলিত চেহারাই হল নারীর পরিপূর্ণ পরিচয়। পুরুষ যখন ঘরের

দিকে দৃষ্টি দেয়, তখন ভালো-মন্দ দুই-ই দেখে। দেখে সংসারে সব ঠিক আছে কি না, কোনো অসুবিধা বিশৃঙ্খলা হচ্ছে কি না। সংসারে পুরুষ কর্তা হয়েও কর্তা নয়। কাজেই পুরুষের চোখ যদি বেশি মাত্রায় সজাগ হয়, ছোটো-খাটো জিনিসে নজর দেয় বেশি, সমালোচনায় উন্মুখ হয়ে ওঠে, তা হলে কর্মরত গৃহিণীর প্রতি সুবিচার ও সহানুভূতি হয় না। যে পুরুষ সাংসারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন বেশি, তাঁর অকারণ কর্তৃত্বে নারী তুষ্ট হতে পারে না। ভাঁড়ার ভৃত্য ও সংসারের পরিচালনা নিতান্তই নারীর নিজস্ব এলাকা। যে পুরুষ দেখেও দেখেন না, বুঝেও না বুঝবার ভাণ করেন, আপনার স্বভাব, চাল-চলন নারীর ইচ্ছা ও রুচিমত চালিত করতে অনিচ্ছুক হন না, সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে জানেন, নারী তাকে আপনার প্রিয় সম্পত্তিবোধে আরও কাছে টেনে নেয়—এই রকম শোনা যায়। কোনও কোনও বিবাহিত বন্ধু বলেছেন, আগে তাঁরা চায়ে মিষ্টি খেতেন কম, আলুভাজা নরম ও মোটা পছন্দ করতেন, মাংসের সঙ্গে পায়স একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এখন সে সব ব্যক্তিগত রুচি ও পৈতৃক স্বভাব পালটে গিয়েছে। তবে এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যেও নাকি একটা গভীর তৃপ্তি আছে।

পুরুষের চোখে কর্মিষ্ঠা মেয়েদের কদর বেশি। নীরবে স্মিতমুখে, কাজ করার বিজ্ঞাপন না দিয়ে, যে মেয়ে আপন মনে কর্তব্য করে যায়—তার নিপুণ গৃহসেবার মাধুর্য পুরুষের চোখে

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আনে—এটা ঠিক। কিন্তু পুরুষের চাহিদা এমনি মজার যে অতিরিক্ত কাজ করে যখন মেয়েরা শরীর নষ্ট করে ফেলে সাধারণ অঙ্গ-সজ্জায় উদাসীন হয়ে ওঠে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না, তখন পুরুষেরই মোহদৃষ্টি যায় কমে। কিন্তু পুরুষের কাছে নারীর যে রূপটি বড় ও কাম্য পরিচয়, সেটা পাওয়া যায় সমাজ-সংস্পর্শে। নারীর কোন্ বিশেষ চেহারা পুরুষের মনঃপূত, এ নিয়ে অবিশ্যি জোর করে কিছু বলা চলে না। প্রত্যেকেরই আদর্শ এবং ধারণা ব্যক্তিগত। তবু মোটামুটি বলা চলে, আতিশয্যহীন অনাড়ম্বর আচরণ, স্নিগ্ধ কথাবার্তা, সহজ অমায়িকতা এবং কিছুটা সুশ্রী এবং বুদ্ধিমান্ সমাজ-বোধ পুরুষের কাছে প্রশংসাসূচক সম্মতি পেয়ে থাকে।

পুরুষের চোখে নারীর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, মহিমা যেমনভাবে কীর্তিত হয়েছে, পুরুষ যেমন কাব্যে, শিল্পে ও সাহিত্যে নারীর আদর্শকে অমর করে রেখেছে, নারী কিন্তু পুরুষকে ততখানি দাম দেয় নি—এ কথা স্বীকার করতে হবে। কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিরা নারীর রূপ ও দৃষ্টি, মনস্তত্ত্ব আর মূল্যবোধ, রুচি আর পছন্দ নিয়ে যতটা শক্তি ও সময় ব্যয় করেছেন, তাতে অনেকগুলি মহাকাব্য রচিত হতে পারত। কেউ বা দেখেছেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। কেউ বা স্তবগান করেছেন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের। কেউ বা কামনা করেছেন শুদ্ধসত্ত্বা, ত্যাগশীলা প্রেমিকা, সচিব আর প্রিয় শিষ্যার সুমধুর সমন্বয়। আবার কেউ বা বধু, মাতা, কন্যা হিসেবে নারীর

সকল পার্থিব পরিচয় অতিক্রম করে নন্দনবাসিনীর রূপ-সৌন্দর্যের একটি প্রতিমূর্তি খুঁজেছেন। কেউ বা নিছক স্তুতিবাদ করেছেন যখন কথা গেছে ফুরিয়ে—'সঙ্গীতময় শরীর তব।'

কিন্তু এ তো গেল কবি-পুরুষের সৌন্দর্য-পিপাসু, রসজ্ঞ সন্ধানী দৃষ্টি, যেখানে ঘনিয়ে আছে আদর্শবাদের মোহ। এ মোহটাও মিথ্যা নয়, অবান্তর নয়। কাব্যের পাতার বাইরেও, ছবির তুলির সীমা ছাড়িয়েও এ চোখের দৃষ্টি গিয়ে পৌছয় একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অনুভূতিতে। তারও দাম আছে। কিন্তু বিপদও আছে সেই সঙ্গে। পুরুষের দৃষ্টি যতটা সরল, যতটা মোহময়, যতটা সৌন্দর্য-আকুল, তার আঘাত পেয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসার আশঙ্কাটা ততই বেশি। যেখানে আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশার অধীরতা, সেখানে স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা অনিবার্য।

পুরুষের চোখে এই যে আদর্শবাদী দৃষ্টি, তার ঠিক উল্টো হল রোমান্সলেশ-বর্জিত অতিমাত্রায় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। যে পুরুষ দেহাত্মবাদী, যিনি নারীকে মাত্র নারী হিসেবে দেখেন অর্থাৎ জীবন-বিলাসের প্রধান উপকরণ বলে মনে করেন, যাঁর চোখে রোমান্সের একটুও ফিকে রং ধরে না, তিনি জীবন-শিল্পের অর্থ জানেন না, এটা স্বীকার করতেই হবে। পুরুষের চোখে এই স্থূল জড়বাদের দৃষ্টি কখনও কখনও নারীবিশেষের কাছে লোভনীয় ঠেকেছে, এমন দেখা যায়। কিন্তু মোটের ওপর এই দৃষ্টি ও মনোভাব শ্রদ্ধার বস্তু নয়। আমার মনে হয়, সেই পুরুষের

চোখে নারীর সত্যিকারের ছবি ফুটে ওঠে, যাঁর এক চোখে আছে আবেশ, অন্য চোখে আছে বিচার।

কিন্তু পুরুষের চোখে তো ক্যামেরার চোখ নয় যে নিখুঁত ছবিখানি ধরে নিতে পারে। তা যদি পারতো, তা হলে এত ভিন্ন ধরণের চিন্তা ও জল্পনা, এত বিভিন্ন ধরণের মতবাদ ও জীবনদর্শন ঐ একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠ্‌ত না। পুরুষ যখন দেখে, চোখ দিয়েই দেখে। কিন্তু দ্রষ্টব্য চোখের গভীরতায় নারীর যে গোপন, নিজস্ব সত্তা ছায়ার মত লুকিয়ে খেলে যায়, পুরুষ অনেক সময়ে সেটি ধরতে পারে না।—ধরা সম্ভব নয়। তা যদি পারতো, তা হলে নারীর মায়াময় ব্যক্তিত্বের কাছে কোনও সময়েই পুরুষের কঠিন বিচারবুদ্ধি পরাস্ত হত না। আত্মসমার্পণও অনেক ক্ষেত্রে এত সহজ ও সম্পূর্ণ হত না। অপরপক্ষে, অভিজ্ঞ দৃষ্টিপাতে পুরুষকে মোটামুটি বুঝে ও চিনে নিতে নারীর তেমন অযথা বিলম্ব হয় না। কিন্তু বাস্তব জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও একটি পরিচিতা নারীর স্বরূপটুকু পুরোপুরি চেনা পুরুষের সাধ্য নয়। স্বামী ও প্রণয়ী যে চোখে দেখেন স্ত্রীকে ও প্রেমিকাকে, সে চোখে পাওয়া যাবে হয়তো ভীতিমিশ্রিত প্রীতি অথবা আপনার বঞ্চিত বাসনা ও কল্পনার প্রতিফলন। সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ও সত্য পরিচয় নয়।

তাই এত বিশ্লেষণের ঘটা, নারীকে নিয়ে এত বিচার সমালোচনার আয়োজন। নারী সমালোচকের দৃষ্টি পছন্দ না করতে পারেন। কিন্তু সমালোচনার অর্থতো পরচর্চা নয়, ছিদ্রান্বেষী

মনের গবেষণা নয়, তিক্ত এবং বিদ্বেষী মনের বিকৃত বিচারও নয়। পুরুষের দৃষ্টিতে যদি কিছু সমালোচনার স্পর্শ থাকে, তা একটি জটিল তর্কবস্তুর প্রতি স্বাভাবিক কৌতূহল ও আসক্তি। শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির চোখে যে বিশ্লেষণ, বিচার ও স্বীকার, সেইখানেই আছে নারীর কল্যাণকর মূর্তির আবিষ্কার-চেষ্টা। পুরুষের চোখ দিয়ে সেই চেষ্টাটুকুই সার।

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টি, তাদের সমাজ-সম্পর্ক নিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। জীবনের এত জটিল ও বৃহৎ সমস্যা সামনে রয়েছে যে সেগুলির চিন্তাতেই এবং উপায়-প্রতীকার সন্ধানের চেষ্টাতেই মানুষের অধিকাংশ সময় ও উদ্যম খরচ হয়ে যায়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, রাষ্ট্রনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সমস্যা যতই তীব্র হয়ে দেখা দিক্, সমাজের অন্যান্য অনেক সমস্যা আছে যেগুলির সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। নারী ও পুরুষ, ছাত্র ও শিক্ষক, ধনিক ও শ্রমিক—এদের সমস্যাগুলো ঠিক একজাতীয় না হলেও সমাজ-গঠনের সঙ্গে অর্থনীতির অদৃশ্য সূত্র লেগে রয়েছে।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা কালগুণে বর্তমান যুগে নিছক্ 'কমার্শিয়াল' অথবা ব্যবসায়িক সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছে। শাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তা অতি নিকট 'শোণিত-শুক্রের' সম্পর্ক বলেই কীর্তিত হয়েছে। সেকালের গুরু-শিষ্য, সেকালের সমাজ ও জীবনাদর্শ বর্তমানে অচল এবং ভিন্ন পরিবেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যাওয়া বাতুলতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা-সমস্যার কথা উঠ্‌লেই এই সমস্যা-প্রশ্নটি স্বতই মনে পড়ে।

আজকাল যা কিছু গণ্ডগোল হোক্, সমাজ নির্বিবাদে সেটিকে

ছাত্রদের স্কন্ধে চাপিয়ে দেয় এবং শিক্ষকদেরও কিছু পরিমাণে দায়ী করে। ছাত্র-শিক্ষকের যে দেশের ও সমাজের প্রতি কোনও দায়িত্ব নেই, এ কথা অবশ্য মূর্খও বলবে না। কিন্তু যে বিশেষ কারণে, অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থায়, বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটি স্মরণ না রাখলে কোনও পক্ষেরই প্রতি সুবিচার করা যাবে না। পুরাতন কালে সমাজ-নেতা, ভূস্বামীরা সমাজধর্ম্ম পালন করতে পশ্চাৎপদ হন নি। দেশের শিক্ষা-দীক্ষার আর্থিক দায়িত্ব অনেকখানি এঁরাই বহন করে এসেছেন। তাই অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা নির্বিবাদে, নিশ্চিন্ত একাগ্রতায় সম্পন্ন হতে পারত। প্রাচীন যুগে সিনেমা আর পলিটিক্স্ ছিল না, এইটাই একমাত্র সুশৃঙ্খল জীবনের কারণ নয়। যদি বর্তমানে চঞ্চল তরুণ-জীবনের মধ্যে অনুচিত উচ্ছৃঙ্খল ভাব এসে থাকে, যদি তাদের চরিত্রে প্রকৃত শিক্ষা, নীতি ও সংযমের অভাব ঘটে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে আমাদেরই সমাজ-বনিয়াদে, জীবন-আদর্শে, জীবিকা-নির্বাহের কার্যকরী পন্থায় বড় রকমের গলদ দেখা দিয়েছে। বর্তমান ছাত্র-সমাজ এবং তরুণ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর তাদের গুরুস্থানীয় ব্যক্তির ওপর কয়েকটি বড় বড় অভিযোগ চাপিয়ে দিলেই সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাদের কর্তব্য শেষ হয় না। কোনও কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটলেই, 'আজকালকার ছেলে-মেয়ে,'—'যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে' ইত্যাদি কয়েকটি ছেঁদো কথায় ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যায় বটে। কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। তার জন্যে অপ্রীতিকর কথা শোনাও দরকার।

প্রশ্ন হচ্ছে, তরুণদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কি এবং তারা সত্য কিনা। ছাত্র অথবা তরুণদের স্বাতন্ত্র্যাভিলাষই যদি আমাদের অরুচিকর ঠেকে, তা হলে অবশ্য বলবার কিছু থাকে না। কারণ অপরের, বিশেষ করে, বয়ঃকনিষ্ঠদের বক্তব্য আর ব্যক্তিত্বকে প্রসন্ন মনে অঙ্গীকার করে নিতে কোনও যুগই পারে না। তা করতে হলে যে উদার মনোভাব ও কল্পনার প্রয়োজন, তা অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিরই নেই। যদি থাকতো, তা হলে নারী-পুরুষ, ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক-তরুণসম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিরোধ থাকতো না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, আজকালকার ছেলেমেয়ের আচরণে, কথা-বার্তায় যে সংযম ও শালীনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়, তার জন্যে আসলে দায়ী কে ? যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন ঘটে, তখন তরুণরা বীর, শহীদ্ বলে অর্ঘ্য পায়। যখন রাজনীতির দাবা খেলায় চাল অচল, কিংবা অন্য চালের প্রয়োজন হয়, তখন নিরীহ বোড়েগুলিকে আবার নতুন ধুয়োয়, নতুন সাজে বসাতে হয়। ১৯২০ থেকে আজ পর্যন্ত গত তিরিশ বছর ধরে ছাত্র-সমাজের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। বহু আন্দালনে তারা অগ্রণী ছিল এবং বহু শিক্ষক অধ্যাপক তাদের সঙ্গে অংশ-গ্রহণ করেছেন। তখন এ সব প্রশ্ন ওঠেনি। আইন অমান্য আন্দোলন করতে করতে তারা নিজেও যে একদিন বে-পরোয়া, বে-আইনী মনোভাব অর্জন করে নেবে, এই স্বাভাবিক চিন্তাটি আমাদের মাথায় উদয় হয়নি। চেয়ার-বেঞ্চি ভাঙ্গা, মিটিং ভাঙ্গা,

ট্রাম-পোড়ানো প্রভৃতি কাজ একদিন যে মাথা-ভাঙ্গা ও লাঠা-লাঠিতে পরিণত হবে, বড়দের দলাদলি আর স্বার্থ-চক্রান্তে তারা জড়িত হয়ে অবশেষে একদিন নিজেরাই পলিটিক্স্ শেখাতে আসবে, এর মধ্যে অসঙ্গতি কোথায় ?

তরুণদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ সচরাচর উত্থাপিত হয়, সেগুলো যে একেবারে ভিত্তিহীন অথবা অবাস্তব, এমন কথা বলি না। তাদের চরিত্রে যে অসহিষ্ণুতা এবং অসাধুতা, স্বভাবে যে বিশৃঙ্খলা আর আচরণে যে অসংযমের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সেটা সত্য। কিন্তু কেন ? এই সব জিনিস কি হঠাৎ দেখা দিয়েছে ? কি কারণে এবং কোন্ সময় থেকে তরুণ সমাজে ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছে ? আর সে ভাঙনের জন্য প্রকৃতপক্ষে দোষী অথবা দায়ী কে ? এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির আলোচনার পূর্ণ প্রয়োজন আছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তনে তরুণ-সম্প্রদায়ের দান কোনও দিনই অস্বীকার করা চলবে না। সমাজ-পতিরা যতই মাথা নাড়ুন আর বর্তমান ছাত্রদের দায়িত্ব-জ্ঞান-হীনতা নিয়ে মাতব্বরি মন্তব্য করুন, তাঁদের একথা মানতে হবে যে দরকারের সময়, সঙ্কট-কালে ডাক পড়ে তাদেরই যারা ভবিষৎ আর স্বার্থের কথা গুরুজনদের মতন ভাবতে শেখেনি। যেখানে স্বার্থত্যাগ করতে হয়, যেখানে আন্দোলনে অগ্রণী হতে হয়, যেখানে পুলিশের সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে পাড়ার দুষ্ট লোককে শায়েস্তা করতে হয়, অন্যায় দাবিদারকে

দাঁবিয়ে রাখতে হয়, সেখানে তরুণদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তখন বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া হয়। ছাত্র-সমাজের ওপর দেশের ভবিষ্যৎ, সমাজের প্রত্যাশা, সংসারের দায়িত্ব প্রভৃতি গুরু ভারগুলি কেমন করে নির্ভর করছে, তার ফিরিস্তি দেওয়া হয়। ছাত্র-সমাজের কাছে 'পপ্যুলার' হওয়ার দুর্নিবার লোভে নিজস্ব স্বার্থরক্ষায়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে দেখেছি রীতিমত খোসামোদী করতে। সমাজ-পতি ও রাষ্ট্রনেতারাও সুবিধা-মাফিক বাণী দেন, বিবৃতি প্রকাশ করেন, পিঠ্ চাপড়ান আবার অতিশয্যের লক্ষণে আতঙ্কিত হয়ে ছাত্র-সমাজের বাড়া-বাড়ি নিয়ে দোষারোপ করেন।

অধ্যয়ন যে তপস্যা আর পল্লবগ্রাহিতা যে নিন্দনীয়, একথা সর্বজনবিদিত সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে— শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি ঠিক তপস্যার অনুকূল আশ্রম-স্থানীয় নয়। শিক্ষক-অধ্যাপকদের রীতি-নীতি ঠিক্ ঋষিজনোচিত নয়। আবার পাশ-করানো যন্ত্র-চালক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-নির্দেশ আর পরীক্ষার পদ্ধতি ঠিক গভীর জ্ঞান-চর্চা আর সুকঠোর অধ্যয়ন-যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করে দেয় না। দিনের পর দিন ছাত্রদের যে আত্মিক ও মানসিক অবনতি ঘটছে বলে আমরা আক্ষেপ করি, তার পিছনে কোন্ সামাজিক আর অর্থনৈতিক কার্যকারণের সম্পর্ক রয়েছে এবং যুগ-পরিবর্তনের ফলে চলতি সস্তা ধুয়ো কি ভাবে তাদের মনকে অধিকার করে আছে এবং সর্বশেষে বর্তমান সময়ে যে সব আকর্ষণ-বস্তু তাদের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিয়ে প্রকৃত জ্ঞান-

চর্চার পরিপন্থী হয়ে উঠেছে—এগুলো বিশ্লেষণ করা দরকার। বিশ্লেষণের ফলে যদি দেখা যায়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আর সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই ত্রুটি বেশি, তাহলে আগে সেগুলির আমূল সংস্কার আবশ্যক। আর কি ভাবে ছাত্র-সমাজের শক্তি ও উত্তমকে অযথা অপব্যয়ের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে, গঠন-মূলক সমাজ ও শিক্ষা-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত করা যেতে পারে, সে সব উপায় আন্তরিক ভাবে চিন্তা করা উচিত।

১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ছিল এক যুগ। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত হল দ্বিতীয় যুগ। ১৯৪২ সালের পর যে যুগের আবির্ভাব, তার আয়ুকাল আজও ফুরোয়নি এবং সে যুগের নানা সমস্যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল আমরা আজও ভোগ করছি। ১৯২০ সালের সময় থেকে যে অসহযোগ-আন্দোলন, বিদেশী পণ্য-বর্জন আর খদ্দর-প্রচার, তার পুরোধা ছিল ছাত্র-সমাজ। অনেকখানি আদর্শবাদ আর প্রচুর স্বার্থ-ত্যাগে তারা গভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়েছে এবং উপযুক্ত নেতৃত্বে ছাত্র-আন্দোলন বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতির সূচনা করেছে। তার পরবর্তী যুগে আইন অমান্য আন্দোলন প্রথম দিকে সংযম হারায় নি। ছাত্রসমাজ কারাবরণ করেছে, কেউ বা সন্ত্রাসবাদে আস্থাবান্ হয়ে হিংসার পথে নেমেছে। লোকশিক্ষাপ্রদ কাজে তরুণরা অগ্রণী হয়েছে। প্রগতি-সাহিত্য, গণ-নাট্যের প্রবর্তন ও প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

১৯৪২ সালের সময় থেকে যে যুগের প্রারম্ভ, তখন থেকে

একটা বেপরোয়া বে-আইনী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-সঙ্ঘের মধ্যেও দলাদলির ফলে সভাভঙ্গ, হাতাহাতি থেকে শুরু করে অনেক কিছুই অসংযত ব্যবহারের নমুনা মিলেছে। সম্প্রদায় আর শ্লোগানের মোহে অন্ধ হয়ে অনেক তরুণই বিপথে চালিত হয়েছে। কেউ বা ট্রাম পুড়িয়েছে, লরী জ্বালিয়েছে, কেউ বা ধর্মঘট করেছে, প্রোসেশ্যন বার করেছে। আইনের ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপও করেনি, অনায়াসে গুলি হজম করেছে। নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি তখন তাদের সাহসে মুগ্ধ হয়েছেন এবং যারা জীবনকে তুচ্ছ করেছে, তাদের শহীদ বলে বরণ করেছেন। গত ছ' সাত বছর ধরে ছাত্র-আন্দোলনকে যেভাবে সুবিধাবাদী দলগুলি কাজে লাগিয়েছে, উৎসাহিত করেছে এবং কথায় কথায় ধর্মঘটে প্ররোচিত করেছে, তাতে ছাত্র-সমাজের বিবেচনাশক্তি এবং মূল্যবোধ যদি বিকৃত হয়ে থাকে, তা হলে একমাত্র তরুণ দলকেই স্বভাব-শৈথিল্যের জন্য দায়ী করা চলে না।

বর্তমানে যদি তাদের হিতৈষীরা উপদেশ দেন,—ঘরের ছেলে ঘরে বসে থাকো, শান্তশিষ্ট হয়ে লেখাপড়া করো, পলিটিকসের হুজুগে মেতো না, সমাজসেবায় মন দাও, সংসারের অভাব-অনটন দূর করতে চেষ্টা করো,—তা হলে কোনও ফল হবে কি? দাঙ্গার সময়ে আত্মরক্ষার জন্য বাঙালী ছেলেরা যখন হাতিয়ার তুলে নিল, তখন অনেকেই মনে মনে খুশি ও কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন। এখন দাঙ্গার মনোভাব আর হাতিয়ার ছাড়ানো শক্ত তো হবেই। বাঙলা দেশে পলিটিক্যাল গুরুবাদ কোনও দিনই পাত্তা পায়নি।

নিখিল ভারতীয় পাণ্ডারা যখন বাঙলা দেশের পিঠে সুড়সুড়ি দেন, স্বাধীনতার যুদ্ধে বাঙলা দেশের বৈশিষ্ট্য আর সংস্কৃতির জয়গান করেন অথচ গত সাত বছর ধরে বাঙলায় যে গুরুতর রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, এমন কি অবিচার করে থাকেন, তার ন্যায্য দাবী ও বক্তব্যে তেমন কর্ণপাত করেন না,— তখন তরুণসমাজের স্বাভাবিক সমালোচনা-প্রবৃত্তি প্রখর হয়ে উঠে। প্রাদেশিক মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে, বড়দের মুরুব্বিয়ানা এবং উপদেশবাক্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

যে বিশেষ অবস্থায়, আঞ্চলিক পরিস্থিতিতে এবং স্থানীয় সমস্যায় বাঙলা দেশে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ঘনিয়েছে, তার কিছুটা অংশ তরুণ-সমাজ এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকেও যে স্পর্শ করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। বরঞ্চ ভাববার সময় এসেছে, কি করে সে সমস্যার সমাধান হয়। তরুণ-সম্প্রদায় যে যে কারণে বিভ্রান্ত এবং উদ্দাম হয়ে উঠেছে, সেগুলি শুধু তরুণদেরই নয়, এ প্রদেশের জীবন-মরণ সমস্যা। সমাজে আর সংস্কৃতিতে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে, বাঙলা দেশের শিক্ষায় আর অর্থনৈতিক জীবনে যে বিরাট ফাঁকি আর বঞ্চনার সুযোগ নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রসমাজ তথা সমগ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে পেষণ করা হচ্ছে, তাতে সুস্থ, সংযত এবং পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার অবকাশ খুবই কম। স্বাধিকারপ্রমত্ত তরুণ-সম্প্রদায়কে কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনতে হলে যে সব সংস্কারের প্রয়োজন, তার জন্যে রাষ্ট্রের এবং শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে।

নবীন ছাত্র-সমাজের জীবনে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করি, তাদের অপসারণ-চেষ্টায় যদি শিক্ষক আর অভিভাবকদের শুভ বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে অনেকটা ফল পাওয়া যায়। শিক্ষকদের কথা পরে বলছি। আগে অভিভাবকদের কর্তব্য সম্বন্ধে দু' একটি কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার।

অধিকাংশ অভিভাবকই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার গৃহ-শিক্ষক অথবা স্কুলের শিক্ষকের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। অর্থের বিনিময়ে অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক যত ভাল করে পড়ান না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব সাময়িক। বাকি দায়িত্বটুকু অভিভাবকের, যেটা অনেক সময়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়। মধ্যবিত্ত সংসারের অভিভাবককে অধিকাংশ শক্তি ও উদ্যম নিযুক্ত করতে হয় অর্থোপার্জনে। কাজেই ছেলেমেয়েদের ওপর নজর দেবার সময় কম। এর ওপর শিক্ষক যদি উদাসীন হন, অথবা পেশাদরি-ভাবে দু'এক ঘণ্টায় কোনমতে কাজ সেরে দিয়ে চলে যান, তাহ'লে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কেমন হয়, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তারপর স্কুলে গিয়ে ছেলেরা যে রকম হাব-ভাব, আচরণ শেখে, সেটা ভালো কি মন্দ দেখা দরকার। চরিত্র-গঠন শুধু শিক্ষকের উপর নয়। অভিভাবকদের ওপরও নির্ভর

করে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষায়, চরিত্র-গঠনে মা-বাবার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। তাঁরা যদি সে দিকে তেমন সযত্ন দৃষ্টি না দেন, পরবর্তী জীবনে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য দায়ী হবে কে?

শিক্ষায়তনে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রাণ। যান্ত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে ছাত্র-দের পড়াশুনায় স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আসে। খানিকটা ভয়ে পড়ে আর খনিকটা তাড়া খেয়ে তারা কোনপ্রকারে পাঠ্যপুস্তক আর প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষায় বসে। বিষয়বস্তু না বুঝে ও শিখে গলাধঃকরণ করার কুফল অনিবার্য। স্কুল-কলেজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিক্ষক-অধ্যাপকের ক্লাস আর একটানা বক্তৃতায় স্নায়ু ও মন পীড়িত এবং অবশ হয়ে যায়। ক্লাসের বাহিরে যেটুকু অবসর, সেটুকুও অনেক সময় নষ্ট হয়। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে লাই-ব্রেরী এবং কমনরুমের যা অবস্থা ও বন্দোবস্ত, তাতে ছেলেদের স্থান-সঙ্কুলান হয় না। স্কুল-কলেজের ঘরে ছাত্রদেরই বসবার জায়গা কুলোয় না। এক একটি বিদ্যায়তন সারাদিন বিভিন্ন বিভাগের ভাড়া খেটে রাত দশটা থেকে ভোর ছ'টা পর্য্যন্ত ঘুমোতে পায়। টাকা ওঠে যথেষ্ট। কিন্তু অঙ্কের কারসাজিতে সবই ডেফিসিট। তলে তলে রিজার্ভ ফণ্ডের জমার হিসেব ভারী হতে থাকে। নিঃসম্পর্ক ছাত্র ও শিক্ষকদল অসহায় হয়ে ভেসে বেড়ায়। স্যাডলার কমিশন এই প্রসঙ্গে যা মন্তব্য করেছিলেন এবং শিক্ষা-ব্যাপারে যে সব ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন, সেগুলি

আজও সত্য এবং বর্তমান। সম্প্রতি বিশ্ববিভালয়ের তদন্ত সমিতি যে সব প্রস্তাব করেছেন, তাও সুকৌশলে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্র-সমাজ যদি অমনোযোগী হয়, পান আর চায়ের দোকানে সময় কাটায়, তা হ'লে কিই বা বলা যেতে পারে!

আজ থেকে দশবছর আগেও ছাত্রদের মধ্যে খেলাধুলায় অনুরাগ ছিল। যে ছাত্র ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলায় কৃতিত্ব দেখাতে পারত, স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ তার কদর করতেন। অনেক সময় ভালো খেলোয়াড়দের অর্ধবেতনে কিংবা বিনা বেতনে ভর্তি করে নেওয়া হত। শরীর-চর্চায় সে যত্ন ও মনোযোগ আজকাল তেমন দেখতে পাই না। স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষও ছাত্র-সংখ্যা আর হু'তিন দফায় আয়-বৃদ্ধির দিকে এত বেশি মনোযোগী, ক্লাস আর রুটিন নিয়ে এত বেশি চিন্তিত যে, এদিকে নজর দেবার সময় তাঁরা পান না। ছাত্রদের শরীর আর মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ও বিকাশ তাই পদে পদে ব্যাহত হয় এবং ভিন্ন পথে চালিত হতে থাকে।

এর ওপর আছে পলিটিক্সের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি। ভালো করে কোনও একটা মতবাদ বোঝার আগেই তারা দলীয় স্বার্থ-চক্রান্তের কবলে গিয়ে পড়ে। আর যারা পলিটিক্স করে না, ছাত্র-নেতা বা আন্দোলনের অগ্রণী হবার মতন যাদের যোগ্যতা নেই, তারা সিনেমা কিংবা ঐ রকম আজে-বাজে আকর্ষণের পিছনে ছোটে, মুফতে পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে, ধার

করে সৌখীন জামা-কাপড় পরে। পড়া-শুনো কিছুই করে না। চর্চার অভাবে দেহ-মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। আগে আগে দেখতুম, ছাত্ররা সাহিত্য-চর্চা আর সাহিত্য-সেবায় বেশ উৎসাহিত হত। মাসিক পত্র, সাহিত্য-সভা, বিতর্কিকা প্রভৃতি কাজের পরিচালনায় তারা অনেকটা অবসর নিযুক্ত করত। ফলে তরুণ-সাহিত্য বলে একটা জিনিস তৈরী হয়ে উঠছিল। কিন্তু এখন কাগজে কলমই ঠেকে না।

এর একমাত্র প্রতীকার হ'ল বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার। একটু আধটু তালি দেওয়া রিপুকর্ম নয়। সম্পূর্ণ সংস্কার। এতদিনের অযত্ন শিথিলতার ফলে যে সব আগাছা গজিয়েছে, সেগুলিকে সমূলে উৎপাটন করা দরকার। নূতন স্বাধীনতার পরিবেশে যে ধরণের স্বাধীন শিক্ষার প্রয়োজন, সেই ধরণের শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া আর পরীক্ষা দেওয়া, পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করা আর পাশ করার মত বিড়ম্বনায় যে সময় আর শক্তির অপব্যবহার চলেছে ক্রমাগত, সেই যান্ত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন না হলে নির্জীব এবং বিভ্রান্ত ছাত্র-সমাজে নতুন প্রাণ-সঞ্চার হওয়া অসম্ভব, স্বাধীন চিন্তায় ও চেষ্টায় নতুন কিছু গড়ে তোলা তো দূরের কথা। যাদের নিয়ে দেশের সমাজ, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ, সেই শিক্ষক আর ছাত্র-সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও নিকট, ব্যক্তিগত এবং বাস্তব হয়ে না উঠলে সে শিক্ষা একেবারেই নিরর্থক হয়ে যাবে। বিদেশে, সকল সভ্য

শিক্ষা-পদ্ধতিতেই এই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের ওপর জোর দেওয়া হয়। চার দেয়ালে আবদ্ধ ক্লাস-রুমের বাইরে যে আরও একটা জগৎ আছে, যেখানে শিখবার জিনিস প্রচুর, সেটা রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং একটি নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

যতদিন এই দেশ বা সমাজ শিক্ষায়তনের স্বরূপ বদলাতে না পারবে, ততদিন শিক্ষার স্বরূপ এবং অর্থও বদলাবে না। প্রকৃত শিক্ষায়তন আর প্রকৃত শিক্ষক বলতে কি বোঝায়, এটা যত দিন না বোধগম্য হবে, তত দিন শিক্ষার চরিত্র এবং মূল্যও সঠিক নির্ধারিত হবে না। বর্তমানে শুধু ছাত্ররা নয়, শিক্ষকরাও পীড়িত এবং নিষ্প্রাণভাবে তাঁদের দায়িত্ব সেরে দেন। সরকার এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যদি তাঁদের জীবিকা ও বৃত্তির উন্নতি সাধনে যত্নবান হন, তাহলে শিক্ষাদান আরও আন্তরিক হবে,। উদরান্নের সংস্থান-চিন্তায় শিক্ষক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াবেন না, একনিষ্ঠভাবে কর্তব্য করতে সচেষ্ট হবেন। এবং তা যদি সম্ভব হয়, শিক্ষার মানদণ্ডও অনেকখানি উন্নত হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, কর্তৃপক্ষ আর ছাত্র-সমাজ—এই নিয়ে শিক্ষা-জগতের স্থায়িত্ব আর প্রচলন। এই চার দলের মধ্যে যদি কল্পনা ও সহানুভূতি থাকে, তাহ'লে বুদ্ধিমান্ সহযোগিতার কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, বেশির ভাগ সময়ে বড় বড় পরিকল্পনা, কমিশন আর রিপোর্ট কার্যকরী হয় না। সে সব কাগজেই লিপিবদ্ধ থাকে। কেউ কারুর স্বার্থ ছাড়তে চায় না।

মৌখিক সহানুভূতি এবং অযাচিত উপদেশ অনেকক্ষেত্রে শুধু অপমানকর।

শিক্ষক যেখানে অন্নসমস্যায় এবং অতিরিক্ত কাজের চাপে উদ্‌ভ্রান্ত, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ব্যক্তিরা যখন পরিকল্পনাহীন আয়-বৃদ্ধিকর একটি যন্ত্র-পরিচালনায় উদ্ব্যস্ত, সরকার যেখানে শিক্ষা-বিভাগের সম্পূর্ণ জাতীয়করণে অনবহিত কিংবা অধিক অর্থব্যয়ে অপারগ ও অনিচ্ছুক, ছাত্র-সমাজ যখন চাকরি সংগ্রহের ধান্ধায় দিক্‌ভ্রান্ত এবং শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন সেখানে নৈরাশ্য আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সমাজের যাবতীয় ভুল আর ত্রুটি একমাত্র শিক্ষক আর ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া মোটেই যুক্তি-সঙ্গত নয়।

স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে ছেলেমেয়েরা যখন কলেজে ভর্তি হয়, তখন মনে থাকে আশা, উদ্যম ও উৎসাহ। এতদিন তারা যেভাবে চলা-ফেরা এবং পড়াশুনা করেছিল, যে পাঠ্য আর পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কলেজে প্রবেশ করে তারা আরও খানিকটা মনের স্বাধীনতা প্রত্যাশা করে। অধ্যাপকের নিকটে তারা আসে নতুন কিছু শুনতে পাবে বলে। অন্ততঃ নবীন ছাত্রদের মধ্যে এই মনোভাব কিছুদিন আগেও লক্ষ্য করা যেত। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্ধেক জিনিষ বুঝতেই পারে না। কেন এটা হয়? শুধু কি ভাষার অনভিজ্ঞতা। স্কুলে তারা বাংলার মাধ্যমে লেখা-পড়া করেছে, কলেজে এসে ইংরেজি জ্ঞানের অভাবে কি তারা অসুবিধা বোধ

করে? তাই যদি হয়, আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য, কিছুটা হচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা বাংলায় প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক দু'চারখানা বাংলায় লেখা হলেও অধিকাংশ বিষয়ের দরকারী বইগুলো আজও ইংরেজীতে। এবং এটা স্বীকার করতে হবে, কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যেগুলি পুরোপুরি বাংলায় লেখা শক্ত এবং সহজ ও চিত্তাকর্ষক করে বাংলায় ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু সেটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নয়। ক্রমশ অভ্যাস ও চর্চার ফলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া সহজ হয়ে আসবে।

বর্তমানে বাংলায় উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তকের যে অভাব. সেটা সাময়িক অসুবিধা। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এখনও যে ইংরেজী ভাষায় প্রশ্নপত্র তৈরী করেন, সেটা খুবই গোলমেলে ঠেকে। স্কুলে মাতৃভাষার মাধ্যমে অভ্যস্ত হয়ে তারা কলেজে এসে বিশেষ অসুবিধায় পড়ে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। বাংলা ভাষায় ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে, এটা খুবই ন্যায্য এবং সঙ্গত। কিন্তু সেই সঙ্গে ইংরেজি ভাষার প্রতি যদি অবহেলা আসে, তাহলে বাংলার ছেলেমেয়েরাই ঠকবে। যতদিন ইংরেজির প্রচলন একেবারে উঠে না যায়, ততদিন সে ভাষার প্রয়োগ চলবে এবং সর্ববিধ পরীক্ষায় বাংলার ছাত্রদল পেছিয়ে পড়বে—যেমনটি হচ্ছে। তা ছাড়া ইংরেজি না হয় বিদেশীর ভাষা। মাতৃভাষায় দখল তো সেই অনুপাতে বাড়ছে না! সাধারণ গড়পড়তা

হিসেবেই এ মন্তব্য। গড়ে দেখা যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা নিজের ভাষা তেমন ভালোভাবে আয়ত্ত করে না। ব্যাকরণ ভুল, বর্ণা-শুদ্ধি-সমস্যা তো আছেই। উপরন্তু প্রকাশভঙ্গী ও মৌলিক চিন্তাধারা অত্যন্ত দুর্বল। কলেজে চার বছর পড়ে তাদের জ্ঞান বেশি কিছু বাড়ছে না। আর প্রথম বছরেই তাদের উৎসাহ নিভে যায়। এটা অপ্রিয় সত্য হলেও এড়িয়ে যাবার নয়। কলেজী শিক্ষাপদ্ধতি একেবারেই নিষ্প্রাণ ও যান্ত্রিক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গতানুগতিকভাবে শিক্ষকরা ক্লান্ত দেহে কোনো মতে পড়িয়ে বেরিয়ে যান। বর্তমানে কেউ কেউ দু'তিন শিফ্‌টে কাজ করেন। কাজেই নতুন কিছু শেখাবার উদ্যম থাকে না। ছেলেরাও তাঁদের কাছে আসে না, মানে অন্তরঙ্গ স্পর্শের অভাবে তারাও নিষ্প্রাণভাবে বসে থাকে। কোনও মতে পার্সেণ্টেজ বজায় রাখাটাই হল আসল কর্তব্য এবং দায়িত্ব। পার্সেণ্টেজ-প্রথার বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। তবু আবার বলতে হচ্ছে, ওটা বাধ্যতামূলক না হলেই ভালো হয়। এতো বেশি ক্লাস, এতো বেশি ছাত্র যে কলেজী কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের স্থান-সঙ্কুলান করতে পারেন না। অথচ ভর্তির বিরাম নেই। এ অবস্থায় কলেজের পড়ানো যে একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াবে, তাতে বিচিত্র কিছু নেই।

এই বিশ্রী ও ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকার অবশ্য অর্থসাপেক্ষ। তবু সেটা করতেই হবে। কলেজ এবং সেই আয়ের ওপর নির্ভর করছে শিক্ষকদের বেতন। জীবন ও জীবিকা যদি এই ভাবে

ক্লিষ্ট, পিষ্ট এবং যন্ত্রচালিত হতে থাকে, তাহলে শিক্ষাও সেই অনু-পাতে দায়ে-সারা কাজে পরিণত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বলবেন, সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন। সরকার বলবেন, অন্য দিকে ব্যয়-বাহুল্য। ভাণ্ডারে অর্থ নেই। অতএব যা হচ্ছে, তাই চলুক। ছাত্র-সংখ্যা, ক্লাশের সংখ্যা কমিয়ে সুস্থ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, শিক্ষক আর ছাত্র যতক্ষণ না পরস্পরের নিকটে আসেন, উভয়ের মধ্যে পড়াবার ও শেখবার আগ্রহ যতক্ষণ আন্ত-রিক না হয়, ততক্ষণ কোনো পরিবর্তনেই কাজ হবে না। এক এক সময়ে মনে হয়—যত সব কমিটি ও পরিকল্পনার কোনো অর্থই হয় না। অনর্থক অর্থ-ব্যয়, নয়তো বিরাট্ প্রতারণা। অনেক সহজে সমস্যার মীমাংসা হয়, যদি প্রতিপক্ষ কিছু পরিমাণে স্বার্থ-ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ—এঁরা যদি আন্তরিক সহ-যোগিতায় এগিয়ে আসেন, মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেন এই বিশ্রী পরিস্থিতির অবসান ঘটাবোই, তাহলে বিলম্ব আর বাধা, ওজর-অজুহাতের সৃষ্টি হয় না। পরস্পর দায়িত্ব এড়িয়ে ছাত্র আর শিক্ষকদের ওপর সেটা ফেলে দিয়ে এইভাবে উদাসীন থাকার মানে হচ্ছে একটি বিপজ্জনক সঙ্কটের সৃষ্টি করা।

শিক্ষার অর্থকরী দিকটা সত্যই ভয়াবহরূপে প্রকট হয়ে উঠছে। অর্থ নৈতিক সমস্যার দিনে এমন ব্যাপারই ঘটে থাকে। কিন্তু তার সমাধানেরও উপায় আছে। চিন্তা করে দেখা দরকার, দিনের পর দিন কেন এমন মান-বিভ্রম ঘটছে। প্রকৃত শিক্ষার

অভাবে, কোনও মতে একটি ডিগ্রী-ডিপ্লোমা জোগাড়ের চেষ্টায় ছাত্ররা উদ্‌ভ্রান্ত এবং সেটি সংগ্রহ করতে সৎ, অসৎ, নৈতিক, অনৈতিক যে কোনও উপায় অবলম্বন করা চলে। শিক্ষক-অধ্যাপকদের এই কাজে সাহায্য করতে হয়। এমন অবস্থায় শিক্ষার কদর, 'হিউম্যানিটিজ'-এর চর্চা বা সমাদর কি করে সম্ভব হয়!

যে শিক্ষা-পদ্ধতির আওতায় ছাত্ররা কেবল মাইনে দেয়, বই-খাতা কিনে ঠাট বজায় রাখে, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে বঞ্চিত থাকে, যে পরিবেশ হাট-বাজারের সামিল, সেখানে গঠন-মূলক প্রচেষ্টার অবকাশ কোথায়? যদি ছাত্রদল নিষ্প্রাণ দেহে নির্জীব মন নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে কিংবা মানসিক আলস্যে এবং শিথিলতায় কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে বিপথে চালিত হতে থাকে, তা হলে সেটা অস্বাভাবিক নয়। ছাই গাদায় কচুই জন্মায়। বাজারে যারা মান-কচু বলে চালান দেয়, তারাই দায়ী এবং দোষী।

বাংলার ছাত্র-সমাজের যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়, সকলেই তা মনে মনে কামনা করেন। কিন্তু সেই উন্নতির জন্য যে উদ্যমের প্রয়োজন, সেটা অনেকেরই নেই। আমাদের ছাত্রাবস্থায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকেই একমাত্র চিন্তান্বিত দেখতুম। বাঙালীর বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। কিন্তু তীব্র সমালোচনায় কোনও দিনই পশ্চাৎপদ হন নি। শরীর-চর্চা, গ্রাম-উন্নয়ন, যৌথ সমবায়-স্থাপন, কুটির শিল্প এবং বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন

প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন আর জীবনের সংস্পর্শচ্যুত, বাস্তবমূল্যহীন কলেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করতেন। তখন মনে হত, আচার্য বৃদ্ধ হয়ে এক কথা হাজার বার বলেন আর যখনই ছাত্রদের দেখতে পান, তখনই সেই এক বদ্ধ ধারণার পল্লবিত ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আমাদেরও বয়স হল। বাঙালী ছাত্রদের শারীরিক শক্তি আর মগজের অপব্যবহার দেখে-দেখে এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ এবং সাবধানসূচক কথাগুলির যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করি। সর্ব বিষয়ে তাঁর ইচ্ছা ও স্বপ্ন সফল না হলেও বাঙালী তরুণদের মধ্যে কেউ-কেউ ছোট-খাট ব্যবসায় নেমেছেন। চাকরির মোহ এখনও সম্পূর্ণ না কাটলেও, অধিকাংশ যুবক বুঝেছেন স্বাধীন বৃত্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। মনে হয় যুবক-সমাজের সুদিন হয় তো আসবে। আর শিক্ষকরাও মানুষের মতন বাঁচবার এবং স্বাভাবিক উৎসাহ নিয়ে প্রকৃত শিক্ষা বিতরণ করবার সুযোগ পাবেন।

বাংলার ছাত্র-সমাজের কথা প্রসঙ্গে খেলাধূলার কথা আপনিই এসে পড়ে। বর্তমানে খেলাধূলার কদর কমে যাচ্ছে, যে কোনো কারণেই হোক্ আগেকার মতন খেলার মাঠে ভিড় হয় না। স্কুল-কলেজগুলি থেকে ভালো খেলোয়াড় বেরুচ্ছে না। সব চেয়ে বড় কথা, বাংলা দেশে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক পড়ে গিয়েছে। এই নিয়ে সংবাদপত্রগুলিতে এবং অন্যান্য জায়গায় আলোচনা হয়েছে এবং সেই আলোচনার ফলে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা উপস্থিত হতে পারি।

বাংলা দেশ ফুটবল খেলার জন্যে প্রসিদ্ধ। ১৯১১ থেকে ১৯২১ সালের কথা ছেড়ে দিই। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত বিশ বছর কাল ছিল বাঙালী ফুটবলের স্বুবর্ণ যুগ। এই সময়ের মধ্যে যত নামকরা মিলিটারি খেলোয়াড়ের দল কলকাতার মাঠে তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছে। এমন বেশি দিনের কথা নয়। ইয়র্কস্ ও ল্যাঙ্কস্, নর্থ স্ট্যাফর্ডস্, ডি-সি-এল-আই, শেরউড ফরেস্ট্যারস্, ডারহাম, এইচ-এল-আই প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ টীমের খেলা অনেকেই দেখেছেন। আজকাল ফুলবল মাঠে গিয়ে যখন দেখি শোচনীয়ভাবে খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড পড়ে গেছে, তখন মনে হয় কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে খেলার

মানবিভ্রম হবেই। তখনকার দিনে মোহনবাগান, এরিয়ানস ও ইষ্টবেঙ্গল টীমের গঠন, খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-নৈপুণ্য গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। গোষ্ঠবাবু, কুমারবাবু, রবি গাঙ্গুলি ও সামাদ কিংবা সূর্য চক্রবর্তী, রসিদ ও রহমতের মতন খেলোয়াড় তৈরি হওয়া কঠিন জানি। কিন্তু আরও অনেক খেলোয়াড় ছিলেন যাঁরা স্কুল-কলেজে পড়ার সময় থেকেই খেলেছেন।

বছর পাঁচেক আগে ভাগলপুরের নীরজ গাঙ্গুলি মশায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে বাঙালী ছেলেদের মধ্যে খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে না। নীরজ বাবু যে সময়ে মোহনবাগানে খেলতেন, সে সময়ে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে থেকেই ভালো খেলোয়াড় তৈরি হত, যেমন আশু দত্ত, নরেন বাঁড়ুজ্যে। প্রেসিডেন্সি মেডিক্যাল, স্কটিশ, বিদ্যাসাগর, রিপন আর বঙ্গবাসী কলেজ এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্তও ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচে অনেক খেলোয়াড় জুগিয়েছে। কুচবিহার, ট্রেডস কাপে একদা প্রেসিডেন্সী ও মেডিক্যাল কলেজের টীম খেলত আর হার্ডিঞ্জ, ইলিয়ট, হুইলার প্রভৃতি চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও কাপ প্রতিযোগিতায় অন্যান্য অনেক কলেজ যোগ দিত। মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং টীমে একদা ছাত্র খেলোয়াড়ই সংগ্রহ করা হত।

পরবর্তী কালে যে সব নামকরা বাঙালী খেলোয়াড় ভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা অধিকাংশ কলেজের পড়বার সময় থেকেই খেলায় নেমেছেন। এখনও আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা

হয়। কিন্তু না আছে খেলায় কৃতিত্ব, না আছে উৎসাহ। যে খেলোয়াড় একটু ড্রিব্‌ল্‌ করতে শিখল, সে মনে করল করুণা ভট্টচাজ হয়ে গেছে। আর ছুটো বড় খেলা খেলতে না খেলতেই তরুণ খেলোয়াড় উইং থেকে একটু ভেতরে এসে তিরিশ গজ দূর থেকেই সতু চৌধুরীর মতন গোল দিতে চায়। আজকালকার ছাত্রদল সিনেমার তারক-তারকাদের নাম-ধাম-বয়স এবং আয় যে ভাবে কণ্ঠস্থ করে, তার অর্ধেক উদ্যম ও উৎসাহ খেলায় নিযুক্ত করলে ঢের বেশি ভালো ফল পাওয়া যেত। শরীর ঠিক মত তৈরী করে, দম বাড়িয়ে নিত্য মাঠে হাজিরা দিয়ে যে খেলার খুঁটি-নাটি শিখতে হয়, তাতে ধৈর্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। বাঙালী ছাত্রদের এলেম আছে কিন্তু অধ্যবসায় নেই। খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যে দিন-দিন পড়ে যাচ্ছে, বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে থেকে ভালো প্লেয়ার তৈরী হচ্ছে না, এ দেখে একবার গোষ্ঠবাবু এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কয়েকজন তাঁদের মতামত জানিয়েছিলেন। কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বর্তমানে তরুণ ছাত্রদের যে কোচিং-এর বন্দোবস্ত হয়েছে, এটা খুবই আশা ও আনন্দের কথা।

কিন্তু বিদেশী ভাড়াটিয়া খেলোয়াড় আমদানি বন্ধ করলেই বাঙালী খেলোয়াড় তৈরী হবে না। শুধু কোচিং-এও কাজ হবে না—যদি না বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের কর্তৃপক্ষরা এ বিষয়ে অবহিত হন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু লেকচার, পরীক্ষা প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রতুল্য শিক্ষায় কলেজ কর্তৃপক্ষ আত্মপ্রসাদ অনুভব

করেন। ছাত্রদের কাজ ক্লাসে হাজিরা দেওয়া, অধ্যাপকদের কাজ ঠায় বক্তৃতা করা। এইটেই নিষ্প্রাণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। পাশের পাসেণ্টেজ বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করলে পরমার্থ লাভ হয়। কিন্তু উৎসাহ না দিয়ে, খেলার মাঠে ছেলেদের না পাঠিয়ে এবং নিজেরা উৎসাহ না দেখিয়ে অথবা উপযুক্ত খেলোয়াড়দের সুবিধা-সুযোগ না দিয়ে যে শিক্ষা-পরিচালনার ব্যবস্থা চলেছে, তাতে ছাত্রদের পরকাল নষ্ট করা হয়। অথচ দশ বছর আগেও এমনটি ছিল না। সৌরেন দে, রাসবিহারী রায়, মণ্টু বাঁড়ুজ্যে, রমেন মুখুজ্যে সাজাহান, সোমান্না, আব্বাস, শরৎ দাস, মান্না, হরিপদ বাড়ুজ্যে, সুশীল চাটুজ্যে, পরিতোষ চক্রবর্তী, নাসিম, অনিল দে প্রভৃতি ভালো খেলোয়াড়, কলকাতার কলেজ থেকেই বেরিয়েছেন।

বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি প্রসঙ্গে আর একটা বড় অভাব লক্ষ্য করা যায়। সেটা হ'ল সঙ্গীত এবং শিল্প-শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা। এমন দিন ছিল, যখন ছেলে বাঁশি বা সেতার বাজালে কিংবা ছবি আঁকলে অভিভাবক মনে করতেন, ছেলেটার ইহকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। সমাজও বিদ্রূপ-দৃষ্টিতে এ হেন উচ্ছৃঙ্খল ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্তব্য করত। কিন্তু সে যুগ গত হয়েছে। শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে শিল্প আর সঙ্গীতের স্থান নির্ণীত হয়েছে এবং সাড়ম্বরেই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মৌখিক স্বীকার এক পদার্থ, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা আর এক পদার্থ। যদি আন্তরিক অঙ্গীকার থাকত সমাজের মনে, তা হলে এত ছেলে

সন্ধ্যায় বিজ্ঞান আর কমার্সের ক্লাসে ভর্তি হবার জন্যে কিউ দিয়ে দাঁড়াত না।

এখনও জীবনের অর্থ হ'ল জীবিকা এবং শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হল অর্থকরী বৃত্তির জন্যে ডিগ্রী-ডিপ্লোমা সংগ্রহ। হিসেব নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সঙ্গীত আর শিল্পের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব ছাত্র পাশ করে বেরিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় দিন যাপন করছেন। যে উৎসাহ আর আশা নিয়ে যে ক'টি ছাত্র অভিভাবকের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে শিল্প-সঙ্গীতের দিকে ঝোঁকেন, শেষ পর্যন্ত সে উৎসাহ আর আশা টিঁকে থাকে না। যেটুকু আদর্শ বা থেকে যায়, তাও সংসারের আবর্তে যায় ঘুলিয়ে। রোজগারের চিন্তায় আর্ট শিকেয় ওঠে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুর মানুষকে শেষ পর্যন্ত স্থূল, জড়বাদী সিনিকে পরিণত হতে হয়।

যখন শিল্পী দেখেন, সমাজে অঢেল পয়সা কামাবার ও ওড়াবার মানুষ আছেন এবং নানা ফন্দী আর উপায়ে একজন অশিক্ষিত ঠিকাদার অর্থ সম্মান করায়ত্ত করতে পারেন, তখন সে সমাজের উপর তিনি বিরূপ হবেনই। যে প্রতিপত্তি ও মর্যাদা তাঁর একান্ত প্রাপ্য এবং অবশ্য লভ্য, সেটা সমাজ কিছুটা দেয় পিঠ চাপড়ে আর মৌখিক কদর দেখিয়ে। কিন্তু দু ঘণ্টাকাল উঁচু দরের খেয়াল শুনিয়ে শিল্পী যদি একশো টাকা পারিশ্রমিক চান, তা হলে সমাজের মুখের চেহারা হবে কাত্‌লা মাছের মতন। আর এক মাসকাল প্রদর্শনীতে ছবি টাঙিয়ে রেখে চিত্রশিল্পী যখন

যাতে জনসাধারণের জীবনে সে রসজ্ঞান, সৌন্দর্য-বোধ সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা আগে করতে হবে। তরুণ ছাত্রদের দেশ-বিদেশে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্যে। ক্লাস রুমে অধ্যাপক যতই ভারতীয় স্থাপত্য অথবা অজন্তা-এলোরার শিল্পকলা নিয়ে গলা ফাটান, কোনও কাজই হবে না, যতক্ষণ না ছেলেরা নিজের চোখে সে শিল্পের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করছে।

বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি, আর্ট সম্বন্ধে সমাজের কিছুটা সচেতনতা যেন হচ্ছে। কিন্তু এখনও কাগজে-কলমে। অর্থাৎ সভা ও সমিতি এবং বক্তৃতায় সেটা আবদ্ধ আছে। জীবনের সঙ্গে শিল্পের যে নিকট সম্পর্ক থাকলে দেশের মানসিক উন্নতি সহজ সুন্দর হয়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু এই শিল্প-শিক্ষা এবং শিল্প-জ্ঞানের বিস্তার যাতে সম্ভব হয়, তার জন্যে দায়িত্ব নেবে কারা? সরকার না হয় দু একটি প্রতিষ্ঠান এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন কিংবা উপযুক্ত শিল্পীদের উৎসাহ-বৃদ্ধির জন্যে কয়েকটি বৃত্তির বন্দোবস্ত করলেন। জাতীয় পরিকল্পনার অলঙ্কার স্বরূপ লোক-দেখানো জাতীয় চিত্র-শিল্প আর সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান না হয় গড়ে উঠল। কিন্তু সেটা তো ওপরকার কাজ। নীচে থেকে অর্থাৎ জনসাধারণ থেকে শিল্প-শিক্ষার প্রেরণা আসবে কি করে? সরকারী সাহায্যে না হয় মুষ্টিমেয় শিল্পীর ব্যবস্থা করা হোল। কিন্তু সমাজ যতক্ষণ নিজের নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়, আন্তরিক কর্তব্য-বোধে শিল্পী-গায়কদের সমর্থনে এবং সাহায্যে

এগিয়ে না আসে, অর্থাৎ বক্র কৃপা-কটাক্ষ ছেড়ে জীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগাযোগে বিশ্বাস রেখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত না করে, ততক্ষণ কিছুই হবে না। দু চারটে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন হবে। পার্টিতে যাওয়ার মতন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদের সম্মেলন হবে। কয়েকটা গাল ভরা আবেগময় বক্তৃতাও হবে, দেশের শিল্প-সম্পদ্ নিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরব-কীর্তন হবে—এই পর্যন্ত।

কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন পরিবেশে, ছেলেমেয়েরা কি মন নিয়ে এবং কি দৃষ্টি দিয়ে সঙ্গীত ও শিল্পকে দেখবে ও ভালবাসবে, তার ওপরই ষোল আনা নির্ভর করছে শিল্প-শিক্ষার বিস্তার। শিল্প অতীতে কি ছিল, তা আমরা জানি, অন্ততঃ শুনেছি ও পড়েছি। কিন্তু বর্তমানে শিল্পীরা কি করে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবেন, সেইটেই কি বেশি দরকারী ও নিকটের সমস্যা নয়? সব সময়ে 'হাই পলিটিক্‌সে'র চিন্তায় বিভোর না থেকে আর ভেজাল এবং গোঁজামিল দিয়ে স্বার্থ-সংরক্ষণ-নীতির গণতন্ত্র কিছুদিন বন্ধ রেখে যদি সমাজ ভবিষ্যতের কল্যাণ-কামনায় শিল্পতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে, তা হলে আখেরে ফল ভালো হয়।

দেশ-ভ্রমণকে বরাবরই শিক্ষার অঙ্গ বলে স্বীকার করা হয়েছে। শুধু অঙ্গ নয়, শিক্ষার বাহন এবং প্রধান ঘটক। ছাত্ররা বরাবরই দল বেঁধে বেরিয়েছে ও বেড়িয়েছে। এক দেশ থেকে ছাত্রদল আর এক দেশে গেছে; শুধু দেশ দেখতেনয়—নিজের দেশকে দেখাতে এবং অপরের দেশকে বুঝতে। এখনও মধ্যে মধ্যে এই ধরণের 'গুড উইল মিশ্যন' আসে ও যায়। খেলোয়াড়ের দল অবিশ্যি সব চেয়ে বেশি ভ্রমণের সুযোগ পায়। খেলার মাঠে যে বন্ধুত্ব এবং সম্প্রীতির সম্পর্ক তৈরি হয়, সেটাও কিছু কম কাজের নয়। ভারতের ফুটবল বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছে, হকিতে ভারতীয় টীম আজও অদ্বিতীয়। আর ক্রিকেটেও এ দেশের খেলোয়াড় আশাতীত উন্নতি দেখিয়েছেন। অতএব আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীবন্ধনে খেলা আর দেশভ্রমণ খুবই সহায়তা করেছে। বর্তমান দিনে হাজারে, মানকড়, অমরনাথ, উমরিগর বা গোপীনাথের যে নাম, অনেক রাষ্ট্র-সচিবের তা ঈর্ষ্যা ও কামনার বস্তু হতে পারে। তাই মনে হয়, যে সব খেলোয়াড়ের উপযুক্ত শিক্ষা বা যোগ্যতা আছে, তাঁদের ধরে রাজনীতির ক্ষেত্রে চালান করলে কেমন হয়? এম্ব্যাসিতে এঁদের গ্রহণ করলে ভালোই হবে। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে এখন

মেননজাইটিসের প্রকোপ। বাজপাইয়ের হাতে জলপাই-এর শাখা। কিন্তু হাজারেও একটা হাজারে মেলে না—সেটাও সমান সত্য। বড় বড় আত্মীয়-সম্পর্ক ধরে যেসব পোষ্যদল দাঁও-মারা চাকরির ডালে ঝুলে আছে, তাদের চেয়ে আধুনিক কালের শিক্ষিত ছাত্র-খেলোয়াড় কর্ম কর্মপটু হবেন বলে মনে হয় না। এমন দিন হয়তো নিকট ভবিষ্যতেই আসতে পারে যখন আমরাও বলতে পারব, ভারতের মন্ত্রী, দূত ও সদস্যবর্গ ইডেন গার্ডেন আর ব্রেবোর্ন ষ্টেডিয়ামে তৈরি হয়।

বর্তমানে যে অবাস্তব শিক্ষা-পদ্ধতির রেওয়াজ, তাতে দেশ-বিদেশের হাওয়া আর একটু লাগলে ও লাগালে ভালো হয়। এখন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপকরা কেবল বক্তৃতাই দেন। কিন্তু ছাত্রদের এক্স্কারশ্যন তেমন আর জমে না। কেন যেন সব ঝিমিয়ে পড়েছে। পাঁচ সাত বছর আগেও দেখতুম শিক্ষক-অধ্যাপকরা ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা-ভ্রমণে বেরোচ্ছেন। কিংবা অন্য প্রদেশে যাচ্ছেন খেলার প্রতিযোগিতা করতে। এখন আর তেমন আঠা দেখি না। কর্তৃপক্ষ কেবল রুটিন বাঁধেন, মাইনে কুড়োন, কর্মদায়িত্ব চাপিয়ে দেন যন্ত্রচালিত শিক্ষকদের ওপর, আর 'কোর্স' শেষ করবার জন্যে হুমকি দেন। অকর্মের ভার তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করেছেন। ফলে ছেলেদের খেলার আগ্রহ কমে গেছে। কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য কিংবা ছেলেদের রাজনীতি-জ্ঞান—কোন্‌টা যে এর জন্যে দায়ী, তা ঠিক করে বলা যায় না।

তবে স্কুল-কলেজের ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়, ছাত্ররা—বিশেষ করে বাঙলা দেশের ছাত্ররা, তেমন আর উৎসাহ বোধ করে না। ভালো ছেলেরা চিরকালই গ্রন্থ-কীট। মাঝারি ছাত্ররাও আজকাল কেবল নোট নেয় আর টিউটোরিয়াল খাতা দেখায়, প্রশ্নোত্তর করে সারা বছর ধরে, কিন্তু একটুও সাধারণ জ্ঞান অর্জন করে না। অভিভাবকের দল খেলার জন্যে স্কুল-কলেজের পুরো ছুটি কিংবা আধা-ছুটি বরদাস্ত করেন না। কর্তৃপক্ষও নাড়ী চেনেন ভালো, চাহিদা-মত ছকে ফেলা শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণে ব্যস্ত। শিক্ষকদল টুইশ্যনি আর নোট আর এলাউয়েন্স-চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত। তা হলে খেলার মাঠে কিংবা রেল-কামরায় ভিড় জমাবে কারা? ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে যতই গলাবাজি হোক আর ভারতীয় ঐতিহ্য আর শিল্পকলা নিয়ে শিক্ষকরা যতই আবেগময় অথবা সারগর্ভ বক্তৃতা দিন, মাথায় কিছুই ঢুকবে না। যতক্ষণ ছাত্ররা দেশভ্রমণ করে ভারতীয় ইতিহাস শিল্পকলার চাক্ষুষ পরিচয় না পাচ্ছে কিংবা বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের রীতি-নীতি, সমাজ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না সঞ্চয় করছে অথবা এই দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সংস্থান সম্পর্কে সচেতন না হয়ে উঠছে, ততক্ষণ তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কি করে? তাদের অর্থনীতি, সমাজ-নীতি আর ইতিহাসের পাঠ্য মুখস্থ করে কিছু কি লাভ হবে? সরকার, রেলওয়ে আর শিক্ষা-বিভাগ সহযোগিতা করলেই এ কাজটি হতে পারে।

কিন্তু তত্ত্বকথা যাক্‌···আপনারা সকলেই ভাবছেন, লোকটা সস্তায় খুব কলমবাজি করছে। বেড়াতে বেরুব বললেই তো আর বেড়ান যায় না! শিক্ষক-ছাত্র-খেলোয়াড় নিয়েই তো এ দেশের সমাজ নয়। তাদের তো ভ্রমণ-সম্পর্কে সুবিধা-সুযোগ আছে অথবা একটু তদ্বির করলেই সুবিধা-সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু জনসাধারণের কি অবস্থা? তাদের পয়সাই বা কোথায় আর সস্তায় বেড়াবার সুযোগই বা কে দিচ্ছে? ঠিক কথা। সেটা আমিও জানি। এবং জানি বলেই খানিক গায়ের ঝাল ঝেড়ে ফেলছি।

পূজোর মাসে আপনাদের মতন আমিও ব্যজেট করে রেখে-ছিলুম। কিন্তু মাসের শেষে কেমন করে প্রত্যাশিত স্যরপ্লাস্‌ অপ্রত্যাশিত ডেফিসিটে এসে দাঁড়াল, তা বুঝতে পারলুম না। তাই পূজো শেষ হয়ে গেল, আজও ঘরে বসে আছি। পাড়ায় পাড়ায় সার্বজনীন বেতার-চীৎকার, আর বৈশিষ্ট্য-বর্জিত বারোয়ারী আয়োজন এ কয়দিন দেখলুম ও শুনলুম। শরতের লঘুমেঘ আর সমুদ্র-নীলিমা মাঝে মাঝে মন চঞ্চল করেছে, সফরের স্বপ্ন ঘনিয়েছে চোখে। কিন্তু যখনই মন অবাধ্য হয়ে উঠেছে, তখনই লাগাম টেনে ধরেছি। পাড়ার চায়ের দোকানে ভিড় লক্ষ্য করেছি, সিনেমা হাউসে ক্যিউ দেখেছি আর পাইপিং দেওয়া রেয়ন সিল্কের লীলায়িত প্রোসেশ্যন লক্ষ্য করেছি তির্যক্‌ দৃষ্টিতে। রাত্রে যখন 'সূরিয়া অস্ত হো গয়া' তারস্বরে ঘোষণা করা হয়েছে, তখন 'মনসা মথুরা'য় পাড়ি দিয়েছি। সরকারের 'প্রায়রিটি'

নীতিতে জোর করে আস্থা স্থাপন করেছি। ভেবেছি—সে সব স্বর্ণযুগ গত হয়েছে, যখন একটি সেকেণ্ড ক্লাস সিঙ্গেল টিকেট কিনে যাতায়াত সারা যেত, যখন পূজো মানেই দেশান্তর, হাওড়া স্টেশন আর টঙ্গা-হোটেল অথবা ডাক-বাংলো বোঝাত। তাই টাইম-টেবল তুলে রেখে বিভূতি বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের গল্প-নায়কের মতন তালিকা তৈরি করেছি, ভাড়া ও খরচের এস্টিমেট মেলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে গিয়ে পশ্চিম দিগন্তে মহা-বালেশ্বর আর দ্বারকার কল্পনা করেছি। ভেবেছি এই তো বেশ আরাম। রেল-ভ্রমণে যা সুখ আজকাল! গাড়ির অদল-বদল হয়, সময়ের তারতম্য হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু 'রোলিং স্টকের' অভাব। কামরার সংখ্যা অথবা ট্রেনের জায়গা বাড়ানো তো সম্ভব নয়। জনতা এক্সপ্রেস হওড়ায় টেনে আনা হয়েছে। কিন্তু জনতা কমল কই? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধাই বা কি হল? আরাম তো দূরের কথা! বর্তমানে রেল কর্তৃপক্ষের পলিসি হল—'মধ্যপদলোপী কর্মধারয়'।

কিন্তু রেলের কামরায় শ্রেণী-বিলোপ হলেই কি মধ্যবিত্ত লোপ পাবে অথবা সমাজ-সাম্যের প্রতিষ্ঠা হবে? যাঁরা বড় মানুষ, তাঁদের প্রথম শ্রেণীর আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ আছে, ভাড়া বাড়েনি। তৃতীয় শ্রেণীর অবিশ্যি একটু-আধটু সুবিধা আরাম বেড়েছে। কিন্তু আপনার-আমার সবে-ধন নীলমণি 'স্নবারি'টুকু ভেসে গেছে। আগেকার মধ্যম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার বিরক্ত হয়ে এখন বেশি ভাড়া দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর আরাম খুঁজতে চায়, পায় না। 'দেড়া' বলে

দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্তে টিফিন ক্যারিয়ার খোলা আর যায় না। আর আগেকার দ্বিতীয় শ্রেণীর প্যাসেঞ্জার মধ্যম শ্রেণীর অবাঞ্ছিত এবং অনধিকার প্রবেশে ক্ষুণ্ণ এবং বিরক্ত। রাতের ঘুম উঠে গিয়েছে। 'স্লিপিং বার্থের' তপস্যায় সাতদিন ধরে লাইন দিয়ে তনুমন ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

নতুনত্বের মধ্যে হয়েছে সরকারী নতুনত্ব, আর বেড়েছে দুশ্চিন্তা। ট্রেনে যে রকম চুরি আর খুনোখুনির বহর বেড়েছে যে গেরুয়াধারী নিঃসম্বল পাশে এসে বসলেও বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে, প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—'কদ্দূর যাবেন মশায় ?'

তাই বিদেশ ভ্রমণ আপাততঃ মুলতুবি রাখতে হবে। শিক্ষার এবং আনন্দের যত ব্যাঘাতই হোক্, প্রাণধারণের চেয়ে বড় কিছু নয়। এককালে পূজো আর বড়দিনের মানেই ছিল হাওড়া ষ্টেশন। ট্যাক্সি আর কুলি। বড় মানুষ, মধ্যবিত্ত, অসচ্ছল অবস্থার কেরাণী, ছাত্র এবং জামাতার দল এই ছুটির প্রত্যাশায় একদিন উন্মুখ হয়ে থাকত, বসে বসে তারিখের হিসেব করত। তারপর মহালয়ার পরই, নিদেন পক্ষে ষষ্ঠীর দিন, স্যুটকেস গুছিয়ে সামর্থ্য-অনুযায়ী বাজার জিনিষপত্তর কেনা-কাটা করে বেশির ভাগ পশ্চিমমুখোই পাড়ি দিত। কেউ বা ফার্স্ট-সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী, কেউ বা ইন্টার ক্লাসের, কেউ বা তৃতীয় শ্রেণীর। যাদের বার্থ রিজার্ভ করা আছে, তারা হেলতে দুলতে ট্যাক্সি করে স্টেশনে হাজির হত। আর বাকি সবাই অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক আগে গিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত কামরায় ঢুকে পড়ে জায়গা দখল করে রাখত।

কেউ বা গাঁটের পয়সা খরচ করে দেশভ্রমণে বেরুত। কারুর বা ভাগ্যে বিদেশে শ্বশুরালয় অথবা বাবা-মামা-পিসে জাতীয় অভি-ভাবকের কর্মস্থল বলে পরস্মৈপদী সফর। আবার কেউ বা রেলের কর্মচারীর প্রাপ্য ফ্যামিলি পাশ জোগাড় করে নিতেন। বিদেশে কোনও একটা সুবাদ খুঁজে আশ্রয়ও ঠিক করে নিতেন। যদি কিছু না মিলত, সস্তার বাঙালী হোটেল কিংবা ধর্ম-শালার অভাব ছিল না। এঁদের উৎসাহই যেন বেশি দেখতুম। হয়তো তারকেশ্বর কিংবা শিয়াখালায় বাড়ি। বেলা তিনটে পর্যন্ত গৃহিণী হাঁড়ি-হেঁসেল ঠেলে বাসন মেজে সংসার গুছিয়ে খাবার ও পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে ছেলেমেয়েদের গায়ে একটা করে নতুন আনকোরা জামা চড়িয়েছেন। হাতে তখনও কালির দাগ মোছেনি। তারপর সতরঞ্চি-মাদুর-কাঁথা-হারিকেন-বালতি প্রভৃতি ডেয়ো ঢাক্না গুণ চটে মুড়ে চলন্ত সংসার সমেত প্লাটফর্মে ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকতেন। তারপর গাড়ীতে ওঠাও এক মহামারী ব্যাপার। মাল ওঠে তো মানুষ ওঠে না। যদি বা ওঠে, কিছু পড়ে থাকে। আবার নতুন করে গোণা সুরু হয়। নিরীহ স্বামী ছুটোছুটি করে হিসেব মেলান, নয় তো গিন্নির পান দোক্তার কৌটো খুঁজে বেড়ান কিংবা রাত দুপুরেও বড় স্টেশনে নেবে রাক্ষস-গোষ্ঠীর উদরপূর্তির উপকরণ সন্ধান করেন। 'ওগোর' তীক্ষ্ণস্বর উপদেশে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এক কাঁদি কলাই কিনে ফেলতেন, কেন না বাড়ি থেকে আনা খাবারের হাঁড়ি ইতিমধ্যে নিঃশেষিত। ট্রেনে বসে ফ্যামিলি পাশ, চাকরি আর বড়লোক আত্মীয়দের নিয়ে নানারকম দেমাকী

কথোপকথন শোনা যেত। এখন এ সব পাট চুকে গেছে।

অর্থাভাবে, জনতায়, অস্বাচ্ছন্দ্যে সব শ্রেণীর মানুষই এখন এক শ্রেণীতে এসে ঠেকেছে। মনের স্ফূর্তি নেই, সামনে নিশ্চিত প্রত্যাশা নেই, ট্যাঁক গড়ের মাঠ। উপরন্তু একজনের মাল নিয়ে অপরের নেমে যাওয়ার আশঙ্কা। পথের খরচ চার গুণ বেড়েছে, আরাম সুবিধা সেই অনুপাতে চার গুণ কমেছে। লম্বা সফরের যাত্রীরাও আজকাল ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েন বিভিন্ন কোঠায়—কেউ বা স্লীপিং বার্থের গাড়ীতে, কেউ বা দূরের যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক কম্পার্টমেণ্টে ঠাঁই পান। হাত পা মেলে গুছিয়ে বসে, গালগল্প আর সম্পর্ক পাতিয়ে, সংসার-সুখের আমেজ পাওয়া এখন দুষ্কর। এখন 'চাচা—আপন প্রাণ বাঁচা।' সরকার অবিশ্যি অনেক দিন ধরেই বোঝাচ্চেন, অকারণ ট্রেনে ভিড় বাড়িয়ো না। যখন নিতান্ত দরকার তখন বেরুবে। নতুবা বাড়িতেই ছুটি কাটাবে এবং দেশপ্রেমের কল্যাণে ছুঁচো চামচিকের মতন অন্ধকারে অনাহারে শীর্ণ হয়ে থাকবে। অযথা অপব্যয় করবে না, বরঞ্চ সঞ্চয়ের দিকে মন দেবে। কোনও বিজ্ঞাপনের চটকে মোহান্ধ হয়ে দোকানে সওদা করতে ঢুকবে না। কেবল সরকারী ঈস্তাহার মন দিয়ে পড়বে এবং হৃদয় আলোকিত করবে। কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সম্বন্ধে তোমার যা অজস্র কৌতূহল সেটা আপাতত খবরের কাগজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকুক। আর গিয়েই বা কি এমন হাতিঘোড়া দেখবে? কাশী-কাঞ্চী-গয়া,

দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে এমন কি চতুর্বর্গ লাভ হবে শুনি ? যেখানে যাবে, সেখানেই তো থাকা খাওয়ার কষ্ট, কালোবাজারী দর ! তার চেয়ে ঘরে বসে ধর্মচর্চা, শিক্ষালাভ আর বিত্তসঞ্চয় করাই যুক্তি সঙ্গত,—মানে অপরের বিত্ত কি ভাবে করায়ত্ত করা যেতে পারে, সে চিন্তা তীর্থভ্রমণের চেয়ে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তীর্থযাত্রায় তীর্থের অস্তিত্ব টিঁকে আছে আজও। কিন্তু যাত্রার আনন্দ আর নেই। যে আশায় আর আকাঙ্ক্ষায় মানুষ একদিন অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধন করেছে, তার কোনও চিহ্নই নেই আজকাল। থাকবার কথাও নয়। যুগ বদলাচ্ছে, মানুষও বদলাচ্ছে।

তাই দৈনিকে দৈনিক ইস্তাহার পড়ি আর মনকে বোঝাই। রামরাজ্য-পরিষদ যখন ভোটযুদ্ধে নেমেছে, তখন রামরাজ্য এলো বলে। এক সঙ্গে অনেক 'প্রেস নোট' পড়ে, অনেক সতর্ক বাণী শুনে আর অনেক-উল্‌টো পাল্‌টা উপদেশ দেখে মনটা হাঁপিয়ে ওঠে। তখন ভাবি, এর চেয়ে কাগজ না পড়াই ছিল ভালো। সম্রাট্ প্রিয়দর্শী তাঁর অনুশাসনগুলি সরল ভাষায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে রেখে গেছেন। ধর্ম আর সমাজের মঙ্গল-কামনায় মিতব্যয়িতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা, সত্য শুচিতা প্রভৃতি নীতি-উপদেশ শিলালিপিতে চিরকালের জন্য ভারতীয় প্রজার উদ্দেশ্যে লিখে রেখেছেন। আমরাও এই সব উপদেশ আজকাল হামেশাই পেয়ে থাকি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরণেও আমরা সেই প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদ আর

আমলাতন্ত্রী এবং দপ্তরী শৃঙ্খলায় মৌর্য রাষ্ট্রের সন্ধান ফিরে পাচ্ছি! সৌরাষ্ট্রের সিংহ বেঁজি হয়ে পালিয়েছে। সারনাথের সিংহও ধরা পড়েছে দিল্লীতে। রজ্জুক, ধর্মমহামাত্র প্রভৃতি রাজপুরুষরাও বর্তমান যুগের দুর্নীতি-দমন কর্মচারীদের মধ্যে মিশে আছেন। অতএব যে রেটে মৌর্যযুগে এসে পৌঁছেচি মাত্র দু বছরে, তাতে মনে হয়, ত্রেতাযুগের রামরাজ্যে উপস্থিত হতে বছরখানেকও লাগবে না। স্বর্ণলঙ্কা জয় হয়েছে, বিভীষণ তো পর্দার আড়ালেই রয়েছেন নিত্য মন্ত্রণা দেবার জন্যে। পুষ্পক রথেরও ছড়াছড়ি। অভাব কি কেবল হনুমান্‌জীর?

তাই ভাবছি—দূর হোক গে। ঘরে বসে ধর্মে-কর্মে মন দেওয়াই ভালো। বাইরে বেরিয়ে আর কি লাভ! হাতের পাঁচ—কফি হাউস তো আছে, চিনি না থাকুক। আড্ডা তো শিকেয় উঠেছে, মজলিসের বিশুদ্ধতায় ভেজাল ঢুকেছে। তাই খেয়ে-দেয়ে ছুটির দিনে দরজা জানালা বন্ধ করে, বাইরের পৃথিবীর আলোকে নিশ্ছিদ্র আবরণে মোলায়েম আঁধারে পরিণত করে একটি পরিপাটি দিবানিদ্রার আয়োজন করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে! অসারে খলু সংসারে এই হল একটিমাত্র জিনিষ—যার ওপর আব্‌গারি শুল্ক নেই, যাকে নিয়ে কালোবাজারী ফাট্‌কা খেলা যায় না, যেটি নেশাকে নেশা আবার অসুখ অশান্তির নিখরচা দাওয়াই।

উপনয়নের সময়ে মন্ত্র পড়েছিলুম 'মা দিবা স্বাপ্সীঃ'। কিন্তু করি কি? বৈদিক মন্ত্রের কোন্‌টি সার্থক করতে পেরেছি যে এইটিকে কেবল অনুসরণ করতে হবে! কুশণ্ডিকায় আর সপ্তপদীতে গৃহিণীকে তো সম্রাজ্ঞীপদে অভিষিক্ত করেছি সকলেই। সূর্য অগ্নি সাক্ষী করে কত গম্ভীর মন্ত্র আউড়ে 'শতপুত্রের জননী হও' এই বলে আশীর্বাদ করেছি। তাই কি হবে, না হলেই চলবে? ও সব বলতে হয়, ভাবতে নেই। আপনারা দুপুরে ঘুম জিনিসটার একটু কালচ্যর করুন। দেখবেন—অর্ধাহারে অপূর্ণ উদরেও দিব্বি নধর ভূঁড়ির আভাস এসে যাচ্ছে। আমার মতে, যতদিন না ব্রহ্মতেজ ও দিব্য দৃষ্টি হয়, ততদিন অবসর-সাধনার ভরসা যা ঐ দিবানিদ্রা।

দুপুরে ঘুম জিনিসটা সত্যিই অত খারাপ নয়, অন্ততঃ লোকে যতটা ভাবে। রাতে ঘুম যদি নিন্দার ব্যাপার না হয়, দুপুরে ঘুম কেন অপরাধী হবে? নিশাচর ব্যক্তিদের কথা বলছি না। তাদের ককৃটেল পার্টি আর নাইট ক্লাব আর নৈশ নৃত্য এবং অভিসারের পালা যখন শেষ হয়, রাত তখন কাবার। কাজেই তাদের দিনটাই রাত, আর রাতটাই দিন। কিন্তু মার্কিন-মুলুক অথবা ফ্যাশনেবল য়ুরোপের অনুকরণে যারা 'দ্রুত' জীবনযাপন করে এবং বেলা বারোটায় চোখ জ্বালা আর মাথা ধরা নিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, সারা দুপুরটা আবার চোখ বুজে কাটায়, তাদের কথা হচ্ছে না। কথাটা হচ্ছে আপনার আমার মতন সাধারণ লোককে নিয়ে। রাতে পুরো ঘুমিয়ে, যদি ছুটির দিনে

খানিক দ্বিপ্রহরে নিদ্রা দেওয়া যায়, তাহলে ক্ষতিটা কি? আর সঙ্কোচই বা বোধ করি কেন? আমার ওটা হয় এবং বন্ধু-বান্ধবরা আমার এই মধ্যাহ্ন-তন্দ্রার প্রীতির কথা জেনেই খোঁচা দিতে ছাড়েন না। দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার স্বপক্ষে যে সব যুক্তি তাঁদের বলি-বলি ক'রেও বলতে পারিনি, সেগুলো কাগজে-কলমে খোলসা করে বলাই ভালো। আমার মতন আর দু-পাঁচজন দিবানিদ্রা-কাতর লোকের কিছুটা সুবিধা হতে পারে। অন্ততঃ কুণ্ঠার ভাবটা কাটে।

দুপুরবেলায় ছুটির দিনে আমি কোনও কাজ হাতে রাখি না। মানে, কাজ থাকলেও বারোটা একটা পর্যন্ত খেটে শেষ করে দিই। এতে আমার স্নানে তৃপ্তি, আহারে রুচি এবং আহারান্তে ভারি একটা নিশ্চিন্ত উদার মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ছুটির দিনে সকালবেলায় উঠে আমার প্রথমেই মনে হয়, সাংসারিক অথবা সামাজিক, কোন্ কাজগুলো জমে আছে। তারপর সেই সাপ্তাহিক জঞ্জাল নিপুণভাবে ঝাঁট দিতে শুরু করি। যেদিন বাইরে বেরুতে হয় না, ঘরে বসে-বসে লেখা-পড়া চিঠিপত্রের কাজ শেষ করে যখন উঠি, তখন আমার ঘরের জঞ্জাল সাফ করবার জন্যে একটি বেজার মুখের আবির্ভাব হয়। সে মুখের পেছনে মনটি জানে—ঘর পরিষ্কার করে পরিপাটি করে বিছানা পাততে হবে, হাতের কাছে টুলের ওপর দু' একখানা হালকা বই, খবরের কাগজ, মিঠে পানের খিলি, ছাইদানি আর সিগারেট-দেশলাই রেখে দিতে হবে। ঘরটিকে এমনভাবে

আলোকিত রাখতে হবে যেন আকাশের ঝকঝকানি চোখে না লাগে, বাতাস আসে অথচ ঝাঁঝ না টের পাওয়া যায়—অর্থাৎ এক কথায়, ঘরে এমন একটি নরম আধো-আলো-আধো-ছায়ার মায়া সৃষ্টি করতে হবে, যাতে পড়াও যায়, আবার পাশের বালিশটাকে টেনে নিয়ে জড়িত চোখে স্বপ্নও দেখা যায়। ঝি চাকর অবৈধ প্রণয়াবদ্ধ হলেও চেঁচামেচি করবে না, বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের মায়েদের কাছে চুপ করে শুয়ে থাকবে এই সময়টিতে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের এই মাহেন্দ্র ক্ষণটির জন্যে মন আমার সপ্তাহভোর তৃষিত হয়ে থাকে।

আপনাদের এখন কি রকম মনে হচ্ছে? বাড়িতে যদি বেশি লোকজন থাকে, ঐদিন সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। নিমন্ত্রণ থাকলে গ্রহণ করবেন না। গৃহিণীকে সকাল সকাল নিজেই উদ্যোগী হয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, যদি কাছে পিঠে হয়। দুপুরে কাউকে আসতে বলবেন না। কাজকর্ম থাকলে বলবেন, 'সাড়ে চারটের পর।' তারপর নির্জন বাড়িতে আপনি শূন্য সিংহাসনের সম্রাট্। এইবার যে দেহের বিশ্রাম ও মনের মুক্তি, সেটি অবিমিশ্র নিশ্ছিদ্র অবসর। যদি একান্তই ঘুম না আসে, একটু তন্দ্রার পর ঘুম ছেড়ে যায়—তাহলে একখানা কড়া গোছের বই কিংবা ছোট হরফে ছাপা কোনও ধর্মতত্ত্ব বা দর্শনের প্রবন্ধ খুলে আলোর উল্টো দিকে মুখ করে পড়তে শুরু করবেন। আমি অনেকবার পরীক্ষা করে অত্যন্ত সুফল পেয়েছি।

কিছুক্ষণ পড়বার পর দেখবেন, চোখ দুটো কেমন বেশ করকর

করছে, পাতা দুটি ভারি হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ একই লাইন গুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, অথচ এক বর্ণ মাথায় ঢুকছে না। কেমন চমৎকার একটা বোকা বোকা ভাব, আর ফ্যালফেলে চাউনি নেমে আসছে মুখে চোখে। এটা হল ব্রহ্মালয় অর্থাৎ সমাধির ঠিক পূর্বাবস্থা। কিন্তু এই খানেই শেষ নয়। চট্ করে বই মুড়ে ফেলবেন না। যদি আমেজটিকে আরও সম্পূর্ণ, নিটোল ও ঘনীভূত করে তুলতে চান, আসন্ন নিদ্রাকে এমন গাঢ়-গভীর করতে চান যে, পাশের বাড়ির সুর-সাধনা তাকে ছুঁতেও পারবে না, তা হলে হাল শক্ত করে ধরতে হবে। অর্থাৎ শিথিল মুষ্টিকে আরও দৃঢ় করে ধরে' স্তিমিত মুদন্ত আঁখিকে একটু জোর দিয়েই বিস্ফারিত করে' বইয়ের পাতায় মেলে দিতে হবে। কিন্তু বেশি বড় বড় তাকাবেন না, তা হলে ঘুম চটে যাবে। হঠাৎ কোন্ ফাঁকে হয়তো একটা কথা অলস চোখের ছিদ্র দিয়ে মগজে ঢুকে যাবে। তখন ঢুলন্ত চোখ আর ঝিমন্ত মন এমন একটা বিশ্রী নাড়া খেয়ে উঠবে যে আর কিছুতেই কিছু হবে না। তখন বালিশ বদ্‌লে যতই এপাশ ওপাশ করুন, আরাধনাই সার। মেজাজ একেবারেই খিঁচড়ে যাবে।

দুপুরে ঘুম জিনিসটা আমাদের বৈশিষ্ট্যও বলতে পারেন। ওদেশের 'বিউটি স্লীপ','ন্যাপ','সিয়েস্তা' প্রভৃতি জিনিষগুলো কেমন যেন স্যাণ্ডউইচ্ পেস্ট্রির মতন নিতান্তই লঘু জলযোগ মনে হয়। ভাত-ঘুমের কাছে কিছুই নয়। এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। বরং গর্বিত হবার বস্তু আছে এই বাঙালীর মধ্যাহ্নচৈতন্যলোপে।

এর বিলাস, অভিজাত্য, সাধনা আর রঙই আলাদা। শস্য ক্ষেত্রের সবুজ স্বপ্ন নিয়ে কত কবিতাই লেখা হয়েছে কিন্তু সেই শস্যের জারকরসে যে নীল নিদ্রার জন্ম হয় খর রৌদ্রের ছায়াশীতল অন্তরালে, তা নিয়ে কোনও লেখক সাহিত্য-রচনায় এগিয়ে আসেন না। এটা অতি-দুর্বল লজ্জার পরিচয়। আমিও আগে তাই ভাবতুম। যদি কেউ দুপুরে দেখা করতে আসতেন, ঘুম-ভাঙা চোখে তাঁর সামনে বেরুতে কুণ্ঠিত হতুম। 'এই একটু গড়াচ্ছিলুম' বলে অকারণ কৈফিয়তে নিতান্ত ন্যায্য একটি শারীরিক আরামকে মনে প্রাণে অস্বীকার করতুম।

এখন আর সে ভাব নেই। এখন সোজাসুজি বলে দিই— 'ছুটির দিনে মশাই দুপুরে ঘুমোই।' এটা অভ্যাস দাঁড়াল কি করে, তাই বলি। প্রথম যৌবনে রাত জেগে পড়তুম। ভালো চিত্তাকর্ষক বই হলে রাত কাবার হ'ত। দিনে সেটা পুষিয়ে নিতে হ'ত। দিবানিদ্রার ফলে রাতে ঘুম আসত না। ফলে বই নিয়ে আবার রাত্রি-জাগরণ। পরের দিন এই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি। তারপর গৃহিণী আসার পর থেকে ক্রমশ এটা দৈনিক ছকে বাঁধা পড়ল। একটু সময়ের অদল বদল করে নিয়ে অর্থাৎ রাতে কিছুটা ঘুম আর দিনে খানিকটা ঘুম বরাদ্দ করে দিলুম। এখন আর কোনও গোলমাল নেই। রাতে ঘুম, দুপুরে ঘুম— এদের মধ্যে আর কোনও সংঘর্ষ হয় না। শেলির দিন রাত্রির মতন ওরা পরস্পরের প্রেমে বাঁধা পড়েছে। আর দুপুরে ঘুমের জন্যে বিশেষ কড়া ধরণের বই নির্বাচন করতে হয় না। নরম রোমান্টিক

পরিবেশে নায়ক-নায়িকা যতই ভাবালু হয়ে উঠুক না কেন, নয়ন আমার তন্দ্রালু হবেই। দুপুরে বাগানের কানাচে সৌদামিনী যতই নরেনদার বাহুপাশে ঢলে পড়ুক, তাতে আমার আর কোনও ব্যাঘাত হয় না। মনটাও টনমনিয়ে ওঠে না। আমার বিহ্বল সত্তা যথারীতি যথাসময়ে তন্দ্রার মধুরতর অধিকারে, সংজ্ঞালুপ্তির অচ্ছেদ্য নাগপাশে, পরম রভসলীলায় আত্মসমর্পণ করে।

তা ছাড়া, মধ্যাহ্ন-তন্দ্রার একটা স্বাস্থ্যকর দিক্ আছে,—শাস্ত্রে অথবা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যাই বলুক। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, যকৃৎ বিকৃত না হলে দুপুরে ঘুম দিলে শরীর ভালোই হয়। একবার আমার স্বাস্থ্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে খারাপ হয়ে পড়েছিল। আত্মীয় বন্ধু চিকিৎসক সবাই বায়ু পরিবর্তন করতে বললেন। কিন্তু আমি ছুটি নিয়ে কলকাতাতেই রইলুম। কোনও টনিক অথবা মাখন-মাংস না খেয়ে, স্রেফ কুমড়ো-বেগুন, পুঁই-চিংড়ি সহযোগে কাঁকরমণি ভাত হজম করে, দুপুরে নিত্য তোফা ঘুম দিয়ে একমাসে পাঁচ পাউণ্ড ওজন বাড়িয়েছিলুম। আসল কথা, দেহটাকে একেবারে বিশ্রাম দিতে হবে। আর সেই সঙ্গে মনটাকেও। কোনও চিন্তা, দায়িত্ব সেখানে রাখলে চলবে না। শরীর হবে শ্লথ, আর মন একদম লঘু, তা হলেই দুপুরে ঘুম আসবে। শরীর স্নিগ্ধ হবে—ছাপা অক্ষরের কোন ছাপই তাকে রুখতে পারবে না।

অথ কথা-শেষ

আপনারা হয়তো ভাবছেন—বিপ্রমুখে এ কি কথা! এত তোড়-জোড় করে, বড় বড় চড়া কথা শুনিয়ে শেষকালে কিনা মৌতাত আর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার স্তুতি! সমাজের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায়, অসত্য মেকি আছে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে অবশেষে বাঙালী চরিত্রের চরম দুর্বলতার কাছে নতিস্বীকার! তা হ'লে বোঝা গেল, বিপ্রমুখের যা কিছু তেজ, তা কল্পিত বাক্যবলে। আসলে বিপ্রমুখের সার্থকতা মাত্র কণ্ঠাশ্রয়ী। হৃদয়ের কোমলতায়, মস্তিষ্কের আলস্য-প্রশ্রয়ে যে ভাষণের সৃষ্টি,—সেগুলি থিওরি-সর্বস্ব। বস্তুমূল্য তার নগণ্য। কথাটা পুরাপুরি না হলেও আংশিক সত্য বৈ কি! ব্রাহ্মণ-আরণ্যক আর সংহিতার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যত বিপ্রের যত বাণী নিঃসৃত হয়েছে, অধিকাংশই তো আদর্শবাদী। মনুসংহিতায় বা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে যে সব যম-নিয়ম বিধিব্যবস্থা কীর্তিত হয়েছে, সবগুলি পালনীয় হলেও কি পালন করা যায়, না কি পালন করলে চলবে? সে সময়কার আচার-ব্যবহার সে যুগে চলতে পারত। রাজসভায় ব্রাহ্মণের সম্মান, সমাজে তার প্রতিপত্তি, সিধা ও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। তাই এক ঘণ্টা ধরে দন্তকাষ্ঠ ও শুচিস্নান চলতে পারত।

কিন্তু এখন যে সব ব্রাহ্মণ-অধ্যাপক ভোর বেলায় উঠে মেয়েদের সেকশুনে পড়াতে ছোটেন, তাঁরা কি করবেন? জটা দাড়ি রাখার রেওয়াজ নেই অথচ সকালে সময় নেই। তাই রাতেই অনেকে শেভ্ করে রাখেন,তেল মেখে শোন কিনা বলতে পারি না। ব্রাহ্মণের তেজেও কেউ আর ভস্মীভূত হয় না, একমাত্র উত্তেজিত মুহূর্তে কয়েকটি সিগরেট ছাড়া। শতকরা পঁচাত্তর জন ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপবীত আলনায় ঝোলান থাকে, কাজেই অভিসম্পাত দেওয়া চলে না। দিলে পরে এতদিন কংগ্রেস অথবা কম্যুনিস্ট, কোনও দলেরই অস্তিত্ব থাকত না। অতএব যুগ-বিবর্তনে বিপ্রচরিত্রও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। কলি এখন চতুষ্পাদ, তাই নররূপী চতুষ্পদের নিত্য সংস্পর্শে বিপ্রকণ্ঠও বদলেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ আর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে কোনও মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। তা হলে বিপ্রমুখের বাণী যতই আপাত-তেজস্বী হোক না কেন, বাঙলার মাটি আর জলবায়ুর গুণে সে তেজ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে এখন কেবল লেখনীর অগ্রভাগ আশ্রয় করেছে।

কলির ব্রাহ্মণের সম্বল হল লেখনী আর ব্রাহ্মণী। তাও বর্তমান দুর্দিনে টিঁকিয়ে রাখা দায়। হস্তান্তরের ভয়ে সকল ব্রাহ্মণই সিঁটিয়ে আছেন। স্বাধীন ভারতের নয়া আইন বড় কড়া। অতি-সূক্ষ্ম তার অর্থনীতি, মারাত্মক তার জটিলতা। বিদেশী পণ্যের আমদানী বন্ধ হয়ে এলে দ্বিতীয় লেখনী সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়বে। আর নতুন হিন্দু আইন জারী হয়ে গেলে মাত্র

একটি ব্রাহ্মণী। বহু বিবাহ আর কৌলীন্য প্রথার দেশে যদি এ পরিবর্তন সহজগ্রাহ্য হয়, তা হলে বিপ্রচরিত্রের রূপান্তর স্বাভাবিক হবে না কেন? তা ছাড়া, সবই তো গেছে। ধর্ম, শাস্ত্র, সমাজ কি আগেকার দিনের মতন আছে? কাব্য সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের সমাদর এবং প্রচলন কি অব্যাহত আছে? কবিতা হল 'কোমল বনিতা, রসেন বসিতা, রসয়তি রসিকং।' সর্বত্রই রস শুকিয়ে এসেছে, গন্ধময় বুভুক্ষার যুগে প্রস্তর-কঠিন হৃদয়ে কবিতা আর বনিতা প্রতি পদেই হুচোট খাচ্ছে। একটু আধটু পারস্ত্রীক অনুশীলনের অবকাশ ছিল এ দেশের সাহিত্যে। তাও গেছে। এখন কেবল পারত্রিক চর্চা। অবাঙালী রাষ্ট্রপাল আর প্রদেশপালও বাঙলায় এসে যাগ-যজ্ঞ, গীতাপাঠ আর খোলকরতাল চর্চা করে গেলেন। তা হলে রইল কি? ঐ দিবানিদ্রা আর উপরি লাভের স্বপ্ন।

উপরি-পাওনার মোহটা অবিশ্যি যাই-যাই করে এখনও যায়নি। গত মহাযুদ্ধের সময়ে অতিতন্ময়তার ফলে ওটা মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছিল। এখন জাল টেনে তোলার সময়ে রুই কাত্‌লা ঘাই মেরে বেরিয়ে গেলেও অনেক চুনো পুঁটি ধরা পড়ছে। সরকার দুর্নীতি দমনের অনেক চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, গত যুদ্ধের দান 'সিভিল সাপ্লাই' বাক্যটির প্রত্যাহার করা উচিত। কেননা, কাজটা যত বড়ই 'সিভিল' হোক, 'সাপ্লাই'-এর ইঙ্গিতটা কেমন যেন শ্রুতিকটু। কিন্তু সে কথা যাক। ঐ 'উপরি' কথাটার পিছনে বহু দিনের ঐতিহ্য সঞ্চিত আছে। এ দেশের

ধর্ম, স্মৃতি, সমাজ, জীবন একটু মন দিয়ে খুঁজে দেখুন। দেখবেন—উপরির ছড়াছড়ি।

ঋক্, সাম, যজুঃ—এতেই বেশ কাজ চলতে পারত। এল অথর্ব বেদ। অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতে শান্ খেল না, জোড়া হল 'খিল হরিবংশ'। রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর এল বুক-ভাসানো পাতালপ্রবেশ, রাবণ-বধের পর লক্ষ্মণ-বধ হল উপরি পাওনা। অষ্টাদশ পুরাণে সংযুক্ত হল কল্কি পুরাণ, বুদ্ধকাহিনীর সঙ্গে এল বোধিসত্ত্বের গল্প। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে এলেন নিত্যানন্দ। আমরা হলুম বাড়তির ভক্ত। নেতাজী চলে গেলেন, রইলেন পোতাজী। প্রধান মন্ত্রী আছেন, সঙ্গে আছেন সহকারী প্রধান মন্ত্রী। সেক্রেটারী আছেন অসংখ্য। ৺বিজয়ার পরেও আছে কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। কালীপূজোর লুচি মাংসের পর ভাইফোঁটার পাওনা। বাস্তবিকপক্ষে সংসারে এমন মানুষ নেই আর জীবনের এমন দিক নেই, যে উপরি লাভ ছেড়ে দেয়। অমিত্রাক্ষর মহাকাব্যের সঙ্গে যেমন প্রহসন, আধুনিক কাব্যের সঙ্গে যেমন গদ্য-কবিতা, ইনকাম-ট্যাক্সের সঙ্গে তেমনি 'সারচার্জ', ইলেকট্রিক বিলের সঙ্গে তেমনি সরকারী ডিউটি আর ক্যাশমেমোর নীচে তেমনি সেলস ট্যাক্স। বিয়ের সঙ্গে যেমন বৌভাত আর বৌভাতের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধী, পলিটিক্সেও তেমনি কনফারেন্স আর তারই আনুষাঙ্গিক ইস্তাহার। জমিদারীর সঙ্গে গেঁটে বাত, ডাক্তারীর সঙ্গে ইনসিওরেন্স, ইনসিওরেন্সের পিছনে 'রিবেট' আর অধ্যাপনার সঙ্গে টুইশনি,—সেখানেও বাড়তি ছাত্রী। মৃত্যুর

সঙ্গে যেমন স্মৃতি-বার্ষিকী, সিনেমার সঙ্গে তেমনি গান, জলসায় তেমনি নাচ। লাউয়ের সঙ্গে যেমন কুচো চিংড়ি, আর মোচার সঙ্গে বড়ি, বাজারের সঙ্গে তেমনি দস্তুরি, চাকরের সঙ্গে চুরি আর চাকরির মাইনে পিছু উপরি কিংবা 'মাগগি ভাতা'। দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় পড়ে আবার খুঁজি ছিটে-ফোঁটা, মাসিক পত্রিকায় ছায়াচিত্র-তারকার ছবি। ক্লাসে শুনি লেকচ্যর, কিন্তু বাড়তির ভাগ 'সাজেশন' না হলে মন ওঠে কি? ফুলশয্যার দানে যত ঘটাই হোক, 'নমস্কারী' ছাড়তে কোনও মহিলা কি রাজি? বিয়ের পর তত্ত্বটা কি উপরি বলেই বেশী লোভনীয় নয়? একটু-খানি অতীত ইতিহাস বিহনে স্ত্রী-চরিত্র কি মজে? যত বড় অভি-জাত পানীয় পার্টি হোক, ডালমুট চানাচুর অপরিহার্য।

কনফ্যরেন্স-শেষে হাতাহাতি আর খেলার শেষে মারামারি, এটাও উপরি প্রোগ্রাম। সাহিত্যের সঙ্গে দলাদলি, সাহিত্যিকের সঙ্গে 'হুইসপারিং ক্যাম্পেন' আসতেই হবে। চায়ের সঙ্গে সিগরেট, সিগরেটের সঙ্গে ক্যুপন, এক পয়সার একটি পানের সঙ্গে খানিক চুন-সুপারি-জর্দা আর আয়নায় মুখ দেখাটুকু ফাউ না পেলে মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করে। পরচর্চা না হলে মজলিস জমে না। একটি ফাউ কোলে না থাকলে মাতৃত্বের পালাই ঘুচে যায়। পেটে ডিম না থাকলে ট্যাংরা-পার্শে-ইলিশ কেনার মানে হয় না। যত মিষ্টি আদর আর চাটুপ্রণয়ের কারসাজি থাকুক, মান-অভিমান-কলহ না হলে দাম্পত্যসুখ অর্থহীন। যত কর্তব্য আর দায়িত্বজ্ঞান থাকুক, একটুখানি তম্বি না হলে স্বামিত্ব পানসে

হয়ে যায়। আর কত বলব? ফাউপ্রীতি আমাদের অস্থি-মজ্জায় জড়িয়ে আছে। প্রত্যাশিত হোক আর অপ্রত্যাশিতই হোক, একটা কিছু মুফতে পেলে সকল হৃদয়ই উল্লসিত হয়ে ওঠে। ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল্ অথবা পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে পুরস্কার ঘোষণা পড়েছেন তো। দেখবেন হিলম্যান কার, রেডিওগ্রাম উপরি-পাওনার নির্দেশ আছে। নয় তো আশ্চর্য ঘড়ি আর ফাউনটেন পেন পাঁচ শিশি দাদের মলমের সঙ্গে বিনামূল্যে উপহার দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুরাও উপরি পাওনার মর্ম বোঝে। বেড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরি, ছোট মেয়েটি আমার দরজা খুলেই প্রতীক্ষার প্রশ্ন করে, 'একটা সামান্য কিছু আমার জন্যে এনেছ না কি'? ছেলেকে নিয়ে অনেক হয়তো বেড়ালুম। ফেরবার পথে এই বয়সেই বইয়ের ষ্টল অথবা কফি-হাউসের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ফাউএর লোভটা আদি ও অকৃত্রিম জিনিস।

আপনাদের অনেক কথাই শুনিয়েছি। গুরু-গম্ভীর, প্রিয়-অপ্রিয় অনেক কথাই বললুম। তাতে আপনাদের ধৈর্য ও সময়ের কিছুটা অপব্যবহার হলেও কিছুই কি উপরি পেলেন না? আমি আমার প্রাপ্য দক্ষিণা পেয়েছি। কিন্তু একটু উপরি-পাওনা প্রত্যাশা রাখি। কঠিন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু পাঠকের ধার-করে বই-পড়ার ন্যায্য অধিকার থাকলেও, আপনারা এক-এক খণ্ড 'বিপ্রমুখের কথা' কিনে নেবেন। ঐটেই আমার উপরি-লাভ। কলির ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালী হলে কি হয়,

মিশ্র এবং মিবিষ রক্তে এখনও একটু যেন আস্তিক-স্পর্শ রয়েছে। বামদৃষ্টি কথকতা করলেও দক্ষিণা-প্রেম ঘোচে নি। আর সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণী-প্রীতি। একটিতে ভবিষ্যৎ, অপরটিতে বর্তমান। এ দুটি পদার্থের আশা ও ভরসা ত্যাগ করা নির্ভরশীল বিপ্র-স্বভাবের বাইরে।

কথা শেষ হল······লেখার পর অন্যমনস্ক ছিলুম। দেখলুম, পাশেই ব্রাহ্মণী দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে দার্জিলিংএর ফুল-ঝাঁটা। ঘরে অজস্র সিগরেটের ছাই, অপরিষ্কার টেবিল সাফ করা চাই। বল্লেন, 'কি যে ছাই ছড়াও, একটু গোছাল হয়ে থাকতে পার না!' তারপর একটি মন্তব্য ফাউ ছাড়লেন, "এতো ছাই পাঁশ লিখতে পারো·········আর কাজের বেলায় 'একটুও সময় নেই'—তোমার মুখের বুলি। কিছু বললেই তো অকাজের ফিরিস্তি আর বাজে ধাপ্পা। বাইরে আড্ডা আর ঘরে খালি মুখ ছোটাও, অথচ আমাকে নিয়ে বেরুতে হলেই পা তোমার পাথর হয়ে আসে·········"

অত্যন্ত সত্য কথা। তবু বিপ্রমুখের কথাও নিতান্ত অসত্য নয়। স্ত্রৈণ অপবাদ সহ্য করায় ব্রাহ্মণের পুলক-রোমাঞ্চ না হোক্, অনভ্যাসও নেই। কারণ 'এক যে ছিল ব্রাহ্মণ, তার ছিল এক ব্রাহ্মণী'—এটা বাংলা দেশের নিজস্ব কাহিনী। ব্রাহ্মণী খুব কর্মিষ্ঠা, হাতে সম্মার্জনী। আর ব্রাহ্মণের উপার্জ্জন নেই, অতএব মার্জনীয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রের যুগ থেকে আধুনিক বঙ্গের ব্রাহ্মণী-দল যতই দগ্ধ ললাট নিয়ে আক্ষেপ করুন, তাঁরা ভালো

করেই জানেন যে তাঁরা হলেন গণিতের সেই অদ্বিতীয় মৌলিক সংখ্যা—'এক'। বামভাগে যতই লঘুচারিণী শূন্য সংখ্যা উড়ে এসে জুড়ে বসুক, একটি ঝাড়নের ওয়াস্তা। দক্ষিণের শূন্য হলেন ব্রাহ্মণ। 'একের' পাশেই তাঁর স্থান, মূল্য, জীবন এবং জীবনান্ত সার্থকতা। দরকার মত ঐ শূন্যটির কপালে তিনি দশমিক ফোঁটা পরিয়ে দেবেন এবং ইচ্ছামত যোগ-বিয়োগ, কাটাকুটি করবেন। কিন্তু গুণ নয়, ভাগও নয়.........

...মধুরেণ সমাপয়েৎ। ব্রাহ্মণীর আলোচনাটুকু 'পুনশ্চ' উপরি-মন্তব্য হিসেবে ধরবেন। ঘরে ঘরে সকলেরই তো শাক-ভাজিনী আছেন, নেহাৎ মন্দ লাগবে না। অমৃতের সঙ্গে একটু হলাহল না থাকলে সমুদ্র-মন্থন অসার্থক, নীলকণ্ঠও নিরর্থক। তা ছাড়া জীবন-ব্যাকরণে কৃৎ ও তদ্ধিত-প্রকরণ শেষ হলেই 'স্ত্রী-প্রত্যয়' এসে যায়। স্ত্রী হলেন স্বয়ম্ভবা, প্রাতিপদিক শক্তি। আর আমাদের প্রত্যয়টা হল নিপাতনে সিদ্ধ, ফাউ-বিশেষ।

অবান্তর কথা যাক। যদি এ যাবৎ বিষয়বস্তুগুলির গুরুত্ব অথবা লঘুত্ব আমার লেখায় মাত্রাহীনতা ঘটিয়ে থাকে, তা হলে ত্রুটি আমার। আর যদি কোন অক্ষর পরিভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তা হলে প্রমাদ মুদ্রাকরের।

'আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়োলো...'

কিন্তু আবার প্রশ্ন জাগছে মনে···সত্যিই কি তুচ্ছ নটেকে মুড়োনো যায়? লোভী আর অত্যাচারী গরু কি এই নগণ্য বস্তুকে নিঃশেষে খেয়ে ফেলতে পারে? মাটির অনাদি বুকে সামান্যের উচ্ছেষ কি অবিনাশী অঙ্কুর নয়···?

ইতি কথা-সমাপ্ত